মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত রহ.

[কুরআন, সুন্নাহ, তাফসীর, ফিকহ, তাসাওউফ, দর্শন, ইত্যাদি অসংখ্য উলূম ও ফুনূনের মূল্যবান সারনির্যাস। সহস্রাধিক গ্রন্থের সারগর্ভ খোলাসা, সারা জীবনের অভিজ্ঞতার নিংড়ে দেয়া রস, যা নারী-পুরুষ, আলেম-গাইরে আলেম তথা সব শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য সমান উপকারী মহামূল্যবান ইলমী হাদিয়া]

মালফূযাত

মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব (রহ.)

বিশিষ্ট খলীফা : হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

গ্রন্থনা

হযরত মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব

উসতাযুল হাদীস : জামি'আ মিফতাহুল উলূম জালালাবাদ

মুযাফফার নগর, ইউপি, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

সিনিয়র মুদাররিস : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

খতীব : লেক সার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা

প্রকাশনায়

দারুল কুতুব

উত্তরা, ঢাকা–১২৩০

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত রহ.

মালফূযাত : মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ.

গ্রন্থনা : হযরত মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

প্রকাশক

মুহাম্মাদ মাশহুদুর রাহমান

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রকাশকাল

মুহাররাম ১৪৪৩ হিজরী

আগস্ট ২০২১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত]

পরিবেশনা

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫

রাহমানিয়া লাইব্রেরী

সাত মসজিদ সুপার মার্কেট

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল : ০১৬১৬-৮৮২৪০৯

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র

অনুবাদকের আরয

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ।

আলহামদুলিল্লাহ, হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর বিশিষ্ট খলীফা মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী (রহ.) এর অসাধারণ মালফূযাত বা মুখনিঃসৃত বাণী সংকলন "মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত" (রহ.) এর বাংলা অনুবাদ এখন আপনাদের হাতে।

বইটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে পারায় আমি মহান আল্লাহর মহান দরবারে জানাচ্ছি অজস্র শুকরিয়া। কারণ একমাত্র তাঁর তাউফীকের দ্বারাই নেক কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়।

বক্ষ্যমাণ মূলগ্রন্থটি সংকলন করেছেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী জামি'আ মিফতাহুল উলূম জালালাবাদ মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, টানা পয়ঁত্রিশ বছর হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত (রহ.) এর খাস সোহবতধন্য ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

মূল গ্রন্থটি ২০৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী। সেখান থেকে নির্বাচিত ১৭৫টি মালফূযাত নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন "মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত" (রহ.)।

উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত (রহ.) এর মালফূযাতের আরেকটি সংকলন মুহাররাম ১৪৩৮ হি. মোতাবিক অক্টোবর ২০১৬ ঈসায়ীতে "মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত" নামে আমি অধম কর্তৃক অনূদিত হয়ে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে মুদ্রিত হয়ে সর্বশ্রেণীর পাঠকের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

পূর্বে উল্লেখিত সংকলন ও বর্তমান সংকলনের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১. পূর্বের সংকলনটি গ্রন্থনা করেছেন জনাব মাওলানা মেহেরবান আলী বাড়ুতী ছাহেব। আর বর্তমান সংকলনটি গ্রন্থনা করেছেন জনাব মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব (দা. বা.)।

২. পূর্বের সংকলনে মোট মালফূযাত ছিল ৩০৩টি। আর বর্তমান সংকলনে মালফূযাত হল ১৭৫টি।

৩. পূর্বের সংকলনের মূল উর্দূগ্রন্থের প্রকাশক হল দেওবন্দের মাকতাবায়ে তায়্যিবাহ। আর চলতি সংকলনের মূল উর্দূ গ্রন্থের প্রকাশক হল দেওবন্দেরই মাসঊদ পাবলিশিং হাউস।

৪. পূর্বের সংকলনটি বাংলায় মুদ্রণ করেছে বাংলাবাজারের মাকতাবাতুল আশরাফ। আর বর্তমান সংকলনের বাংলা ভাষায় প্রকাশক হল দারুল কুতুব উত্তরা।

আশা করি বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দ উল্লেখিত বিষয়গুলো সামনে রেখে গ্রন্থটি পাঠ করবেন। আর অনুবাদজনিত কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে আমাকে জানাবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

৫ মুহাররাম ১৪৪৩ হি.
১৫ আগস্ট ২০২১ ঈ.

মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর ঢাকা-১২০৭

হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এর ছেলে ও খলীফা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সফিউল্লাহ খান ছাহেব দা:বা: এর

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বাকে আল্লাহ তা'আলা আপন বিশেষ অনুগ্রহে মাতৃগর্ভেই ওলী বানিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই হেদায়েতের আভাস তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের ইসলাহে বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহের সংশোধনের খিদমত তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। আব্বাজান যখন মিফতাহুল উলূম মাদরাসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন আর পরিচালনার দায়িত্ব আমি অধমের নিকট স্থানান্তর করে দিলেন, তখন তিনি মানবসেবার জন্য সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে গেলেন। তাঁর উঠা-বসা আত্মশুদ্ধিমূলক ইরশাদাত ও মালফূযাতে ভরপুর থাকত। যাঁরা আব্বাজানের কাছে থাকতেন এবং তাঁর রুচির সাথে পরিচিত ছিলেন তাঁরা আব্বাজানের ইশারায় তাঁর মালফূযাত তথা মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণীসমূহ একত্রিত করে শোনাতে থাকতেন।

তাঁদের মধ্যে মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব, মুদাররিস মাদরাসা মিফতাহুল উলূম আব্বাজান মরহুমের পুরনো সাহচর্য ধন্য ব্যক্তি। তিনি আবাসে-প্রবাসে টানা ৩৫ বছর আব্বাজান থেকে উপকৃত হয়েছেন। আর শেষকালে আব্বাজানের ইশারায় মালফূযাত সংকলন করেছেন। এই মালফূযাত কিস্তি আকারে "রেসালা মিফতাহুল খাইরে" ছাপা হয়েছে। এখন কোন কোন বন্ধুর অভিলাষ হল এই সমষ্টি "মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত" নামে স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হোক। যা এখন আপনাদের সামনে।

আমি দু'আ করি, যেন আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থটিকে সমস্ত মুসলমানদের জন্য ব্যাপকভাবে এবং তরীকতের পথিকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী বানিয়ে দেন।

অধম

মুহাম্মাদ সফিউল্লাহ

গুফিরা লাহু

হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা

হযরত মাওলানা হাফেয ডাঃ তানভীর আহমাদ

ছাহেব দাঃ বাঃ হায়দারাবাদ সিন্ধ-এর

মতামত

মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব কর্তৃক সংকলিত মালফূযাত দেখার সুযোগ হল। পাঠ করার পর অনুভব হল যে, এই মালফূযাত যা তিনি সংকলন করেছেন অত্যন্ত মূল্যবান। যেহেতু হযরতওয়ালা রহ.-এর মধ্যে তাসাওউফ ও সুলূকের সারনির্যাস এমন মোহনীয় ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন যে, প্রত্যেকের অন্তরে গেঁথে যায়।

আল্লাহ তা'আলা এই মালফূযাতের সংকলন ও প্রচার-প্রসারকে সহজ করে দিন। কেননা, যত দ্রুত এ কাজ হবে ততই সাধারণ মানুষের উপকার হবে। আমি দু'আ করছি যেন মাওলানার হাতে এ কাজটি সহজভাবে দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যায়।

হযরত মাওলানা (তানভীর আহমাদ) ছাহেব দাঃ বাঃ

হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা হাকীম যাকিউদ্দীন ছাহেব রহ.-এর

অভিমত

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

হযরত মাওলানা আকীলুর রহমান ছাহেব যীদা মাজদুহুম কর্তৃক সংকলিত হযরত আকদাস মাসীহুল উম্মাত রহ.-এর ইরশাদাত ও মালফূযাত-এর হাকীকত ও মারেফাত কে কে অস্বীকার করতে পারে? আর আমার মত মানুষের এ মালফূযাতের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা *مادح خورشید مداح خودست* বা "সূর্যের প্রশংসাকারী মূলত নিজেরই প্রশংসাকারী" কথাটার সত্যায়নকারী।

অন্তর থেকে দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা দ্রুত এটাকে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন এবং মাসীহুল উম্মাত রহ.-এর মাসীহী ছোঁয়ায় উম্মাহকে উপকৃত করেন।

খাকপায়ে আসতানায়ে মাসীহুল উম্মাত
(হযরত মাওলানা) হাকীম যাকিউদ্দীন গুফিরা লাহু

সংকলকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی أَمَّا بَعْدُ

বান্দা আকীলুর রহমান অধম খাদেম খানকায়ে মাসীহুল উম্মাত আরয করছে যে, হযরতওয়ালা মুরশিদ জনাব মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. একাধিক বার আমাকে বলেছেন, "তোমার সংকলিত মালফূয আমার ভাল লাগে। এতে বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এজন্য আমার মালফূযাত তথা মুখনিঃসৃত বাণীগুলো যেভাবে সংকলিত করছো সংকলন করতে থাকো। অবশ্য বই প্রচারের ঐ পদ্ধতি যা বর্তমানে চালু হয়ে গেছে। বিক্রির জন্য বড় বড় ইশতিহার ছাপানো হয়, এমনটি কখনো করবে না। এটা আমার স্বভাববিরোধী কাজ।"

এই মুবারক কথাগুলোর আলোকে বান্দা সময় সুযোগমত ইরশাদাত জমা করছিল। অতঃপর সম্মানিত দুই ভাই মাওলানা জামালুর রহমান ছাহেব এবং মাওলানা নাওয়ালুর রহমান ছাহেব এর দাওয়াতে বান্দা যখন প্রথমবার হায়দারাবাদ গেল, তো ভাগ্যক্রমে হযরত মুরশিদে ছানী জনাব মাওলানা ডা: তানভীর আহমাদ ছাহেবও মাওলানা নাওয়ালুর রহমান ছাহেবের ঘরে অবস্থান করছিলেন। বান্দা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সংকলিত মালফূযাত এর কপি হযরত মুরশিদকে দেখালে তিনি খুব পছন্দ করলেন এবং বললেন, "পড়ার পর এমন অনুভব হচ্ছে যে, হযরতওয়ালা স্ব-শরীরে উপস্থিত এবং মজলিস হচ্ছে"।

অতঃপর আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে কিছু কথাও লিখে দিয়েছেন।

এই পবিত্র সফরেই বান্দা হযরত মুরশিদে ছানীর হাতে বাইয়াত হই। এবং সিলসিলায়ে আলিয়া ইমদাদিয়া আশরাফিয়া, মাসীহিয়্যাহ-এর মধ্যে দ্বিতীয়বার নতুনভাবে প্রবেশ করি।

রূহের শক্তিবর্ধক এই সফরেই হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা জনাব হাকীম মুহাম্মাদ যাকী ছাহেব-এর বরকতময় সাক্ষাত লাভ হয়। তাঁর খিদমতেও মালফূযাত-এর কপি পেশ করি। কিছু কথা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনিও কিছু কথা লিখে দিয়ে আমি অধমের হিম্মত বৃদ্ধি করে দেন।

বান্দা নিজের উপর আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় অনুগ্রহ মনে করে যে, তিনি এই অধমকে মাসীহুল উম্মাতের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। আমার স্বতন্ত্র উপস্থিতি হযরতওয়ালার ওখানে ১৩৭৭ হিজরীর ৩রা রামাযান হয়েছে। এ তারিখ আমার খুব ভালভাবে মনে আছে। আমার উপর হযরতওয়ালার অনুগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলছিল। এমনকি হযরতের সঙ্গে একসাথে বসে পানাহারের সৌভাগ্যও আমার নসীব হল। সকালের নাস্তা, দুপুরের খানা, আসরের পর চা এবং মাগরিবের পর খানা প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত হযরতের ঘরে করার সৌভাগ্য হয়েছে। যে কারণে হযরতওয়ালার ভেতর-বাহির তথা সমস্ত অবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক বান্দার সহজে নসীব হয়েছে। মাগরিবের পর থেকে ইশা পর্যন্ত শরীর মুবারক দাবিয়ে বাসায় আসতাম।

নিজের শুরু যমানায় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, চিঠির কয়েকটি বাক্য লেখাও খুব মুশকিল ছিল। এটা হযরতওয়ালার সীমাহীন তাওয়াজ্জুহের বরকত যে, তিনি আমাকে লেখালেখির প্রতি মনোযোগী করেন। বান্দা ভাঙ্গাচুরা লেখা আরম্ভ করে হযরতকে দেখানো শুরু করে। হযরতওয়ালা রহ. জাহেরী বাক্যাবলীর ইসলাহের পাশাপাশি বাতেনী আদাবের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। যার সারনির্যাস হল একথা।

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষ চিনে না, পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে না, সে আমার নিকট মানুষ নয়।" এই ইরশাদের আলোকে হযরতের যেসব গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হত, বান্দা সময়ে সময়ে সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করে হযরতওয়ালাকে শোনাতে থাকত।

একবার জনৈক অকৃত্রিম বন্ধু হযরতকে জিজ্ঞেস করেন যে, হযরতের ইরশাদাত কে কে সহীহভাবে বিন্যস্ত করতে পারেন? তখন হযরতও অকৃত্রিমভাবে এই অধমের নাম উল্লেখ করেছেন। ইন্তিকালের কয়েক মাস পূর্বে হযরতওয়ালা অধমকে বলেছেন : "আমার মালফূযাত জমা করতে থাকো।"

এই বরকতময় বাণীর আলোকে বান্দা মালফূযাত একত্রিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমনটি এইমাত্র উল্লেখ করেছি। এই মালফূযাত এভাবেই আমার নিকট বিদ্যমান ছিল। ছাপার চিন্তা কখনো করিনি, প্রয়োজনের সময়

নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি বুলাতাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য আমাকে সাহায্য করল এবং মাদরাসা মিফতাহুল উলূম জালালাবাদ জেলা মুযাফফার নগর ভারত থেকে একটি চমৎকার পত্রিকা "মিফতাহুল খাইর" নামে চালু হল। পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ অসিয়্যুল্লাহ খান ছাহেব এবং সম্পাদক ছাহেব আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, আমি অধম কর্তৃক সংকলিত মালফূযাত কিস্তি আকারে প্রকাশ করা হোক। কেননা উল্লেখিত পত্রিকাটির আসল উদ্দেশ্যই হল, হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ.-এর উলূমকে বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত পৌঁছানো। ফলশ্রুতিতে কয়েক বছর পর্যন্ত "মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত" নামে এই ধারাবাহিকতা কিস্তি আকারে চলতে থাকল।

আনুমানিক ছয় মাস পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম জাওহার ছাহেব, মুদাররিস অত্র মাদরাসা বললেন যে, শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব মিফতাহী এই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন যে, "এই বরকতময় সিলসিলাকে স্বতন্ত্র বইয়ের আকৃতিতে প্রকাশ করা হোক, যা খরচ হবে আমি ব্যবস্থা করব।" এটাকে গায়েবী ইশারা মনে করে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটার একটি কিস্তি এখন আপনাদের হাতে।

পরিশেষে এই কবিতা হল বান্দার মনের ভাষ্যকার :

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل؟
نسیم صبح تیری مہربانی

কোথায় আমি আর কোথায় ফুলের সুবাস?
প্রভাত বায়ু তোমারই দয়া।

বান্দা শ্রদ্ধার আতিশয্যে হযরতওয়ালাকে সম্বোধন করে এভাবে পড়তাম :

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل؟
مسیح اللہ تیری مہربانی

কোথায় আমি আর কোথায় ফুলের সুবাস?
মাসীহুল্লাহ তোমারই দয়া।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছি যেন তিনি এ গ্রন্থটিকে আওয়াম খাওয়াস সবার জন্য বিশেষত আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন। আমীন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হতে পারে কোন কোন মালফূয বাহ্যিক দৃষ্টিতে পুনরায় আলোচিত মনে হবে। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে গত হওয়া মালফূযাত থেকে অতিরিক্ত নতুন কথাও আছে। এজন্য এ পুনরুল্লেখকে নিজ অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে।

তারিখ
৩রা জুমাদাল উলা
১৪২৮ হিজরী

বান্দা আকীলুর রহমান
মুদাররিস : মাদরাসা মিফাতাহুল উলূম জালালাবাদ
মুযাফফার নগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুফতী মুহাম্মাদ নাঈম ছাহেব এলাহাবাদী
সম্পাদক, "মিফতাহুল খাইর" পত্রিকা জালালাবাদ মুযাফফার নগর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. এর শুভ জন্ম ১৩২৯ বা ১৩৩০ হিজরীতে তাঁর পৈত্রিক নিবাস আলীগড় জেলায় হয়েছে।

বংশীয়ভাবে তাঁর সম্পর্ক শেরওয়ানী খান্দানের সাথে ছিল। এই বংশ বহুপূর্ব থেকে অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ঐসব বৈশিষ্ট্যের কারণে পাঠানদের মধ্যে শেরওয়ানীদের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। তাঁদের মধ্যে বড় বড় ধনী শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্বনামধন্য লেখক ছাড়াও আহলুল্লাহ, ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ও রাতজাগা মাওলা-প্রেমিকও জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁদের এখানে সভ্যতা ও ভদ্রতা, উত্তম গুণাবলী ও সৎ স্বভাব ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেয়া হত।

শেরওয়ানী বংশ ভারতবর্ষ বিজেতা সুলতান মাহমূদ গযনভী রহ. এর সাথে ভারতে এসেছিল। এবং সুবিধামত দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাস শুরু করে। এই বংশের একটি শাখাই আলীগড় ও তার আশপাশের এলাকাকে নিজেদের বসবাসের স্থান বানান।

মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ মাসীহুল্লাহ ছাহেব রহ. এর লালন-পালন ও বেড়ে উঠা এই বংশেরই একটি অভিজাত পরিবারে হয়েছে। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম ছিল আহমাদ সাঈদ খান, যিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। নিজ এলাকার যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এত চমৎকার সংগঠক ছিলেন যে, কোন কাজে বড়রা অকৃতকার্য হয়ে পড়লে আর এলাকায় বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তাঁর ডাক পড়ত।

এমনিভাবে তাঁর সম্মানিতা মাতাও অত্যন্ত বিদূষী, নেককার, গরীব মানুষের প্রতি সহমর্মী মহিলা ছিলেন।

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. জন্মগতভাবেই ওলী ছিলেন। শৈশব থেকেই সৌভাগ্যশীলতা ও আভিজাত্যের গুণাবলী তাঁর ভবিষ্যতে বড় কিছু হওয়ার ইঙ্গিতবাহী ছিল। ছোটকালেই তাঁর যিকির, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী বরং নামাযের প্রতি ইশক প্রবল ছিল। এছাড়া তিনি অত্যাধিক নফল নামায, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির ইহতিমাম করতেন এবং গুরুত্বের সাথে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতেন। যদ্দরুন তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের প্রাথমিক অবস্থাতেই বিশেষ দ্বীনী ও ইলমী যোগ্যতার অধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অল্প বয়সেই লাজুকতা, আদব ও সম্মান, গাম্ভীর্যতা জাতীয় উঁচু গুণসমূহে গুণান্বিত বানিয়েছিলেন। যে কারণে বড়রাও তাঁকে যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁকে সমীহ করতেন।

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এই সৌভাগ্য বাহুবলে হয় না অর্জন
দান না করেন দয়াময় আল্লাহ যতক্ষণ।

তিনি ক্বারী আব্দুল্লাহ ছাহেবের কাছ থেকে কুরআনে কারীমের তালীম হাসিল করেন। অতঃপর বেহেশতী যেওর এবং উর্দূর কিছু কিতাব নিজ মামা জনাব মুহাম্মাদ ইয়াকূব খান ছাহেবের কাছে পড়েন। আর ফার্সী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা আলীগড় শহরেই একজন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ উস্তাদ মিঞাজী আব্দুর রহমান এর নিকট থেকে শিখেন। এরপর আলীগড়েরই একটি সরকারী স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয়। যেহেতু শুরু থেকেই তাঁর মনের ঝোঁক দ্বীনী তালীমের প্রতি ছিল, এজন্য তাঁর অন্তর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন ছিল।

তাঁর পরিচ্ছন্ন অন্তর এর থেকে বেশি আধুনিক শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়নি। এজন্য তিনি স্কুলের শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। দিন দিন তাঁর এ রং আরো গাঢ় হতে লাগল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণে যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু যখন হযরত নিজেই দ্বীনী তালীমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সম্মানিত পিতার সমস্ত পেরেশানী দূর হয়ে গেল। এবং শেষ পর্যন্ত ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর আব্বাজান মরহুম স্কুলের শিক্ষা থেকে সরিয়ে নিজ এলাকার মাদরাসায়ে ইসলামিয়া বিরলায় নিয়মতান্ত্রিক দরসে নিযামীর শিক্ষা আরম্ভ করিয়ে দেন। এ মাদরাসায় তিনি শরহেজামী জামাআত পর্যন্ত মাওলানা হাকীম মাহফূয আলী ছাহেব দেওবন্দী রহ. এর নিকট থেকে অর্জন করেন। আর এরই সাথে সাথে তাজবীদ শাস্ত্রে জামালুল কুরআন ইত্যাদি গ্রন্থও পাঠ করেন। অতঃপর মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব লাখনভী রহ. এর তত্ত্বাবধানে থেকে শরহে বিকায়া, জালালাইন শরীফ, মোল্লা হাসান ইত্যাদি কিতাবের তালীম খুব মেহনত ও পরিশ্রম করে তাঁর নিকট থেকেই অর্জন করেন।

একদিকে আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধি অপরদিকে অকল্পনীয় পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় ছাত্র জামানাতেই তাঁর ইলমী যোগ্যতায় শোভা বর্ধন করছিল। যে কারণে তাঁর ইলমী যোগ্যতা ছাত্রজামানাতেই মজবুত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছাত্র জামানাতেই এটার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, যদি কখনো সম্মানিত শিক্ষক দরসে আসতে না পারতেন, তাহলে নিজ সাথীদেরকে শুধু তাকরার আর মুযাকারাই নয় বরং স্বতন্ত্রভাবে সবক পড়িয়ে দিতেন, যা দ্বারা তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছে দেন। সেখানে তিনি ১৩৪৭ হিজরীতে জামাআতে মিশকাত শরীফে ভর্তি হন। টানা চার বছর তিনি দেওবন্দে অবস্থান করেন। প্রথম বছর মিশকাত শরীফ, হেদায়া আউয়ালাইন ইত্যাদি কিতাবের তালীম হাসিল করেন। দ্বিতীয় বছর দাওরায়ে হাদীসের তাকমীল করেন। শেষের দুই বছর অন্যান্য শাস্ত্র শেখায় ব্যয় করেন। এভাবে টানা চার বছর তিনি পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকেন।

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর সাথে গায়েবানা সম্পর্ক ও ভক্তি তো তাঁর বেহেশতী যেওর ও মাওয়ায়েয ইত্যাদি অধ্যয়নের দ্বারা বাল্যকালেই

হয়েছিল। তাইতো হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এই পরম ভক্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ এভাবে করেছেন, "বড় বড় আলেমের সাথে আমার বারবার সাক্ষাত হয়েছে। এবং অনেক প্রসিদ্ধ সূফী ছাহেবের সান্নিধ্যেও বসার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি মুরশিদ থানভী রহ. এর মত আর কাউকে পায়নি আর মনের এমন তীব্র টানও আর কারো প্রতি হয়নি।"

যে বছর হযরত দেওবন্দে ভর্তি হন ঐ বছরই হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ইসলাহী চিঠিপত্র আদান-প্রদানও আরম্ভ করে দেন। কিছুদিন পর ১ম বা ২য় বছর নিয়মতান্ত্রিকভাবে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর হাতে বাইআত হন।

এভাবে ১৩৫১ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে পারিভাষিক সনদের সাথে সাথে বাতেনী তারবিয়াত তথা আধ্যাত্মিক দীক্ষার সনদও (খিলাফত) ঐ বছরই ২৫ শাওয়ালুল মুকাররাম ১৩৫১ হিজরীতে লাভ করেন।

সনদে ফযীলত ও সনদে খিলাফতের এই সম্মানের পাশাপাশি দ্বীনের ফয়েয হাসিলের দুর্নিবার চুম্বক আকর্ষণ এর কারণে অল্প বয়সেই তাঁর গণনা হযরত থানভী রহ. এর ঐ এগারো জন নির্ধারিত খলীফাদের মধ্যে হতে থাকল, যাঁদের উপর হযরত থানভী রহ. এর বিশেষ আস্থা ছিল।

জালালাবাদ থানা ভবনের পার্শ্বে হওয়ার কারণে থানাভবনের মতই এখানের লোকেরাও উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সীমাহীন ইজ্জত-সম্মান করেন। বিশেষত: জালালাবাদের খান ছাহেবরা তো এ গুণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফলশ্রুতিতে অত্র এলাকার মানুষের হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক হয়ে যায়। হযরতের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁদের অন্তর টইটম্বুর হয়ে উঠে।

এই ইখলাস ও মহব্বতের ফসলই আজ জামি'আ মিফাতাহুল উলূমের আকৃতিতে আপনাদের সামনে। যা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, বরং উন্নত দীক্ষাকেন্দ্রও বটে। যার ভিত্তিপ্রস্তর হাকীমুল উম্মাত হযরত

থানভী রহ. নিজেই ১৩৩৬ হিজরীর ৩রা মুহাররাম বুধবার রেখেছেন এবং আজীবন এর অভিভাবক ছিলেন।

হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর নিজ এলাকা সারায়ে বিরলার মাদরাসায়ে ইসলামিয়ায় পাঠদানের খেদমত আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ পাকের রহমতে এবং স্বীয় মুরশিদ হযরত থানভী রহ. এর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. জালালাবাদ আগমন করেন।

হযরত থানভী রহ. ১৩৫৬ হিজরীতে হযরতকে মাদরাসা মিফতাহুল উলূমে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর কী হল? তিনি তো ব্যস মাদরাসা মিফতাহুল উলূম জালালাবাদেই থেকে গেলেন। মাদরাসাকেই নিজ বিছানা বানিয়ে নেন। দিন-রাত দরস-তাদরীস, ওয়ায-তাকরীর, তাসনীফ-তালীফ বা গ্রন্থরচনা, মাদরাসার ইন্তিযাম ও ব্যবস্থাপনার খেদমতে মশগুল হয়ে গেলেন। এই জালালাবাদ কেই তিনি স্বীয় আবাসস্থল বানিয়ে নেন। যদ্দরূন মাদরাসায় এক নতুন রূহ পড়ে গেল। আর মিফতাহুল উলূম দিন-রাত তালীম তারবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষা এবং নির্মাণশিল্পে উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে আজ এক বিশাল মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে।

এখানে তিনি মীযান ইত্যাদি প্রাথমিক কিতাব থেকে আরম্ভ করে বুখারী শরীফ পর্যন্ত দরসে নিযামীর অনেক কিতাব একাই পড়িয়েছেন। আর যেই মেহনত ও গুরুত্বের সাথে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের কিতাবের দরস দিতেন ঠিক অনুরূপভাবে সারফ, নাহু, মানতিক, ফালসাফা ও উর্দূর প্রাথমিক কিতাবও পড়াতেন।

কুরআনে মাজীদের সাথে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ফলশ্রুতিতে কুরআনে মাজীদের সবক সব সময় নিজে পড়াতেন। তিনি ছাত্রদের বুঝ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বক্তব্য রাখতেন এবং সবকের সময় অত্যাশ্চর্য মণি-মুক্তা ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর দরসে উপস্থাপন ভঙ্গি ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। সহজ সরল প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আওয়াজ ছিল খুব পরিস্কার, আর থেমে থেমে কথা বলার কারণে শ্রোতাদের খুবই আনন্দ লাগত। প্রতিটি বাক্য বিশেষ ঢংয়ে শান্তভাবে উচ্চারণ করতেন এবং সব শ্রেণীর তালিবে ইলমদের পূর্ণ খেয়াল রাখতেন।

হযরতওয়ালা রহ. একদিকে যেমন দ্বীনের অনেক বড় আলেম ছিলেন অন্যদিকে একজন ক্ষুরধার লেখক ও কলামিষ্টও ছিলেন। যার অনুমান তাঁর রচনাবলী থেকে খুব সহজেই করা যায়। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা ৩৫টি, যা নিম্নরূপ :

১. শরীয়ত ও তাসাওউফ ১ম ও ২য় খন্ড
২. তালীমাতে ইসলামী ৫ খন্ডে
৩. তাকলীদ ও ইজতিহাদ
৪. প্রাচীন ফিকহের নতুন সংস্করণের ক্ষতিসমূহ
৫. ইহতিমাম ও শূরা
৬. শূরা হাইআতে হাকেমা নেহী হ্যায়
৭. আমীর ও মজলিসে শূরার শরয়ী পদমর্যাদা
৮. স্ট্রাইক (পুস্তিকা)
৯. মালফূযাতে স্ট্রাইক
১০. আলহজ্ব
১১. ইলমের ফযীলত (পুস্তিকা)
১২. ইলমের ফযীলত (ওয়ায)
১৩. নারী শিক্ষার ব্যাপারে বিভ্রান্তির অপনোদন
১৪. উসূলে তাবলীগ
১৫. মাদারিসে ইসলামিয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পয়গাম
১৬. যিকরে ইলাহী
১৭. যিকরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
১৮. ইসলাম ও সাধারণ নিরাপত্তা
১৯. আত তাওহীদুল হাকীকী
২০. খেতাবে মাসীহুল উম্মাত
২১. হায়াতুস সালিক

২২. যিয়াউস সালিক
২৩. মাওয়ায়েযে মাসীহুল উম্মাত ২ খন্ড
২৪. মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত ২ খন্ড
২৫. ফযলুল বারী ফী দারসিল বুখারী (অপ্রকাশিত)
২৬. জিহাদ আওর ইসলাহে নফস
২৭. ইওয়ানে তরীকত বা তরীকতের প্রাসাদ
২৮. মাকতূবাতে ছালাছাহ
২৯. আলজুমুআহ (পুস্তিকা)
৩০. জুমুআর ব্যাপারে আকাবিরের ফাতওয়া
৩১. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সলরের প্রশ্নের উত্তর, ইত্যাদি।

এমনিতেই তো হযরতওয়ালা রহ. এর সমস্ত রচনাই অতুলনীয় এবং ইলমী তাহকীক ও সূক্ষ্মতার সুস্পষ্ট নমূনা, কিন্তু "শরীয়ত ও তাসাওউফ" গ্রন্থটির শানই আলাদা। যার মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাসাওউফ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সমস্ত উ'লূম ও ফুনূনের সাথে হযরতের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারপরও তাসাওউফ শাস্ত্রের সাথে ছিল হযরতের সীমাহীন হৃদ্যতা। এটাই ছিল তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এটাকেই তিনি নিজ জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। যে কারণে অনেক বড় বড় মনীষী তাঁকে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম বলেছেন। স্বয়ং হযরতের পরম শ্রদ্ধাভাজন উসতাদ হযরত মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব লাখনভী রহ. যিনি নিজেও একজন বড় আলেম ও সূফী হওয়ার পাশাপাশি হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মুজাযে সোহবতও ছিলেন। তিনি আমাদের হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. কে শুধুমাত্র তাসাওউফের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই নয় বরং নিজ যোগ্য এই শিষ্যের কাছে বাইআতও হয়েছেন এবং খেলাফতও লাভ করেছেন। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তিনি তাসাওউফের কত উঁচু আসনে সমাসীন ছিলেন।

তাঁর স্বতন্ত্র আবাস যদিও জালালাবাদই ছিল কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের ভেতর এবং বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি চন্ডিগড়, দিল্লী, হায়দারাবাদ, ব্যাঙ্গলোর, মহীশূর, কাশ্মীর, কর্ণাল ইত্যাদি এলাকায় সফর করেন। আর সেখানে ভক্তবৃন্দদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওয়াযও করেছেন।

উপমহাদেশ ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ, বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সিরিয়া, মিসর ও সৌদী আরবেও সফর করেছেন। পাকিস্তানে তো বহুবার তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

এভাবে তাঁর ইলমী ও রূহানী ফয়েয এ সমস্ত দেশ ও অঞ্চলেও পৌঁছেছে। আর নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীতে তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মানুষ এখনো বিদ্যমান। সফরের ব্যাপারে তিনি দারুণ কার্যকরী একটি উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন–

سفر میں جاؤ تو غصہ اور آرام گھر چھوڑ جاؤ

অর্থাৎ "সফরে গেলে গোস্বা ও আরামকে ঘরে রেখে যাও।"

তিনি তাঁর নামের অর্থগত দিক দিয়েও আপাদ-মস্তক "মাসীহ" এবং এর জীবন্ত নমূনা ছিলেন।

জানা নাই কত পেরেশান হৃদয় মানুষ তাঁর নিকট আসত এবং সান্ত্বনা ও সমবেদনার পাথেয় সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেত। জানা নাই কত দুঃখী মানুষ তাঁকে স্বীয় দুঃখের কথা শুনিয়ে আরাম লাভ করত।

এসব বিষয়ের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে স্নেহ, ভালবাসা, সদ্ব্যবহার ও ভদ্রতা জাতীয় অসংখ্য গুণাবলী চূর্ণ করে ভরে দিয়েছিলেন। তার উপর অতিরিক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর কথাবার্তা খুব মিষ্টি মহব্বতপূর্ণ ও স্নেহসুলভ হত। বাক-ভঙ্গিতে কখনো কঠোরতা বা রূঢ়তা বুঝা যেত না। প্রচন্ড রাগের সময় সবচেয়ে শক্ত যে কথাটা বলতেন, সেটা হল "জংলী কবুতর"।

অশোভন বাক্য তো অনেক দূরের কথা। কখনো তিনি নিজ পুরো জীবনে কাউকে "আহমক" পর্যন্ত বলেননি। তাঁর অন্তর সব সময় বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহে সিক্ত থাকত। তাঁর মেজাজ কঠোরতা, তিক্তকথা থেকে

পবিত্র ছিল। তাকওয়া ও পরহেযগারী, বিনয় ও নম্রতা, সততা ও সাধুতা, ক্ষমা ও বদান্যতায় তিনি অনুকরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ তো কেমন যেন তাঁর বিশেষ অস্ত্র ছিল। এটা তাঁর এমন অস্ত্র ছিল যে, "ভাল ভাল" মানুষ এর আঘাত (?) থেকে বাঁচতে পারত না, বড় থেকে বড় বিরোধিতাকারী তাঁর এই অস্ত্রে ধরাশায়ী হয়ে যেত।

হযরতওয়ালার বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির কথা আর কী লিখব! উচ্চতা মধ্যম পর্যায়ের। সূরত নিষ্পাপসুলভ, গায়ের বর্ণ সাদা লালমিশ্রিত, চিবুকে সুন্দর দাড়ি, পোশাকের ক্ষেত্রে কল্লিদার কুর্তা, মোগলী পায়জামা, শীতকালে তুলা ভরা কানটুপী, আর গ্রীষ্মকালে সব সময় পাঁচকল্লি টুপী, যা শুধুমাত্র দেখার সাথে সম্পর্ক রাখত, আর ব্যস।

কোন উর্দূ কবি বড় সুন্দর বলেছেন–

کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار
آنکھوں میں بس گئے دل وجاں میں سما گئے

কত সুদর্শন মানুষ ছিলেন যাঁকে একবার দেখা মাত্রই চোখে লেগে গেছে ও অন্তরে বসে গেছে।

হযরতের দুটি বিবাহ হয়েছিল। প্রথম বিবাহ ছাত্র যমানাতেই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীও الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ বা "নেককার রমণীগণ নেককার পুরুষদের জন্য" (সূরা নূরঃ আয়াত নং ২৬) আয়াতের সুস্পষ্ট নমূনা ছিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর নিকট বাইআত ছিলেন। তাঁর থেকে চারজন ছেলে জন্মলাভ করে। ছোটকালেই যাঁদের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। সম্মানিতা স্ত্রীর ইন্তিকালের পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। বর্তমান সমস্ত সন্তান এই স্ত্রীর গর্ভেই হয়েছেন। ইনিও প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় নেকদিল, লজ্জাবতী, বিদূষী, নেকসীরত ও খুবসূরত নারী ছিলেন। তাঁর থেকে তিন কন্যা এবং এক পুত্র হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সফিউল্লাহ খান ছাহেব (হযরত ভাইজান) জন্ম লাভ করেন। যিনি পরিপূর্ণ শিক্ষা মাদরাসা মিফতাহুল উলূম জালালাবাদেই সম্পন্ন করেন। ১৩৭৮ হিজরীতে এ মাদরাসা থেকেই ফারাগাতের সনদ লাভ করেন। এবং নিজ সম্মানিত পিতার

স্নেহের ছায়ায় থেকে জাহেরী ও বাতেনী কামালাত অর্জন করেন। এক লম্বা সময় পর্যন্ত এই মাদরাসাতেই দরসে নিযামীর প্রাথমিক কিতাবাদী হতে শুরু করে হেদায়া পর্যন্ত দরস দিয়েছেন। ১৩৯৭ হিজরীতে হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. মাদরাসার ইহতিমাম ও ইনতিযামের দায়িত্ব তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। যেটাকে তিনি অদ্যাবধি অত্যন্ত সুচারুভাবে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন।

"হযরতজী" মাসীহুল উম্মাত রহ. নিজ ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে (পহেলা যিলকদ ১৪১২ হিজরীতে) তাঁকে "বাতেনী দৌলতের"ও আমানতদার বানিয়ে দিয়ে গেছেন। এবং তাঁকে খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

হযরত মাসীহুল উম্মাত রাহ. নিজ জীবনের চুরাশিটি মানযিল অতিক্রম করেছিলেন। এই বৃদ্ধ মুসাফির চলতে চলতে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন তাঁর আরামের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। এছাড়া শারীরিক অসুস্থতা দীর্ঘদিন থেকে কিছুতেই তাঁকে ছাড়ছিল না। রোগের কারণে খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে ১৪১৩ হিজরীর ১৭ জুমাদাল উলা, মোতাবিক নভেম্বর ১৯৯২ ঈসায়ী পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মহান আল্লাহর যিকিরে থাকা অবস্থায় এই পরিপূর্ণ সূর্য যা "সারায়ে বিরলা" থেকে অমিত তেজের সাথে উদিত হয়েছিল, জালালাবাদের মাটিতে ডুবে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

১৭ জুমাদাল উলার দিনটিও বড় অদ্ভুত একটি দিন ছিল। ঐ দিন এক আশেকে নবীর জানাযা খুব ধুম-ধামের সাথে বের হচ্ছিল। জানাযা বের হওয়া মাত্রই জমিন কেঁপে উঠল, আকাশ দুলে উঠল। মানুষদের মধ্যে ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির নীরবতা। প্রায় আড়াই লক্ষের কাছাকাছি মানুষ একত্রিত হল। শোকের আতিশয্যে মানুষ স্রোতের মত আসছিল। পুরো ময়দান এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। কবির ভাষায় এভাবে বলা যায় :

اگر یہ دیکھنا چاہو قیامت کس کو کہتے ہیں
اٹھو محفل سے باہر آؤ اپنی رہ گذر دیکھو

যদি দেখতে চাও কিয়ামত কাকে বলে? তাহলে মাহফিলে থেকে উঠে বাইরে আস। স্বীয় চলাচলের পথটা একটু দেখ।

ঐ সময় এক অত্যাশ্চর্য অবস্থা ছিল। প্রত্যেকেই শেষ সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব আর প্রত্যেকেই কবর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পেরেশান দেখা যাচ্ছিল।

প্রায় চারটার দিকে দাফন কাফন সম্পন্ন হয়। আর জানাযার নামায হযরতের শেষ জীবনের খাদেম জনাব মাওলানা ইনায়েতুল্লাহ ছাহেব লন্ডনী পড়ান। সকলেই নিজ অন্তরে পাথর রেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক এই নশ্বর দেহকে মাটির কাছে সমর্পণ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এর পূর্ণ মাগফিরাত নসীব করুন। তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত রহ.	
১. নিজ পথ ও পন্থার উপর দৃঢ় থাকা চাই	৩১
২. সংশোধনের তিনটি স্তর আছে	৩১
৩. নিয়মনীতিসমূহ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হয়	৩২
৪. নিজের মধ্যে যে গুণটা নাই সেটা প্রকাশ করে দিবে	৩৩
৫. আকাবিরে দেওবন্দের ইলমী যোগ্যতা	৩৩
৬. প্রত্যেক সোসাইটি অনুসরণের যোগ্য নয়	৩৪
৭. হযরত থানভী রহ. এর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অভিযোগ ও তার উত্তর	৩৫
৮. মজলিসে দৌড়ে এসে প্রবেশ করা গাম্ভীর্য পরিপন্থী কাজ	৩৫
৯. পেরেশানকারী কথা ও কাজ থেকে আল্লাহর পথের পথিকদের পৃথক থাকা উচিত	৩৬
১০. মানব সেবার জন্য তোমাদেরকে বড় বানানো হয়েছে	৩৬
১১. নিসবতেরও প্রভাব আছে	৩৭
১২. উলামায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে হযরত থানভী রহ. এর মূল্যবান উপদেশ	৩৭
১৩. যিকির ও তাকওয়ার উদাহরণ	৩৮
১৪. শরীয়তের সৌন্দর্য হল তরীকতে	৩৮
১৫. প্রকৃত বিনয়ের পরিচয়	৩৯
১৬. সময় ও শরীয়তের হক আদায় করা	৪১
১৭. রাসূলুল্লাহ সা. সর্বশেষ নবী হওয়ার আজীব প্রমাণ	৪৩
১৮. কুমন্ত্রণার আজীব চিকিৎসা	৪৪
১৯. সময়ের খুব মূল্যায়ন করা চাই	৪৫
২০. নফসে লাওয়ামা বা তিরস্কারকারী আত্মার স্বরূপ	৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১. কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত	৪৬
২২. শয়তান তাওবা করতে বাঁধা দিলে তার বাঁধা মানবে না	৪৬
২৩. আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৪৭
২৪. কিরামান কাতিবীন এর বদলির হেকমত এবং وَسَطًا শব্দের বিশ্লেষণ	৪৮
২৫. নামায হেফাযতের মর্মকথা	৫০
২৬. হাদিয়া প্রদানের সময় স্রেফ মহব্বতের নিয়্যত থাকবে	৫০
২৭. শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ আসল কাজ, বিশেষ অবস্থা নয়	৫১
২৮. "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ" এর মর্মকথা	৫২
২৯. সময় সম্পদ থেকেও অধিক মূল্যবান	৫৪
৩০. শরীয়তের সীমারেখার বাইরে যাওয়া যাবে না	৫৪
৩১. গভীর ভালবাসার চিহ্নসমূহ	৫৬
৩২. স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ	৫৬
৩৩. কখনো ছোটদের বিশেষ দৃষ্টিতে ঐ প্রভাব থাকে যা বড়দের দৃষ্টিতে থাকে না	৫৭
৩৪. গোস্বার আদবসমূহ	৫৯
৩৫. এ যুগে বেশি শোগলের প্রয়োজন নেই	৫৯
৩৬. আমল ও আখলাক ঈমানের পূর্ণতার সাক্ষী	৬০
৩৭. প্রকৃত তালাবার নিসবত মাআল্লাহ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক) দ্রুত অর্জিত হয়	৬০
৩৮. মূলনীতির আলোকে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা বের করতে পারাই প্রকৃত ইলম	৬১
৩৯. বিজাতির সাথে সাদৃশ্যের কারণে ঈমানে দুর্বলতা চলে আসে	৬১
৪০. নসীহতের আদবসমূহ	৬২
৪১. মুসলমানের দোষ শুধু তার উপরই স্নেহের সাথে প্রকাশ করবে	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪২. যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সংশোধন পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়	৬৩
৪৩. প্রকৃত যিকিরকারীর জন্য সান্ত্বনা	৬৩
৪৪. একটি অদ্ভুত ফিল্ম	৬৬
৪৫. যার নিজের ফিকির নাই, সে অন্যের কী ফিকির করবে?	৬৮
৪৬. ভেজা সুলূক উদ্দেশ্য, শুকনো সুলূক নয়	৭০
৪৭. বাহাদুরীর দাবী হল দুর্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা	৭১
৪৮. স্ত্রীর কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার প্রতিক্রিয়া	৭২
৪৯. বাসীরাত, হেদায়াত ও রহমতের মধ্যে ধারাবাহিকতা	৭৩
৫০. মুমিন ব্যক্তির দুনিয়াতে কিভাবে থাকা উচিত?	৭৪
৫১. ইলম এর সাথে হিলমও (নম্রতা) জরূরী	৭৫
৫২. বিনা প্রয়োজনে টেক লাগিয়ে চারজানু হয়ে বসা অনুচিত	৭৭
৫৩. মেহমানের জন্য কিছু আদব	৭৭
৫৪. যেমন অতিথি সেরকম আপ্যায়ন	৭৯
৫৫. কাফের ও মুশরিক খোদাদ্রোহী	৮৩
৫৬. কঠোরতার শর্তসমূহ	৮৮
৫৭. প্রশান্তি আসে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা, ধারণাপ্রসূত প্রমাণ দ্বারা নয়	৮৯
৫৮. মুজাদ্দিদের একটি আলামত	৯০
৫৯. শরীয়তের দোষ অনুসন্ধান করা খুবই অন্যায়	৯০
৬০. আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক কষ্ট হয়	৯১
৬১. "ঘুমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নেই" কথাটার মর্ম	৯৫
৬২. আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে অশ্রু পড়ার মূল্য	৯৬
৬৩. নবীর পদতলে ওলীর দীক্ষা, কথাটার মর্ম	৯৭
৬৪. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা উচিত	৯৭
৬৫. যাঁরা খাদেমে ইলম, তাঁদের ব্যবসায় জড়ানো অনুচিত	৯৭
৬৬. গুনাহের উপলক্ষও গুনাহ	৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৭. তালিবানে ইলমে নবুওয়াতের নিয়্যত কী হওয়া চাই?	৯৯
৬৮. ভাল এবং পাতলা কাপড় পরিধানের বিধান	১০২
৬৯. ঈমান ও যিকির আহার স্বল্পতার উপলক্ষ	১০২
৭০. কাশফ ও ইলহাম অর্থহীন জিনিস	১০৩
৭১. জোশ কোন কৃতিত্ব নয় বরং হুঁশ ও বুদ্ধিমত্তাই হল কৃতিত্বের ব্যাপার	১০৪
৭২. আমল আকাংখিত, আহওয়াল বা বিশেষ অবস্থা আকাংখিত নয়	১০৯
৭৩. একটি দুর্লভ মালফূয	১১২
৭৪. তাকওয়া এবং যিকির প্রশান্তির উপলক্ষ	১১২
৭৫. প্রকৃত মর্যাদা কী?	১১৩
৭৬. ঘরের কাজ বা বাইরের কাজ মর্যাদা পরিপন্থী নয়	১১৩
৭৭. শাইখের স্থানেরও আদব আছে	১১৩
৭৮. ভন্ড পীরদের থেকে সাবধান	১১৪
৭৯. মাশায়িখের মাধ্যমে ইসলাহ করানো জরুরী	১১৭
৮০. অত্যন্ত সুন্দরভাবে তারবিয়্যত হওয়া উচিত	১১৮
৮১. উসতাযের প্রশংসা করা উচিত। শিষ্যের নয়।	১১৯
৮২. ঈমান হল ভয় ও আশার মাঝামাঝি একটি অবস্থা	১২০
৮৩. ভালোবাসা থাকলে কষ্ট সহ্য করা সহজ	১২১
৮৫. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীন এখনো আছেন	১২৪
৮৫. তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক	১২৫
৮৬. মহান আল্লাহর মহব্বতই আসল, কিন্তু সাথে ভয়ও থাকতে হবে	১২৮
৮৭. হযরত আদম আ. এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাখ্যা	১২৮
৮৮. ভালোবাসার অত্যাশ্চর্য প্রতিক্রিয়া	১৩০
৮৯. এই শরীর জগত মহান আল্লাহর মাদরাসা	১৩২
৯০. আনাড়ী মাশায়িখের অবস্থা	১৩৩
৯১. ভালোবাসা থাকলে নিজেই কষ্ট করে	১৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
৯২. ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিক্ত জিনিসও মিষ্টি মনে হয়	১৩৫
৯৩. কাজ হল আসল উদ্দেশ্য, পরিণামের চিন্তা করতে নেই	১৩৫
৯৪. ধর্মই আমানত ও সততার রক্ষাকবচ	১৩৬
৯৫. সময়ের মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী	১৩৬
৯৬. তাসাওউফ হল চরিত্র পরিশুদ্ধকরণের নাম	১৩৭
৯৭. তাবলীগের জন্য পাঁচটি শর্ত	১৩৯
৯৮. কানূন মূলত: সহজ হয়	১৪০
৯৯. খানকায় যাওয়া ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন লাভ করা সম্ভব নয়	১৪১
১০০. ইলমের উসীলা দিয়ে দু'আ করা চাই	১৪১
১০১. আত্মশুদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট একজন শাইখ জরুরী	১৪২
১০২. শাইখ ইসলাহের জন্য মৌখিক ধরপাকড়ও করেন	১৪২
১০৩. বড় মুসীবত দূর করার জন্য প্রয়োজনে ছোট মুসীবত অবলম্বন করবে	১৪৫
১০৪. আকল হিসেবে মানুষ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে	১৪৬
১০৫. কুধারণা আসা ও আনার পার্থক্য	১৪৮
১০৬. শিক্ষা ও সুলূকের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা জরুরী	১৪৮
১০৭. ইসলাহের ক্ষেত্রে শাইখের সাথে মুনাসাবাত জরুরী	১৪৯
১০৮. আন্তরিক খুশী ছাড়া কারো সম্পদ গ্রহণ করা জায়িয নেই	১৫০
১০৯. শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া অনুচিত	১৫১
১১০. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সাদৃশ্যও কাজ বানিয়ে দেয়	১৫২
১১১. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১৫৪
১১২. শাইখের সম্মানের প্রভাব	১৫৭
১১৩. মৃত্যুকে ভয় পাওয়া মুমিনের শান নয়	১৫৯
১১৪. আমাদের দুটি ঘর, বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ	১৬০
১১৫. সম্পর্ক উন্নত করার পদ্ধতি	১৬২
১১৬. মশ্কের দ্বারা সবকিছু সহজ হয়ে যায়	১৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৭. মানা কাকে বলে?	১৬২
১১৮. কাশফ ও কারামাত ভ্রুক্ষেপযোগ্য বিষয় নয়	১৬৩
১১৯. শাইখের মুজাতাহিদ হওয়া উচিত	১৬৫
১২০. নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া তারবিয়্যাতের অনিবার্য ফসল	১৬৬
১২১. হযরত আদম আ. এর ভুলের উপর স্বীয় গুনাহের তুলনা করা অনুচিত	১৬৯
১২২. মুরীদদের পরীক্ষা নেয়ার কারণ	১৭০
১২৩. যুদ্ধের দুটি কৌশল কুরআনে পাক শিখিয়েছে	১৭৩
১২৪. দুনিয়ার মহব্বতের মূল হল অহংকার	১৭৪
১২৫. কথা কম বলা সুলূকের অপরিহার্য বিষয়	১৭৪
১২৬. ইনসাফ ও অনুগ্রহের মধ্যে পার্থক্য	১৭৭
১২৭. মানুষ চার প্রকারের হয়। অদ্ভুত বিশ্লেষণ	১৮৪
১২৮. তালিবে ইলমদের চুল বড় রাখার ক্ষতি	১৮৬
১২৯. প্রকৃত আদব ও বাহ্যিক আদবের পার্থক্য	১৮৬
১৩০. মজলিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব	১৮৮
১৩১. রিয়ার হাকীকত : অত্যাশ্চর্য উদাহরণের মাধ্যমে	১৮৮
১৩২. আশা না করার মধ্যে শান্তি	১৯০
১৩৩. ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের জন্য বৈধ উপকরণ একত্রিত করা জায়িয	১৯৩
১৩৪. শাইখের কথা না শুনলে ক্ষতি হয়	১৯৪
১৩৫. শিথিলতার সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ	১৯৫
১৩৬. হযরত হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাতের মমত্ববোধের ঘটনা	১৯৭
১৩৭. ছাত্রদের সংগঠন থাকা উচিত নয়	২০০
১৩৮. পরামর্শের আদব বা বাস্তবতা	২০০
১৩৯. হযরত থানভী রহ. এর খানকাহের অবস্থা	২০০
১৪০. হযরত থানভী রহ. এর খানকাহ সুপ্রিমকোর্ট ছিল	২০১
১৪১. ইলম অর্জনের জন্য নির্জনতা জরুরী	২০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪২. তালীম ও তারবিয়্যত বা শিক্ষা ও দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য	২০৩
১৪৩. হক এবং সুনাম একত্রিত হতে পারে না	২০৩
১৪৪. আমাদের বড়দের অত্যাশ্চর্য বিনয়	২০৩
১৪৫. আরেফের পরিচয়	২০৫
১৪৬. ইলম ও সুলূকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে পার্থক্য	২০৭
১৪৬. সাধারণ মানুষের নিরাপদ পথ	২০৯
১৪৭. অন্তর ও মস্তিষ্কের শান্তির উপলক্ষ	২০৯
১৪৯. অধিক যিকিরের একটি প্রতিক্রিয়া	২১০
১৫০. মুসলমান নিজেকে কাফেরের সাথে তুলনা করবে না	২১০
১৫১. ওয়াসওয়াসার দ্বারা দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন ক্ষতি হয় না	২১১
১৫২. একটি ফিক্হী মূলনীতি	২১১
১৫৩. কল্পনাশক্তির নড়াচড়ার দ্বারা পেরেশানী হয়	২১২
১৫৪. ইলমী ও আমলী শক্তির কৃতিত্ব	২১৩
১৫৫. মানুষ হওয়া অনেক কঠিন	২১৩
১৫৬. রাজনীতির প্রকৃত মর্ম	২১৫
১৫৭. ইসলামী রাজনীতির কিছু সুপ্রভাব	২১৭
১৫৮. স্ত্রীর সাথে সুগভীর ভালোবাসা আল্লাহর ওলী হওয়ার আলামত	২১৭
১৫৯. মাদরাসার ছাত্রদের আভিজাত্য বজায় রাখা উচিত	২১৮
১৬০. খানকাহে অবস্থানের উপকারিতা	২১৮
১৬১. কাইফিয়্যাত যদিও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু আমাদের জন্য কাংখিত	২১৯
১৬২. সুলূক হল পূর্ণ আদবের নাম	২২২
১৬৩. আল্লাহর পথের পথিককে পোক্ত হতে হবে	২২৩
১৬৪. অলসতার কারণে ঢিলেমী আসে	২২৪
১৬৫. সন্দেহযুক্ত লোকমা ও হালাল লোকমার প্রভাব	২২৪
১৬৬. রিয়াযত জরুরী নয় বরং মুজাহাদা জরুরী	২২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬৭. ফতওয়ার আলোকে যেটা বৈধ তাকে হালাল মনে করতে হবে	২২৬
১৬৮. সফর খরচের ব্যাপারে তাহকীক	২২৬
১৬৯. কোষাধ্যক্ষেরও কিছু ক্ষমতা থাকে	২২৬
১৭০. আর্যরা পাক্কা মুশরিক	২২৭
১৭১. হুকূক কয়েক প্রকার	২২৭
১৭২. প্রকৃত ইলম হল নূরে বাতেনী	২২৮
১৭৩. তালাবায়ে ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মালফূয	২৩১
১৭৪. দুনিয়ার অদ্ভুত উদাহরণ	২৩৫
১৭৫. যিকির ও তাকওয়া উভয়টি একটি অপরটির সম্পূরক	২৩৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত রহ.

১. নিজ পথ ও পন্থার উপর দৃঢ় থাকা চাই

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. ইন্তিকালের কয়েক দিন পূর্বে একটি বিশেষ মজলিসে বলেন : প্রত্যেক 'সালিক' বা আল্লাহর পথের পথিককে সাধারণভাবে এবং আলেমকে বিশেষভাবে আত্মসংশোধনমূলক ও চরিত্র গঠনমূলক গ্রন্থসমূহ অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত এবং সেই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখা উচিত। যেমন হযরত থানভী রহ. এর 'কসদুস সাবীল' 'তাবলীগে দ্বীন', 'শরীয়ত ও তরীকত', 'ইকমালুশ শিয়াম'।

হযরতওয়ালার মাওয়ায়েয ও মালফূযাত এগুলোর মধ্যে সবকিছু আছে। প্রত্যেকের উচিত স্বীয় ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকির করা। নিজ পথ ও পন্থার উপর দৃঢ় থাকা চাই। এমন যেন না হয় যে, কেউ কিছু একটা লিখল বা বলল, ব্যস সেটারই অনুসরণ আরম্ভ হয়ে গেল।

২. সংশোধনের তিনটি স্তর আছে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সংশোধনের তিনটি ধাপ বা স্তর আছে।

১। আগ্রহ সৃষ্টি করা।
২। শিক্ষা দেয়া।
৩। পূর্ণতা সাধন করা।

আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাবলীগ জামাআত। দ্বীনী শিক্ষা হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী মাদরাসাগুলো। আর দ্বীনের পূর্ণতা সাধনের জন্য খানকাসমূহ। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবত ও সান্নিধ্য।

এটাকেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۱۱۹﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" (সূরা তাওবা : ১১৯)

প্রত্যেক কাজের কিছু সীমারেখা থাকে। এমনিভাবে দ্বীনের কাজেরও কিছু সীমারেখা থাকে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

৩. নিয়মনীতিসমূহ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রাহ. বলেন : হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর খানকায় কিছু নিয়মনীতি নির্ধারিত ছিল। কেউ কেউ এ সব নীতির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করত। তো এ আপত্তি অর্থহীন। এমনটি তো ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পূর্বসূরী মনীষীদের থেকেও প্রমাণিত। অনেক মাশায়িখের সাথে সাক্ষাতের জন্য অসংখ্য নিয়ম নির্ধারিত ছিল। সে তুলনায় তো হযরত থানভী রহ. এর এখানে কিছুই ছিল না। দরজায় দারোয়ান থাকত। প্রথমে সে শাইখের থেকে অনুমতি নিত। অনুমতি পাওয়া গেলে সাক্ষাত করা যেত।

এমনই এক শাইখের ঘটনা। বাদশাহ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। দারোয়ান আটকে দিয়েছে একথা বলে যে, প্রথমে আপনি অনুমতি নিয়ে আসুন। খাদেম ভেতরে গিয়ে বাদশাহের আগমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। শাইখ অনুমতি দিয়ে দিলেন। এই প্রতিবন্ধকতার ফলে বাদশাহ ক্ষুব্ধ হল। শাইখের দরবারে পৌঁছে একটি ফার্সী পঙতি পাঠ করল :

در درویش را درباں نباید

অর্থাৎ দরবেশের দরজায় দারোয়ান থাকা অনুচিত।

শাইখ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন :

بباید تاسگ دنیا نہ آید

অর্থাৎ অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে দুনিয়ার কুকুর আসতে না পারে।

হযরত থানভী রহ. এর এখানে কোন দারোয়ান ছিল না। একবার একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে খাদেমগণ দারোয়ান নির্ধারণ করতে চাইলে হযরত মঞ্জুর করেননি। আসল কথা হল, কিছু কিছু নিয়ম ব্যবস্থাপনাগতভাবে উভয় পক্ষের আরামের জন্য নির্ধারিত ছিল।

৪. নিজের মধ্যে যে গুণটা নাই সেটা প্রকাশ করে দিবে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন কোন ছাত্র আমার নিকট বুখারী শরীফের সনদ নেয়ার জন্য এসেছিল। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী রহ. এর কাছে গিয়ে সনদ নাও। আমি শাইখুল হাদীস নই।

এমনিভাবে অনেকে চিঠির মধ্যে আমাকে "শাইখুল হাদীস" লিখে দেয়। আমি এটাকে গোলবৃত্তির মধ্যে লিখে দেই এটা বুঝানোর জন্য যে, আমি শাইখুল হাদীস নই।

অনুরূপভাবে কেউ "হাফেয" লিখলে সেটাকেও গোলবৃত্তের মধ্যে লিখে দেই যে, আমি হাফেয নই। অবশ্য কেউ "হাজী" লিখলে তার উপর কোন চিহ্ন দেইনা। কেননা, আলহামদুলিল্লাহ, আমি হাজী। এছাড়া কেউ বাড়াবাড়ি মিশ্রিত উপাধি লিখলে সেটাও কেটে দেই।

৫. আকাবিরে দেওবন্দের ইলমী যোগ্যতা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. মিসর হিন্দুস্তান ইত্যাদি অঞ্চলের কুতুবখানাসমূহ থেকে উপকার লাভ করে লাখনৌতে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী রহ. এর খেদমতে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি লাখনৌ পৌঁছেন তখন মাওলানার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। পরে খেয়াল হল, আচ্ছা যখন এখানে এসেই পড়েছি, তখন দেওবন্দে যাই। যখন দেওবন্দ পৌঁছলেন এবং শাইখুল হিন্দ মাওলানা

মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. এর দরসে বসলেন তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর আজীবন দেওবন্দেই থেকে গেলেন।

৬. প্রত্যেক সোসাইটি অনুসরণের যোগ্য নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না"।

(সূরা বাকারাহ, আয়াত নং : ২০৮)

তো এ বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। তাহলে সোসাইটি বা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কী অর্থ? বরং যে সোসাইটির রঙে রঙীন হয়ে গেল মূলত সে শয়তানের অনুসারী।

লোকেরা বলাবলি করে, এই মৌলভী ছাহেবরা এখনো পেছনের দিকে দৌড়াচ্ছেন। এরা সেকেলে! কূপমন্ডুক! মসজিদের ভেড়া ইত্যাদি। না জানি আরো কত শিরোনাম তারা নির্ধারণ করে রেখেছে। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে দাবী করে আলোকিত মস্তিষ্কসম্পন্ন! এইসব হল শয়তানী চিন্তাধারা। অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর, তোমরা সঠিকপথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ১০৫)

যদি তোমরা হেদায়েতের উপর থাক, তাহলে সোসাইটি বা সমাজ তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। সমাজ যখন দেখে এই লোকটা খুব মযবূত তখন আর কিছু বলে না। এটা অভিজ্ঞতা।

৭. হযরত থানভী রহ. এর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অভিযোগ ও তার উত্তর

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হযরত মুজাদ্দিদ থানভী রহ. এর নেযাম ও ইন্তেযাম তথা ব্যবস্থাপনা দেখে জনৈক আপত্তি উত্থাপনকারী বললেন, সেখানের দরবারই নিরালা (অদ্ভুত) সেখানের কথা আর কী জিজ্ঞেস কর!

এটা শুনে হযরত থানভী রহ. বললেন, আরে আমার দরবার নিরালা হওয়ার কী আছে? তোমরাই নিরালা হয়ে গেছ। নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করে নিয়েছ, এজন্য নিরালা মনে হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এখানে তো পদ্ধতি সেটাই যা তেরশত বছর পূর্বে ছিল।

৮. মজলিসে দৌড়ে এসে প্রবেশ করা গাম্ভীর্য পরিপন্থী কাজ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : দৌড়ে এসে মজলিসে প্রবেশ করা অনুচিত। শরীয়ত গাম্ভীর্য বজায় রাখার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছে। শরীয়তের মাসআলা হল, নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে দৌড়ে এসে শরীক না হওয়া। বরং ধীর-স্থিরতার সাথে আসা। এইসব কিছু "হিলম" বা গাম্ভীর্যের অন্তর্ভুক্ত। "হিলম" শুধু এটা নয় যে, কেউ গালী দিল আর সহ্য করে নিল।

এটা তো বাঘের হিলম বটে, অন্যরা তাকে নিয়ে দুষ্টুমি করলে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু বলে না। শেষেও সামান্য একটু চোখ দেখায়।

আমি যখন দেওবন্দ পড়তে যাই, তখন নওদরা নামক স্থানে সীমান্ত এলাকার কিছু জুব্বা-আবাকাবা পরিহিত পাঠান তাকরার করছিল, আমিও গিয়ে বসে পড়লাম। তারা আমার সাথে রসিকতা আরম্ভ করে দিল। আমি নীরব থাকলাম। তৃতীয়বার যখন বিরক্ত করল তখনও চুপ থাকলাম। চতুর্থবার ঐ সীমান্ত এলাকার ছাত্রগুলো বলল, তুমি কেমন পাতান (পাঠান) আমরা তোমাকে কয়েকবার বিরক্ত করলাম অথচ তোমরা কোন গোস্বাই আসল না। তুমি কেমন পাতান!

যেহেতু সীমান্ত এলাকার মানুষ 'ঠ' সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না এজন্য 'পাঠান' কে 'পাতান' বলছিল। আমি বললাম, আমি শেরওয়ানী পাঠান আর 'শের' বা বাঘের গোস্বা আসে না। এটা শুনে তারা হেসে ফেলল।

৯. পেরেশানকারী কথা ও কাজ থেকে আল্লাহর পথের পথিকদের পৃথক থাকা উচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যেসব 'সালিক' আফ্রিকা, লন্ডন ইত্যাদি এলাকা থেকে সপরিবারে এখানে এসেছে তাদেরকে বলে দেয়া হয় যে, আপনারা এখানে দান-দক্ষিণার দরওয়াজা খুলবেন না। এতে বড় পেরেশানী সৃষ্টি হয়। ভিক্ষুকরা আসতে থাকে আর পেরেশান করতে থাকে, আর এই সব অভাবী মানুষদের অবস্থা হল এই যে, একবার যাকে কিছু দেয়া হবে সে বারবার ঐ পরিমাণই চাইতে থাকবে। আমার তো এটা দিন রাতের অভিজ্ঞতা। এজন্য যারা এখানে অবস্থান করেন তাদের সর্ব প্রকার পেরেশানী সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ থেকে দূরে থাকা চাই।

এমনিভাবে তালিবে ইলমরা মাদরাসায় ইলম অর্জনের জন্য এসেছে। সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসেনি। সম্পর্কধারী সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে এসেছেন, সুতরাং মাদরাসায় এসে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

১০. মানব সেবার জন্য তোমাদেরকে বড় বানানো হয়েছে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : তোমাদেরকে বড় বানানো হয়েছে মানুষের খেদমতের জন্য। এজন্য বড় বানানো হয়নি যে, অন্যের থেকে খেদমত নিবে। কবি বলেছেন–

خاص کند بندۂ بہر مصلحت عام را

অর্থাৎ, এক বান্দাকে খাস এজন্য করা হয় যেন তিনি সাধারণ মানুষের উপকার করতে পারেন।

শুধু কি নিজ সম্মান ও লাভের জন্যই বড় বানানো হয়? কখনো নয়, কেননা এমন বড়ত্ব তো একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, তাঁর যিম্মায় কারো কোন হক নেই।

১১. নিসবতেরও প্রভাব আছে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : নিসবতের দারুণ প্রভাব আছে। কোন বুযুর্গের সন্তান, তাঁর কারণে সম্মান পাওয়া যায় যে ইনি ঐ বুযুর্গের ছেলে। বুযুর্গের সম্মানের কারণে ছেলেও সম্মান পাচ্ছে। নতুবা, কে জিজ্ঞেস করে?

এমনিভাবে কেউ কোন বুযুর্গের খলীফা। যেমনই হোক না কেন, ঐ প্রসিদ্ধ বুযুর্গের নিসবতের কারণে তার সম্মান করা হচ্ছে। অথবা কেউ কোন বুযুর্গের স্নেহাস্পদ। এই নিসবতের কারণে লোকেরা তার সম্মান করে। 'নিসবত' বড় অদ্ভুত জিনিস। অবশ্য কোন কোন অকৃতজ্ঞ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। শাইখের মূল্যায়ন করে না।

১২. উলামায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে হযরত থানভী রহ. এর মূল্যবান উপদেশ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমি কী করব? আমার হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. পূর্ববর্তী সমস্ত আলেম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সার নির্যাস ছিলেন। যেহেতু তিনি শেষ যমানায় আগমন করেছেন। খাস মজলিসে একবার তিনি বলেও ছিলেন : "পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামের উপর যেসব হালত এসেছে, ঐসব হালত আমার একার উপর এসেছে।"

এমন মহান ব্যক্তিত্ব প্রচলিত রাজনীতির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামকে সতর্ক করে বলছেন : "হে আলেমগণ! বর্তমান যুগের রাজনীতি বড় রহস্যময় বস্তু। তোমরা এর পিছনে পড়োনা। জাতির নেতারাই এর পিছনে পড়ুক। বর্তমান যুগের রাজনীতির কূটচাল এরাই বুঝে। অবশ্য তোমরা যেটা করবে সেটা হল তাদের সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাবলীগ করবে।"

এদের মধ্যে যারা দাওয়াত ও তাবলীগ এর কাজ করবে তারা সাধারণ মানুষ হলে চলবে না বরং উচ্চশিক্ষিত খান্দানী মানুষ হতে হবে। খান্দানী মানুষ তথা অভিজাত বংশের হওয়া অনেক বড় নেয়ামত। বড় বংশের ছেলে

ছোট বংশের ছেলেদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় না। এজন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও দরিদ্র ছিলেন কিন্তু তাঁদের বংশ নীচু ছিল না। দেখুন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিকভাবে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু বংশের দিক দিয়ে নীচু ছিলেন না। বরং অত্যন্ত উঁচু বংশের ছিলেন।

১৩. যিকির ও তাকওয়ার উদাহরণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশেষ সম্পর্কের জন্য প্রথম শর্ত হল, তাকওয়া। যিকির হল কলবের পরিচ্ছন্নতার জন্য। দেখুন কারো কাছে আলো আছে কিন্তু যে জিনিস অনুসন্ধান করছে সেটার পরিচয় জানে না, তাহলে কি সে কাঙ্খিত বস্তু পাবে? কখনো নয়। তাকওয়া এমনই জিনিস। তাকওয়া ছাড়া মহান আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক হওয়া মুশকিল।

১৪. শরীয়তের সৌন্দর্য হল তরীকতে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মনে করুন স্ত্রী ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে না। ভারসাম্যহীন পথে চলে। নিজের পক্ষ থেকে এমন স্ত্রীর সাথে ইনসাফ বর্জন করা যাবে না। এটাকে "মাকামে আদল" বলা হয়।

ভাল মানুষের সাথে ভাল আচরণ করা এতে কৃতিত্বের কী আছে? খারাপ মানুষের সাথে ভাল আচরণ করা এটা হল কৃতিত্বের ব্যাপার। এটা হল "হুসনে সুলূক' বা সদ্ব্যবহার। এই সদ্ব্যবহারের দ্বারা শরীয়তের মধ্যে সৌন্দর্য আসে।

এখানে 'সদ্ব্যবহার' দ্বারা পারিভাষিক 'তাসাওউফ' বা আত্মশুদ্ধি উদ্দেশ্য। তো যতক্ষণ পর্যন্ত হুসনে সুলূক না হবে, শরীয়তের উপর পুরোপুরি আমল হবে না। এজন্য শরীয়তের সাথে তরীকত যুক্ত করা হয়েছে। কেননা, শরীয়ত যে সব বিধি-বিধান দিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করার যেসব পথ ও পন্থা আছে সেটাই 'তরীকত'। চাই সেটা বাহ্যিক বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হোক, বা অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত।

১৫. প্রকৃত বিনয়ের পরিচয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন কোন ক্ষেত্র আছে এমন যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অপমানজনক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেটা কোন অপমানের কাজ নয়।

আপনি কোন মাঠ পার হচ্ছিলেন, দেখলেন যে, একজন বয়স্ক মানুষ সামনে একটি বড় বোঝা নিয়ে বসে আছেন। তখন ঐ বৃদ্ধ বললেন, "মিঞাজী (মোল্লাজী) চলে যাচ্ছ! এটাও জিজ্ঞেস করলে না কেন আমি এখানে বসে আছি? আসল ব্যাপার হল লাকড়ির এ বোঝা খুব ভারী। আমি বুঝতে পারিনি। আমার হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি এটাকে তোমার মাথায় উঠিয়ে আমার বাসায় পৌঁছে দাও"।

তো এ কাজটি বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অপমানজনক কাজ। যদিও বাস্তবিকপক্ষে এতে অপমানের কিছুই নেই। এখন এই ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রকৃত বিনয় এসে না থাকে, তবে সে ঐ লাকড়ির বোঝা নিজের মাথায় কিছুতেই রাখতে পারবে না। বরং মনে মনে বলবে,

لَا يَنْبَغِيْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهٗ

"কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য নিজেকে অপদস্থ করা জায়িয নেই"।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২২৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৪৪৪)

এর মধ্যে তো অপমান! আসলে এ বেচারা হাদীস পড়েছে ঠিকই কিন্তু মর্ম বুঝেনি। প্রথমত মিঞাজী বা মোল্লাজী কথাটা শুনামাত্রই তার মেজাজ বিগড়ে যাবে। অবশ্য "মোল্লা" শব্দটা পূর্বের যুগে বড় আলেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। মোল্লা আলী ক্বারী রহ., মোল্লা জামী রহ. মোল্লা দোপিয়াজাহ প্রমুখ। কিন্তু বর্তমান যুগে এ শব্দটি মসজিদের মুআযযিন এর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। এজন্য মাওলানা ছাহেব নিজের জন্য এ শব্দ শ্রবণ করে বিষণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু এটা চিন্তা করা উচিত যে, সফরে বা অন্য কোথাও মোল্লা কে বলছে? একজন অনবগত ব্যক্তি বলছে। তার কথাবার্তার ধরনই এমন।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর কথা মনে পড়ল। একবার হযরত খানকাতেই অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি সেখানে আসলেন। আর এসে জিজ্ঞেস করলেন যে "আশরাফ আলী কে"? হযরতওয়ালা বললেন, তার সাথে আপনার কী কাজ? উত্তরে এই গ্রাম্য লোকটি বললেন, তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে মনে চাচ্ছে, সাক্ষাত করতে হবে। হযরতওয়ালা বললেন, আমিই আশরাফ আলী। লোকটি বললেন যে, না আপনি নয়। হযরতওয়ালা বললেন : কিভাবে বুঝলেন? তখন তিনি বললেন, সে তো লাল সাদা ছিল। হযরতওয়ালা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কতদিন পূর্বে দেখেছিলেন? উনি বললেন, ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি পানিপথ গিয়েছিলেন। সেখানে খুব সুন্দর ওয়ায করেছিলেন।

হযরতওয়ালা বললেন, ভাই! ত্রিশ বছর পূর্বে আমার যৌবনকাল ছিল, এখন আর সেই অবস্থা আছে কি? লোকটি বললেন, না তুমি আশরাফ আলী নও। তুমি মিথ্যা কথা বলছ!!

এত মারাত্মক কথার উপরও হযরতওয়ালা অসন্তুষ্ট হননি। বলতে লাগলেন, আচ্ছা ভাই! আমি নই তো ইনি হবেন। নিকটবর্তী কুতুবখানায় মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব কীরানভী রহ. কিছু লিখছিলেন। তাঁর দিকে ইশারা করে বললেন, দেখুন ইনি হবেন। গ্রাম্য লোকটি বললেন, না ইনিও না। ইনি তো খুব ফর্সা।

তখন হযরতওয়ালা বললেন, আমিও নই, ইনিও নন! তাহলে দেখুন সামনে ঐ রাজ-মিস্ত্রী কাজ করছে, তাকে জিজ্ঞেস করুন। ফলে তিনি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হযরতওয়ালার পায়ে পড়ে যেতে লাগলেন। হযরতওয়ালা তাকে থামালেন। তখন ঐ লোকটি বলল, "হ্যাঁ তুমিই তুমি। আমার ভুল মাফ করে দাও"।

হযরতওয়ালা জিজ্ঞেস করলেন, এত দূর থেকে কেন এসেছেন? বললেন যে, হঠাৎ মনে চাইল এজন্য দেখতে চলে আসলাম। ব্যস দেখা হয়েছে। এখন ফিরে যাই, আসসালামু আলাইকুম।

তো দেখুন এ গ্রাম্য লোকটি বাহ্যিকভাবে কী পরিমাণ অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু হযরত একটুও অসন্তুষ্ট হননি। এটাই হল হাকীকতের পরিচয় ও প্রকৃত বিনয়।

আর পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের মর্ম হল, মুমিন ব্যক্তি নিজ ইখতিয়ারে কোন এমন পন্থা অবলম্বন করবে না যাতে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু যদি ইখতিয়ার বহির্ভূত কোন ব্যাপার সামনে চলে আসে, তাহলে এতে অসম্মানের কিছু নেই। যেমন- মুফতী মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ. এর এক ঘটনা আছে। একবার তিনি সাধারণ পোশাকে বাহির থেকে আসছিলেন। জনৈক সিপাহী স্বীয় সামান তাঁর উপর চাপিয়ে থানায় নিয়ে আসল। থানা রক্ষক দারোগা পুলিশ মাওলানাকে আগে থেকেই চিনতেন। দেখেই সিপাহীর উপর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু মাওলানা তাকে নিবৃত্ত করলেন। আর বললেন, কোন অসুবিধা নেই। আপনি একে কিছু বললে ভাল হবে না কিন্ত। এখন ঐ দারোগা আর কী বলবে?

তো এটা হল গাইরে ইখতিয়ারী বা ইখতিয়ার বহির্ভূত অবস্থা। তবে হ্যাঁ যদি এমন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে সম্পদ দিয়েছেন। উনি চাইলে কুলির ব্যবস্থা করতেও পারেন। তারপরও অন্যের উপর সামান চাপিয়ে দিচ্ছেন এটা হল أن يُذِلَّ نَفْسَه তথা নিজেকে অসম্মান করা। ঐ বোঝা উঠানো তো মুমিন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা। এতে অপমানের কিছু নেই। এই হল পার্থক্য। বুঝে এসেছে কি? يُذِلُّ বাবে إفعال এর শব্দ। অর্থাৎ নিজ ইখতিয়ারে অপমান করা।

১৬. সময় ও শরীয়তের হক আদায় করা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একবার হযরত থানভী রহ. এর নিকট এক ব্যক্তি আসলেন আর বললেন যে, আমি কালয়ার শরীফ চলে গিয়েছিলাম। আমার জানা ছিল না যে, সেখানে উরস হচ্ছে। আমি দেখলাম যে, বিশালদেহী কিছু মানুষ হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরছে। আমি চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ আসল "হে মুরগী! হে মুরগী! (মাজারে যাতায়াতকারী ফকীরগণ অনেকটা আওয়ারা প্রকৃতিরই হয়ে থাকে) আমি পিছনে ঘুরে দেখি একজন বলছে, আরে তোমাকেই তো বলছি, হে মুরগী! এদিকে আস, আমি চলে আসলাম। তখন সে বলতে লাগল, শুন ফকীরের বয়ান। রূহের জগতে যখন সমস্ত রূহ একত্রিত ছিল, তখন

আমরা যারা মাজারের ফকীর তাদের রূহগুলো আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আর মৌলভী ছাহেবদের রূহ ছিল অনেক দূরে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, ভাং বূযা" (উভয়টিই মাদকদ্রব্য) আমরা তো নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই সহীহ শুনেছি, যার মর্ম হল বেশি বেশি ভাং খাও আর বূযা পান কর!!

পক্ষান্তরে মৌলভী ছাহেবরা যেহেতু দূরে ছিল তাই তারা বুঝেছে "নামায রোযা"। এজন্য মৌলভীরা নামায রোযা ধরেছে আর আমরা ধরেছি ভাং আফিম। যাও ফকীরের এইকথা মনে রেখ।

এখন এই ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত অভিজাত মানুষ ছিলেন তিনি হযরতওয়ালা থানভী রহ. কে বললেন, হযরত! আমার ঐ সময় প্রচন্ড রাগ এসেছিল। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে, আমি এখানে বিদেশী মানুষ, আর এই বিশালদেহী মানুষগুলো হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরছে। কেউ একজন যদি আমার মাথায় লাঠি মারে, তাহলে আমি শেষ। এখন আমি সেখানে কিভাবে কথা বলি? রাগ তো এসেছে প্রচণ্ড কিন্তু কথা বলিনি।

তোমরা কিছু বুঝলে কি? তোমরা তো এখনো শিশু। এসব হযরতদের অনেক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। "সময় ও শরীয়ত" উভয়টার মধ্যে সমন্বয় সাধন সবার কাজ নয়। মিঞারা শুনে নাও, এক সময় তোমরা এ বুড়োকে স্মরণ করবে যেমন এখন আমরা হযরতওয়ালা থানভী রহ. কে স্মরণ করি।

শুনো! একবার হযরত শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব দেহলভী রহ. এর নিকট একজন দোকানদার আসলেন। তখন মানুষ প্রচুর ভাং পান করত। বড় বড় মানুষ মাতাল হয়ে পড়ে থাকত। তো ঐ দোকানদার বলল, হযরত! আমার দোকানে বেচাকেনা কম হয় অন্য দোকানে ভাং অনেক বেশি বিক্রি হয়। আপনি কোন তাবীজ দিয়ে দিন যাতে আমার দোকানে ভাং বেচাকেনা বৃদ্ধি পায়, ভাল হয়।

শাহ ছাহেব রহ. বললেন, খুব ভাল। এবং তাবীজ লিখে দিয়ে দিলেন আর বললেন, যাও এটা নিয়ে যাও। সে চলে গেল। কিছুদিন পর মিষ্টির টুকরী নিয়ে সে আসল আর বলতে লাগল হযরত! আপনি তাবীজ

দিয়েছিলেন, এর বরকতে আমার দোকানে খুব বিক্রি হয়েছে। এবং প্রচুর লাভ হয়েছে। এই মিষ্টি আপনার জন্য এনেছি।

হযরত শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রহ. বললেন, ঠিক আছে রেখে দাও। সে রেখে চলে গেল।

কেউ বলল, হযরত! প্রথম কথা হল, ভাং হারাম। আপনি এটার জন্যও তাবীজ দিলেন, দ্বিতীয়ত ঐ উপার্জিত সম্পদ দ্বারা যে মিষ্টি নিয়ে এসেছে, সেটাও আপনি গ্রহণ করলেন!!

তিনি খাদেমকে বললেন, যাও তার দোকানে যাও এবং তাকে গিয়ে বল, তোমাকে হুজুর যে তাবীজ দিয়েছিলেন তা ফেরৎ দাও। এখনই তোমাকে আবার ফেরৎ দিব। ফলে ঐ তাবীজ এসে গেল। হযরত শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রহ. ঐ আপত্তিকারীকে বললেন, খুলে দেখ এটা। দেখা গেল যে, সেখানে লেখা আছে, "হে ঐসব লোক যাদের ভাগ্যে ভাং পান করা লেখা আছে অন্য কোথাও না গিয়ে এখান থেকেই ক্রয় কর।" তখন ঐ আপত্তি উত্থাপনকারী বলল, হযরত! এতে তো আপত্তির কিছু নেই। বাকি থাকল মিষ্টি। তো এসব বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট সব ধরণের মানুষের যাতায়াত থাকে। মদ্যপ প্রকৃতির মানুষের আসা যাওয়াও থাকবে। মোটকথা, এ প্রকৃতির লোকদেরকে খাইয়ে দিবেন, নিজে খাবেন না।

সারকথা এটাই, বর্তমান কাল ও শরীয়ত উভয়টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এই সব হযরতদেরই কাজ।

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার আজীব প্রমাণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' তথা সর্বশেষ নবী হওয়ার অন্যান্য প্রমাণের সাথে এটাও একটি প্রমাণ হতে পারে যে, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারজন ছেলে হয়েছে তায়্যিব, তাহির, কাসেম, ও ইবরাহীম রাযি. অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তায়্যিব, তাহির ও কাসেম একজনই। আবার কেউ কেউ চারজন কে স্বতন্ত্র বলেছেন।

তো প্রিয়নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই চার পুত্রের মধ্যে কাউকে দুনিয়াতে বাকী রাখা হয়নি। কেননা, যদি তাঁরা জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়ত নবী বানানো হত অথবা বানানো হতনা। যদি বানানো হত, তাহলে এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর "খতমে নবুওয়াত" এর সাথে সাংঘর্ষিক হত। আর যদি নবী বানানো না হত, তাহলে অন্যান্য নবীদের সন্তান নবী আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান নবী নয়, এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী হত। এজন্য যদিও তাঁর একাধিক পুত্রসন্তান হয়েছে, কিন্তু তাঁদের কাউকে বাকী রাখা হয়নি। এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ নবী হওয়ার একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। অতএব কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর জন্য নবুওয়াত দাবী করা চাই 'যিল্লী' নবী হোক বা অন্য কোন নবী সম্পূর্ণ বাতিল।

১৮. কুমন্ত্রণার আজীব চিকিৎসা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : দ্বীনদার মানুষ কুমন্ত্রণার কারণে পেরেশান হন। কিন্তু তাদের এভাবে চিন্তা করা উচিত যে, আমার ঈমানের সাক্ষ্য তো শয়তানও দিচ্ছে। সে বলছে, তোমার কাছে ঈমানের নেয়ামত আছে, এজন্যই তো আমি তোমার কাছে আসছি।

একটি নতুন কথা আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। আমার হযরত (হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.] বলেছেন, মৃত্যুর পূর্বে কিছু না কিছু কুমন্ত্রণা আসা উচিত। কেননা, মৃত্যুর সময় প্রত্যেক ঈমানদারের কাছে শয়তান আসে এবং কুমন্ত্রণা দেয়। তো যে ব্যক্তিকে ইতোপূর্বে কুমন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, তার যেহেতু অভিজ্ঞতা আছে এজন্য সে চিন্তা করবে যে, এটা তো সেই কুমন্ত্রণাই যা পূর্বে আমাকে দেয়া হয়েছিল। কাজেই এখন আর আমি এটার পরোয়া করি না।

কিতাবে লিখেছে যে, বোকা এবং শত্রুর সাথে কথা বলা অনুচিত। বোকা তো কথা কিছুই বুঝবে না, অযথা সময় নষ্ট হবে। আর শত্রু যে পূর্ব থেকেই শত্রুতা পোষণ করে আসছে ঐ কথা শুনে তার শত্রুতা আরো বাড়বে। আর শয়তানও যেহেতু মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এজন্য তার সাথেও কথা বলা উচিত নয়, ব্যস স্বাভাবিক কথা বলে পৃথক হয়ে যাবে।

১৯. সময়ের খুব মূল্যায়ন করা চাই

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সময় অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। এর খুব কদর করা চাই। যে জিনিসের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কসম করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝

অর্থাৎ, "সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে"।

(সূরা আসর :২)

তো যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ পাক কাল বা সময়ের শপথ করেছেন সেহেতু সময় অত্যন্ত মূল্যবান একটি জিনিস।

২০. নফসে লাওয়ামা বা তিরস্কারকারী আত্মার স্বরূপ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা نَفْسِ لَوَّامَة নফসে লাউওয়ামা তথা তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করে বলেছেন–

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

অর্থাৎ, "আমি শপথ করছি, কিয়ামত দিবসের এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের"। (সূরা কিয়ামাহ : ১-২)

কোথাও نَفْسِ مُطْمَئِنَّه নফসে মুতমাইন্না বা প্রশান্ত আত্মার শপথ করেছেন কি? তো নফসে লাউওয়ামার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা খুশী হন। কিন্তু লাউওয়ামা তো তখনই বলা হবে যখন তার দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সে লজ্জিত হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট হন যে, আমাকে না দেখেও আমাকে মহাজ্ঞানী মহাক্ষমতাবান মনে করে। এজন্যই তো সে নিজেকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। আমার কিছু কুদরত দেখে তার এমন ইয়াকীন ও বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, কেমন যেন সে আমাকে দেখছে। এজন্য সে আমার দিকে রুজু করছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুব খুশী হন।

হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে: হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে সবাই গুনাহগার, তোমরা কি আমাকে ইবাদতের উপযুক্ত সত্তা মনে কর না?

তাহলে কেন এই অহংকার? এই দম্ভ? কেন নিজেকে বড় মনে করা? আর কেনই বা অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা? নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে কেন দৃষ্টি যায় না? নিজেকে কেন তিরস্কার করো না?

এসব কারণে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

এজন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

অর্থা, "প্রত্যেক আদম সন্তান গুনাহগার, আর সর্বোত্তম গুনাহগার তারাই যারা তাওবা করে।" (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪৯৯)

এই তাওবার ফলে গুনাহগার হয়ে যাবে নেককার। যে ছিল আল্লাহর গজবের শিকার, সে হবে তাঁর ভালবাসার পাত্র। কেননা তাওবাকারী নফসে লাউওয়ামার অধিকারী। ফলশ্রুতিতে সে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যায়।

২১. কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহ করার কারণে তার প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। তার প্রতি এ সুধারণা রাখা উচিত যে, তিনি হয়ত তাওবা করেছেন। আপনি তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালে আপনি খারাপ মানুষদের মধ্যে গণ্য হবেন। নিজের কাছে নিজেকে ভাল মনে হলেও মহান আল্লাহর নিকট এই গুনাহের কারণে আপনি খারাপ মানুষ হিসেবে গণ্য হবেন।

২২. শয়তান তাওবা করতে বাঁধা দিলে তার বাঁধা মানবে না

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শয়তান মানুষদেরকে তাওবা করতে বাঁধা দেয় আর বলে, তাওবা করে কী লাভ? আজ তাওবা করবে তো কাল ভেঙ্গে ফেলবে।

তো মুসলিম ব্যক্তির বলা উচিত, আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেলেও আমি লজ্জিত হই। আন্তরিকভাবেও অনুতপ্ত হই। আর এটাই তো তাওবার মর্মবাণী।

২৩. আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শারীরিক দুর্বলতা, সফর এবং অসুস্থতার সময়েও 'আযীমত' তথা শরীয়তের তাকীদী বিধান বর্জন করা অনুচিত। তবে হ্যাঁ যদি এমন কোন অপারগতা সামনে চলে আসে, তবে নেয়ামত মনে করে 'রুখসত' তথা শরীয়তের ছাড় বিধানের উপর আমল করতে পারে।

আখেরাত চিরস্থায়ী, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তাহলে দুনিয়ার সাথে কেন এত সম্পর্ক? আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্যই 'ইসলাহে নফস' তথা আত্মশুদ্ধি জরুরী।

কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

"নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়ে গেল যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল।" (সূরা আশ শামস : ৯)

অন্যত্র বলেছেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

"নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়ে গেল যার আত্মা পরিশুদ্ধ হল।"

(সূরা আ'লা: ১৪)

'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধির সারমর্ম হল দিলের ভেতরের ময়লাগুলো দূর করা এবং প্রশংসনীয় অভ্যাসগুলো রপ্ত করা।

সারকথা হল, মানুষের সফলতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

১। মন্দ আকীদা ও মন্দ স্বভাব থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।

২। সব সময় আল্লাহ পাকের যিকিরে থাকা।

৩। নামাযের পাবন্দী করা।

এই নামাযই হল শ্রেষ্ঠ যিকির। এর দ্বারা পূর্ণ শরীয়তের উপর চলা সহজ হবে। শরীয়ত তবীয়ত বনে যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা কষ্ট হলেও পরবর্তী সময়ে এটাই তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হবে।

২৪. কিরামান কাতিবীন এর বদলির হেকমত এবং وَسَطٌ শব্দের বিশ্লেষণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আসরের পর মাগরিবের নিকটবর্তী সময়ে কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের বদলি হয়। একজন ফেরেশতা আছেন ডানে, আরেকজন থাকেন বামে। ডান দিকের ফেরেশতা নেক আমল লেখেন। আর বাম দিকের ফেরেশতা লেখেন বদ আমল। ডান দিকের ফেরেশতা বড় দয়ালু। তিনি বাম দিকের ফেরেশতাকে গুনাহ লেখা থেকে বিরত রাখেন। তিনি বাম দিকের ফেরেশতার উপর অফিসার। তখন বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহ লেখা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যান।

দেখুন ফেরেশতাদের মধ্যেও অফিসার ও অধীনস্ত আছেন। তাহলে মানুষের মধ্যে কেন হবে না? তাইতো ইরশাদ হয়েছে :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ

"আর নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব"।

(সূরা বাকারাহ : ২২৮)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ

"পুরুষ নারীদের অভিভাবক"। যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা নিসা : ৩৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

"আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।"

(সূরা নিসা- ১৯)

মোটকথা প্রত্যেকেই অন্যের হক আদায় করবে।

তো ডান দিকের ফেরেশতা যেহেতু বাম দিকের ফেরেশতার উপর কর্তৃত্ববান, এজন্য তাঁকে গুনাহ লেখা থেকে বিরত রাখেন যে, সম্ভবত সে তাওবা করবে। আবার লিখতে চাইলে আবার বিরত রাখে যে, হয়ত সে

তাওবা করবে। তৃতীয়বার লিখতে চাইলে বলেন, আচ্ছা ভাই! লিখে নাও। এতো তাওবা করছেইনা।

এভাবে তিন তিন বার সুযোগ দেয়া হয়। সকালের ফেরেশতা সন্ধ্যায় চলে যান, আবার সন্ধ্যার ফেরেশতা চলে আসেন। কর্মচারী পরিবর্তন এটা রাজকীয় নীতি। এই রাজকীয় ব্যবস্থাপনা ইংরেজরা কোথা থেকে শিখল? এই সব আমাদের থেকে শিখেছে। ফেরেশতাদের পরিবর্তন ফজর এবং আসরের পর হয়। এজন্য এই দুই নামাযের খুব ইহতিমাম করা চাই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

অর্থাৎ, "তোমরা নামাযের পাবন্দী কর বিশেষত, আসর নামাযের।

(সূরা বাকারাহ : ২৩৮)

এখানে صَلٰوةِ وُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায দ্বারা আসরের নামায উদ্দেশ্য। কেননা, এটা দিনের দুই নামায তথা ফজর ও যোহর এবং রাতের দুই নামায তথা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী নামায।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও মধ্যবর্তী তথা ভারসাম্যপূর্ণ জাতি বানিয়ে দেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি।"

(সূরা বাকারাহ : ১৪৩)

একটা হল وَسْطٌ সীনের সুকূনের সাথে। যার অর্থ হল, দুই জিনিসের মাঝখান। চাই কোনদিকে দূরত্ব কম হোক বা বেশি। আর আরেকটা হল وَسَطٌ সীনের যবরের সাথে। যার অর্থ হল ঠিক মধ্যবর্তী স্থান। যার উভয়পার্শ্বের দূরত্ব একদম সমান। তো আমাদেরকে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা اُمَّةً وَّسَطًا বা 'মধ্যমপন্থী' উম্মাহ বানিয়েছেন, তাই আমাদের কার্যকলাপে ভারসাম্য থাকা উচিত।

২৫. নামায হেফাযতের মর্মকথা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা জামাআতের সাথে নামায ফরয করেছেন। এজন্য মসজিদে গিয়ে জামাআত এর সাথে নামায আদায় করা উচিত। আর এখানে أَدُّوْا বলেননি حَافِظُوْا বলেছেন। অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী আদবসমূহের হেফাযত করে নামায আদায় করতে হবে।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি একটি এলাকায় গেলেন। সেখানে পূর্ব থেকেই একজন বুযুর্গ থাকতেন। ফলে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলেন। তাঁর বাসায় গিয়ে দেখলেন, তিনি বাসায় নেই। জিজ্ঞাসাবাদের পর জনৈক কৃষক বলল : তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে এ পথ দিয়ে গেছেন আর এ জায়গায় নামায আদায় করেছেন। এই বুযুর্গ চিন্তা করলেন যে, যেখানে তিনি নামায আদায় করেছেন ঐ স্থানটি দেখি। কারণ ফার্সীতে প্রবাদ আছে :

جائے بزرگاں بجائے بزرگان است

অর্থাৎ, "বুযুর্গদের স্থান তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়"।

ঐ স্থানের মাটিতে হাতের চিহ্ন ছিল, তিনি দেখলেন যে, সেজদায় যেখানে হাত থাকার কথা সেখানে হাত নেই, কিছুটা সরে আছে। তখন এই বুযুর্গ মনে মনে বললেন, যিনি প্রকাশ্য আদবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না তিনি অভ্যন্তরীণ আদবসমূহের প্রতি কতটুকুই বা লক্ষ্য রাখবেন?

তো حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এর অর্থ এটাই যে, আদাবে যাহেরী ও বাতেনীর হেফাযতের সাথে নামায আদায় করতে থাক।

২৬. হাদিয়া প্রদানের সময় স্রেফ মহব্বতের নিয়্যত থাকবে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উট হাদিয়া হিসেবে দিলেন। প্রিয়নবীও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাদিয়া হিসেবে দুটো উট দিলেন। তখন ঐ লোকটি বলল, ব্যস মাত্র দুটো উট দিলেন? আমি তো শুনেছিলাম আপনি অনেক বড় দানশীল।

আসলে ঐ লোকটি অনেক কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে এসেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন সবাই নিঃস্বার্থভাবে হাদিয়া দেয় না। ফলে তিনি ঘোষণা করে দিলেন : এখন থেকে আমি যার তার হাদিয়া কবূল করব না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেছেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا "তোমরা হাদিয়া আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরে মহব্বত পয়দা কর"। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, হাদীস নং ৫৯৪)

এর দ্বারা বুঝে আসল যে, হাদিয়া একমাত্র মহব্বতের নিয়্যতে হওয়া চাই। দু'আর নিয়্যাতেও নয়। হাদিয়ার পরে দু'আর দরখাস্ত করবে না। সাওয়াবের নিয়্যতেরও নয়। সাওয়াব তো আল্লাহ তা'আলাই দিবেন। বরকতের নিয়্যতেও নয়। বরকত স্বয়ং আল্লাহ পাক দিবেন। আপনার নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই।

২৭. শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ আসল কাজ, বিশেষ অবস্থা নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : লোকেরা বিশেষ অবস্থার পিছনে পড়ে গেছে। অথচ আসল উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে সিরাতে মুস্তাকীম এর অনুসরণ।

হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করেছিলেন :

رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۭ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব"।

(সূরা আরাফ : ১৪৩)

এটা এক ধরনের কাইফিয়্যাত এর দরখাস্ত। কেননা, যাকে ভালবাসা হয় তাকে দেখলে ভিন্ন মজা ও স্বাদ অনুভূত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বললেন : لَنْ تَرَانِىْ "তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না"। এরপর হযরত মূসা আ. আর পীড়াপীড়ি করেননি।

বুঝা গেল যে, 'কাইফিয়্যাত' বা বিশেষ অবস্থার পিছনে পড়া অনুচিত।

২৮. "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ" এর মর্মকথা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলার তিনটি গুণ। ১. سميع বা সর্ব বিষয়ে শ্রোতা, ২. بصير বা সবকিছুর দ্রষ্টা, ৩. عليم সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

প্রথমটার কথা হল যা কিছু বলবে, চিন্তা-ভাবনা করে বলবে যে, আমার এ বলার দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয়া তো হচ্ছেনা? আর দ্বিতীয়টির তাকাযা হল, যা করবে চিন্তা-ভাবনা করে করবে যে, এটা নাজায়েয তো নয়? কেননা, আল্লাহ তা'আলা দেখছেন। আর তৃতীয়টির তাকাযা হল, অন্তরে যে সব খেয়াল আনবে বুঝে-শুনে আনবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে জানেন।

اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অন্তরসমূহের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত।"

(সূরা ফাতির : ৩৮)

তো এই আকীদা যে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে শ্রোতা, দ্রষ্টা ও জ্ঞাত অন্তরে তো রাখতেই হবে। কিন্তু একথা হাজির রাখা যে, মহান আল্লাহ কে কেমন যেন আমি দেখছি। যেমনটি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

অর্থাৎ, "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮, ৯)

এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, যখন যে ইবাদত করবে যেমন নামায, সেটার আদবসমূহের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নামাযে কিভাবে হাত উঠাতে হবে? কিভাবে ঝুঁকতে হবে? কিভাবে কিরাআত ও তাসবীহ পড়তে হবে? খুশু-খুযূর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কিছুর দিকে খেয়াল না যাওয়াটাই হল খুশূর হাকীকত। খুশূবিহীন নামায হয়ে তো যাবে ঠিক কিন্তু কবূল হবে না। প্রত্যেক রুকনে লক্ষ্য রাখা যে, এখন রুকূ হচ্ছে, এখন সেজদা হচ্ছে, এটাই হল খুশূ, আল্লাহর ধ্যান আসুক বা না আসুক। এজন্যই রোযার মধ্যে ভুল হলে তো মাফ আছে কিন্তু নামাযের

ভুলের মাফ নেই। কেননা, নামাযের প্রতিটি রুকন একেকটি স্মারক। এজন্য ভুল হয়ে গেলে সেটার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সেজদায়ে সাহু দিতে হবে। কিন্তু রোযার মধ্যে কোন জিনিস স্মারক হিসেবে নেই। এজন্য ভুল মাফ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মধ্যে যে সাহু বা ভুল হয়েছে, সেটা মহান আল্লাহর ধ্যানের কারণে হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর উপরও সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব করা হয়েছে। কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমি কবে বলেছি আমার এমন ধ্যান করতে যে, আসল কাজে ভুল হয়ে যায়। এজন্যই যদি কারো আল্লাহর দিকে অতিরিক্ত ধ্যানের কারণে ভুল হয়ে যায় তাহলে সাহু সেজদা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহু 'তাকবীনী' ভাবে ছিল (যার রহস্য) আল্লাহই ভাল জানেন। যাতে করে এটা 'তাশরীঈ' শরীয়তের অংশ হয়ে যায়। কেননা যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহু বা ভুল না হত, তাহলে সাহু সেজদার আমলী পন্থা সামনে আসত না। এই আমলী পন্থা সামনে আনার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহু সংঘটিত হয়েছে।

এমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় আল্লাহ পাকের ধ্যান যে, তিনি দেখছেন জরূরী নয়। অবশ্য ঐ ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ শরয়ী নীতিমালা অনুসারে হল কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরূরী।

যদি কেউ প্রেমিকাকে দেখার সময় প্রেমিকা বলে যে, "আমাকে দেখনা বরং আমার যে প্রতিবিম্ব আয়নায় পড়ছে সেটা দেখ।" তো এখন যদি তার প্রতিবিম্ব না দেখে তাকেই দেখতে থাকে, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হবে। আর বলবে যে, আমার মজলিস থেকে উঠে যাও, কেননা তুমি তো নির্দেশ মাননি। এটাই হল ঐ কথার মর্ম যে "মাখলূক আয়না সদৃশ"।

আর তাইতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে উট দেখার নির্দেশ দিয়েছেন :

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧

"তারা কি উটকে দেখেনা কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে"?

(সূরা গাশিয়াহ : ১৭)

অর্থাৎ, উট কে আমার কুদরত দেখার আয়না বানাও যে, কি রকম অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এর দ্বারা কী পরিমাণ কাজ নেয়া হয়।

২৯. সময় সম্পদ থেকেও অধিক মূল্যবান

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সময়ের মূল্য সম্পদের থেকেও বেশি। যদি কারো সম্পদ হারিয়ে যায় অথবা অনর্থক কাজে ব্যয় হয়ে যায়, পরবর্তীতে তার সেটার প্রয়োজন হলে কী পরিমাণ অনুশোচনা করে! আর বলে, হায়! যদি আমার নিকট ঐ সম্পদটা থাকত! তাহলে কাজে আসত। অথচ সময়ের কদর তার চেয়েও বেশি করা উচিত। সময় মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। এজন্যই তো তার কসম খেয়ে বলেছেন :

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢

"সময়ের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ মহাক্ষতির মধ্যে রয়েছে"।

(সূরা আসর ১-২)

বড় কোন জিনিসেরই কসম খাওয়া হয়। কারো বরফের দোকান থাকলে সে চাইবে যেন বরফগুলো দ্রুত শেষ হয়ে যায়। কেননা দেরি হলে বরফ গলে শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা, এজন্য সে চায় তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাক। এমনিভাবে মানুষের সময়ও বরফের মত গলে যাচ্ছে।

কোন কোন তাফসীরে সময় এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে বরফ দ্বারা। এজন্য সময়ের খুব কদর করা চাই।

৩০. শরীয়তের সীমারেখার বাইরে যাওয়া যাবে না

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের বিধি-বিধানের সীমারেখা বাতলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ

"এটা আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা তো লংঘন করো না"।

(সূরা বাকারাহ-২২৯)

যেমন রোযা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। কিন্তু তাই বলে কেউ ঈদের দিন রোযা রাখলে সেটা জায়িয হবে কি?

আমি এক স্থানে ছিলাম। আমাকে বলা হল, আজকে ঈদের দিন অথচ ঐ লোকটি আজ রোযা রেখেছে। আমি বললাম, আচ্ছা আজকে রোযা রেখেছে? আমি তার কাছে গেলাম ও বললাম, আজ তো ঈদের দিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী, আজ আবার কিসের রোযা? আমি ঘরের ভেতর থেকে পানি আনিয়ে তার সামনে পান করলাম। সে বেচারা আমাকে সম্মান করত, তাই সেও পানি পান করল। তো দেখুন, বিধান না জানার কারণে কেমন ভুলের মধ্যে পড়ে গেছেন।

এমনিভাবে আজ একজনের চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন : "আমি আজ দশ হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করেছি। কিন্তু পাঠ করেছি 'যাওয়ালের' সময় অর্থাৎ যখন সূর্য ঠিক মধ্য আকাশে থাকে, এখন জানতে পেরেছি যে, যাওয়ালের সময় দুরূদ শরীফ পড়া জায়িয নেই। সুতরাং আমার দশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ বৃথা গেল। আমার মস্তিষ্কে এখন এত চাপ যে, এখন নামায পড়তেই মনে চায় না"।

আমি লিখে দিলাম : "আপনার এই চাপ ও পেরেশানী মাসআলা না জানার কারণে হয়েছে। সূর্যোদয়, যাওয়াল, সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া জায়িয নেই। কিন্তু ওয়াযিফা, দুরূদ শরীফ, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি জায়িয।"

তো দেখুন, ঐ বেচারা মাসআলা না জানার কারণে কী পরিমাণ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে। বুঝা গেল, মাসআলা জানা অত্যন্ত জরূরী জিনিস।

ফাযায়িল শোনার দ্বারা আমলের উৎসাহ সৃষ্টি হয়। আর মাসায়িল জানার দ্বারা ঐ আমলটা সহীহ শুদ্ধ রূপে আদায় করা যায়। ফাযায়িল যতটুকু জরুরী, মাসায়িল তার থেকে আরো বেশি জরুরী।

দেখুন, দরসে নিযামীতে (কওমী মাদরাসাগুলোতে) মিশকাত শরীফের পূর্বে হেদায়া, শরহে বেকায়া, কুদূরী, ইত্যাদি মাসায়িলের কিতাব আছে। এখন যখন মিশকাত শরীফে আসল, তখন ফাযায়িলের আলোচনা আসল। বুঝা গেল, মাসায়িল জানা কত বেশি জরুরী।

৩১. গভীর ভালবাসার চিহ্নসমূহ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. মজলিসে দারুণ স্বাদ ও ব্যথাভরা কণ্ঠে আরেফ রূমী রহ. এর এই কবিতাগুলো পাঠ করলেন :

عشق آں شعلہ است کہ چوں برفروخت
ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ لا در قتل غیر حق براند
در نگ آخر کہ بعد لا چہ ماند
ماند إلا الله باقی جملہ رفت
مرحبا اے عشق شرکت سوز و زفت

অর্থাৎ 'ইশক' বা গভীর ভালবাসা হল, ঐ আগুনের ফুলকি যখন সেটা জ্বলে উঠে তখন প্রেমাস্পদ ব্যতীত অবশিষ্ট সবকিছুকে জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দেয়। গাইরুল্লাহকে হত্যা করার জন্য 'লা' এর তলোয়ার চালাও। এরপর দেখ 'লা' এর পর কী থাকল? ব্যস শ্রেফ ইল্লাল্লাহ থেকে গেল, বাকী সব চলে গেল। হে অংশীদারিত্বকে ছাই বানানেওয়ালা ইশক! তোমায় অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। এমন ইশক পয়দা কর যা আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে। যার পদ্ধতি হল, আল্লাহ পাকের যিকির বেশি বেশি করা।

৩২. স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একবার খানা খাওয়ার জন্য বাসায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ছোট পীরানী আম্মার ঘরে খানার আয়োজন ছিল। তিনি আরয করলেন : কয়েকজন মহিলা এসে পড়েছিলেন তাদের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ি। এজন্য খানা বানাতে পারিনি। হযরতওয়ালা রহ. বললেন : কোন ব্যাপার নয়, রাতের খানা তো আছে। আরয করলেন, রাতের খাবার তো বাসী খাবার। বললেন, ব্যস এটাই খেয়ে নিব, তুমি মেহমানদের সাথে কথা বলতে থাক। এটা বলে নিজে রান্নাঘরে গেলেন এবং বাসি খানা খেয়ে নিলেন।

দেখুন! এই হল স্ত্রীর সাথে হযরতওয়ালার ব্যবহার। অথচ বর্তমানে অবস্থা হল এই যে, মৌলভী ছাহেব দারস শেষ করে ফেরার পর যদি খানা দিতে বিলম্ব হয়, তাহলে আর উপায় নেই। সকালের নাস্তা তো গেছেই, রাতের খানাও খেলনা, আর বলে যে, তার শাস্তি হওয়া উচিত। জানা নেই স্ত্রী নাকি দাসী মনে করে।

আরে মিঞা তুমি তো সামান্য সামান্য ব্যাপারে স্ত্রীকে শাস্তি দাও অথচ এটা চিন্তা করোনা যে, রাত-দিনে কী পরিমাণ মহান আল্লাহর নাফরমানী কর। আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করলে তোমার অবস্থা কেমন হবে?

মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন : فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ۝ "অতএব আপনি ক্ষমা করে দিন এবং দিল সাফ করে নিন"। (সূরা হিজর : ৮৫) 'সাফহে জামীল' এর এটাই মর্ম।

৩৩. কখনো ছোটদের বিশেষ দৃষ্টিতে ঐ প্রভাব থাকে যা বড়দের দৃষ্টিতে থাকে না

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মরহুম আকবার ইলাহাবাদী রহ. কত সুন্দর কবিতা বলেছেন :

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

গ্রন্থ, বয়ান আর স্বর্ণতে পয়দা নাহি হয়,
বুযুর্গানে দ্বীনের নজর দ্বারাই দ্বীন পয়দা হয়।

কবিতার মর্ম এটা নয় যে, খাস নজর দিয়ে সব ওলট-পালট করে দিবে। এটা অনেক সময় বড়দের দ্বারা না হলে ছোটদের দ্বারাও হয়ে যায়। মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ. যিনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর শেষ শাইখ ছিলেন। তাঁর ঘটনা : (মিঞাজী রহ. এর তিনজন খলীফা প্রসিদ্ধ। ১, হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব রহ., ২. হাফেয যামেন শহীদ রহ., ৩. মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদ ছাহেব রহ.। ঐ সময় থানা ভবন খানকা "দোকানুল আরেফীন" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর এই তিন হযরতকে আকতাবে ছালাছাহ বা কুতুবত্রয় বলা হত)। যখন মিঞাজী ছাহেব লোহারী থেকে ঝিনঝানায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন থানাভবনে অবস্থান

করতেন। আর ঐ তিনজনকেই তাওয়াজ্জুহ (বিশেষ দৃষ্টি) দিতেন। এই তাওয়াজ্জুহ দ্বারা হাজী ছাহেব ও হাফেয যামেন ছাহেব রহ. এর উপর প্রভাব পড়ত। তাঁরা দুলতে থাকতেন। কিন্তু মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদের উপর প্রভাব পড়ত না। তিনি বলতেন, তোমাদের এটা কী হয় যে দুলতে থাকো? আমার উপর তো কোন প্রভাব পড়ে না?

মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ. এর এক পীর ভাই ছিলেন শের মুহাম্মাদ খান ছাহেব রহ.। তিনিও লোহারীতে থাকতেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদ ছাহেব মিঞাজী রহ. এর তাওয়াজ্জুহ এর ব্যাপারে একথা বলেন যে, আমার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। তখন শের মুহাম্মাদ খান ছাহেবের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল। ফলে তিনি মিঞাজী ছাহেবের কাছে আরয করলেন, আপনি সামনে যখন থানাভবনে যাবেন, আমাকেও সাথে নিয়ে যাবেন। পরবর্তীতে মিঞাজী ছাহেব থানাভবনে যাওয়ার ইচ্ছা করলে শের মুহাম্মাদ ছাহেবও তাঁর সঙ্গী হলেন।

মামূল হিসেবে যখন তাওয়াজ্জুহ দেয়া আরম্ভ করলেন, হাজী ছাহেব ও হাফেয যামেন ছাহেব দুলতে লাগলেন। কিন্তু মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদের উপর কোন প্রভাব পড়ল না। এমতাবস্থায় শের মুহাম্মাদ খান তাঁর প্রতি মনোযোগ দিলেন। ব্যস অল্প সময়ের মধ্যে মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদ ছাহেব হেলতে দুলতে লাগলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হযরত! আমাকে বাঁচান। হযরত বাঁচান। চিৎকার শুনে হযরত মিঞাজী তাওয়াজ্জুহ থেকে হুঁশে আসলেন। দেখলেন যে, শের মুহাম্মাদ খান গর্দান ঝুঁকিয়ে বসে আছেন আর মাওলানা ছটফট করছেন।

হযরত মিঞাজী ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন, শের মুহাম্মাদ খান! এটা কী হচ্ছে? আরয করলেন, হযরত! কিছু নয়। দেখাচ্ছি 'তাওয়াজ্জুহ' কী জিনিস। হযরত বললেন : ব্যস থামাও। তিনি তাওয়াজ্জুহ উঠিয়ে নিলেন। মাওলানা যেমন ছিলেন সেরকম হয়ে গেলেন।

মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. বড় ছিলেন। কিন্তু মাওলানার উপর তাঁর তাওয়াজ্জুহ প্রভাব ফেলেনি। শের মুহাম্মাদ খান ছাহেব ছোট ছিলেন। অথচ তাঁর তাওয়াজ্জুহ প্রভাব সৃষ্টি করল। আসল কথা হল, তাওয়াজ্জুহের

প্রভাব নির্ভর করে কল্পনাশক্তির একাগ্রতার উপর। যার কল্পনাশক্তিতে যত বেশি একাগ্রতা থাকবে, তাঁর তাওয়াজ্জুহ দ্বারা তত বেশি প্রভাব হবে। অনেক সময় বড় ব্যক্তির কল্পনাশক্তি বিভিন্ন ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ততার কারণে অতটা একনিষ্ঠ থাকে না, যতটা ছোট কারো থাকে। কেননা তার শোগল বা ব্যস্ততা তুলনামূলক কম।

৩৪. গোস্বার আদবসমূহ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : অনেক সময় গোস্বা চলে আসে। সেটার বহিঃপ্রকাশও ঘটানো হয়। গোস্বার সময় এমন সব কথা বলে যা দ্বারা অন্যের মনে আঘাত দেয়া হয়। অপমান করা হয়। পরবর্তীতে সেটার ক্ষতিপূরণও করে না। আমাদের হযরত থানভী রহ. বলতেন : আমি গোস্বার সময় কয়েকটি কাজ করি। প্রথমতঃ সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য উপযোগী কথা বলে দেই। শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলিনা। দ্বিতীয়তঃ নরম ভাষা ব্যবহার করি। তৃতীয়তঃ কণ্ঠে স্নেহ থাকে। ফাঁকে ফাঁকে সম্বোধিত ব্যক্তির লাভ ক্ষতির ব্যাপারেও সতর্ক করি। যা দ্বারা সে বুঝতে পারে যে, তার উপকারের জন্য বলা হচ্ছে। চতুর্থতঃ পরবর্তীতে সেটার ক্ষতিপূরণও করে দেই। যা দ্বারা সে বুঝতে পারে যে, সেটা ছিল একটা সাময়িক ব্যাপার। এখন আমার উপর অসন্তুষ্ট নন।

৩৫. এ যুগে বেশি শোগলের প্রয়োজন নেই

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মহান আল্লাহর তাওফীকে একাধিকবার আরয করা হয়েছে, হে তালেবীনে সাদেকীন! এখন বেশি যিকির, শোগল, মুরাকাবা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। কেননা, এ যুগে দুনিয়াবী আসবাব ও উপলক্ষ অনেক বেশি সামনে আসছে। এগুলো দ্বারা ঐসব শোগল ও মুরাকাবার ফায়েদা হাসিল হচ্ছে।

হে সত্যপথের অনুসন্ধানীগণ! ব্যস ব্যস, এখন কাজ শুধু এটাই যে, নিজ হকের প্রতি কোন তোয়াক্কা করবেন না। তবে অন্যের হক আদায়ের ব্যাপারে খুব যত্নবান থাকবেন।

৩৬. আমল ও আখলাক ঈমানের পূর্ণতার সাক্ষী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ঈমান হল ভিতরের একটি দাবী। এর উপর সাক্ষী হল ইসলামিয়্যাত তথা নেক আমলসমূহ। এই সাক্ষ্যের মধ্যে যে পর্যায়ের কমতি হবে ঐ পরিমাণই ঈমানের মধ্যে ঘাটতি হবে। অতএব, ঈমানের পূর্ণতার জন্য স্বীয় জাহেরী ও বাতেনী আমলসমূহের দিকে দৃষ্টি দিন।

৩৭. প্রকৃত তালাবার নিসবত মাআল্লাহ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক) দ্রুত অর্জিত হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হে তালিবানে ইলমে নবুওয়াত! যেমনিভাবে তোমরা ইলমে জাহেরী অর্জনে লেগে আছো, কিতাবসমূহের মুতালাআ, সবকের পাবন্দী, উস্তাযের তাকরীর মনোযোগ এর সাথে শোনা, কান ও অন্তরকে উপস্থিত রাখার মধ্যে মাশগুল আছো, তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত ইলম অনুযায়ী আমলের, আখলাক পরিশুদ্ধকরণের। তাহলে অল্প দিনেই পরিপূর্ণ ঈমান ও পরিপূর্ণ আনুগত্য অর্জন সম্ভব।

এজন্যই আমাদের হযরত থানভী রহ. ঐ তালিবে ইলম যে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ইলম অর্জনে লিপ্ত, বলতেন : এমন একনিষ্ঠ তালিবে ইলম যে মাদরাসায় দশ বছর ব্যয় করে ইলমে জাহেরী অর্জন করেছে, প্রতি বৎসর মাত্র একটি মাস আমাদেরকে দিয়ে দিক। ব্যস দশ মাসই যথেষ্ট।

দেখুন! হযরতের কী পরিমাণ দয়া ও মায়া! এজন্যই ইলমে দ্বীনের তালিবকে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার প্রভাব অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার উপরও পড়ে।

এজন্যই হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اَلنَّظَافَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مِنْ دَرَجَاتِ الْإِيْمَانِ

"পরিচ্ছন্নতা ও সদ্ব্যবহার ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি স্তর"।

(আল মুজামুল আউসাত লিত তাবারানী, হাদীস নং ৭৩১১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধ আখলাকে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩৮. মূলনীতির আলোকে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা বের করতে পারাই প্রকৃত ইলম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একটি মূলনীতি থেকে দশটি টুকরো মাসআলা বের কর। একটাকে আরেকটার উপর কিয়াস কর। جزئيات তথা টুকরো মাসআলা কয়টা বের করবে? কোন্ পর্যন্ত স্মরণ রাখবে? এটা তো কুল কিনারাহীন সমুদ্র।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন "ক্বিয়াস" সহীহ হয়। قياس مع الفارق বা ভুল ক্বিয়াস না হয়। যেমনটি বর্তমানে চলছে। বরং সঠিক কারণ অনুসন্ধান করে অন্যান্য جزئيات যেগুলোর ব্যাপারে জানা নেই সেটার উপর ক্বিয়াস করে বের কর।

ব্যস! শুধু ভাসা ভাসা পড়লেই চলবে না। বরং বিশুদ্ধ আকল ও সুস্থ কলব থাকতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

"কিন্তু যে মহান আল্লাহর নিকট সুস্থ কলব নিয়ে আসবে" (তার উপকার হবে)। [সূরা শূ'আরা : ৮৯]

সহীহ ইলম থাকতে হবে। চাই পড়ালেখা করে হোক বা শুনে শুনে হোক বা জিজ্ঞেস করেই হোক। আকল ঠিক থাকলে অল্প ইলমই যথেষ্ট। প্রবাদ প্রসিদ্ধ : یک من علم را دہ من عقل باید অর্থাৎ এক মন ইলমের জন্য দশ মন আকল থাকা চাই। তো সহীহ ইলম যদি অল্পও হয়, সহীহ আকলের সাথে সংযুক্ত হয়ে তা অনেক হয়ে যায়।

৩৯. বিজাতির সাথে সাদৃশ্যের কারণে ঈমানে দুর্বলতা চলে আসে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আজ আমরা আমাদের পোশাক পরিবর্তন করে ফেলেছি। মহিলারা খোলা মাথায় চলাচল করছে। কারো খাতিরে ওড়না পরিধান করলেও কিছুক্ষণ পর খুলে রেখে দেয়। কামিজ হয়ে গেছে ছোট। সেটাকেও পায়জামার ভেতরে রাখে।

বিধর্মীরা আমাদের এ অবস্থা দেখে হাসাহাসি করে। ভাই! তোমরা তোমাদের পোশাক অবলম্বন কর। অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বনের দ্বারা আমলের মধ্যে দুর্বলতা আসতে থাকে। বাহ্যিক অবস্থার সংশোধনও একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল।

দেখুন! হযরত মূসা আ: কে পাঠানো হয়েছিল ফেরআউনের সংশোধনের জন্য। যখন জাদুকরদের সাথে মোকাবিলা হল এবং হযরত মূসা আ: জয়লাভ করলেন, তখন জাদুকরগণ ঈমান নিয়ে আসলেন কিন্তু ফেরআউন তখনো ঈমান আনেনি। তো হযরত মূসা আ: মহান আল্লাহর নিকট আরয করেছেন, ব্যাপার কি? যাদুকররা ঈমান আনল অথচ ফেরআউন ঈমান আনল না? আল্লাহ তা'আলা বললেন : মূসা! ওরা তোমার মত পোশাক পরে এসেছিল। আমার রহমত এটা সহ্য করেনি যে, তারা তোমার মত পোশাক পরিধান করে আসবে আর বঞ্চিত থাকবে। এজন্য ওদেরকে ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছি।

৪০. নসীহতের আদবসমূহ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : নসীহতের কয়েকটি আদব আছে। সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করে নসীহত করা উচিত। ১। একাকীত্বে বলবে, ২। নরম কণ্ঠে বলবে, ৩। এমনভাবে বলবে যাতে তার অসম্মান না হয়, ৪। এমন কোন পন্থাও অবলম্বন করবে না যার দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অমুক কে বলা হচ্ছে। এর থেকেও বেঁচে থাকা চাই।

৪১. মুসলমানের দোষ শুধু তার উপরই স্নেহের সাথে প্রকাশ করবে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنْ

অর্থাৎ, "মুমিন, মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ"।

(সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯১৮)

যেমনিভাবে আয়না তোমার চেহারার দোষ তোমার কাছে গোপন করে না এবং অন্যের কাছে প্রকাশ করে না, মুমিন ব্যক্তির অবস্থাও এমন হওয়া উচিত যে, অন্য কোন মুমিনের কোন দোষ বা ত্রুটি শুধুমাত্র তার সামনেই প্রকাশ করবে অন্য কারো নিকট বলবে না। কেননা, এতে একজন মুসলমান কে অপমান করা হয়। এছাড়া এর দ্বারা পরস্পরে দুশমনী সৃষ্টি হয়। কেননা কথা গোপন থাকে না। কোন না কোনভাবে অপর পর্যন্ত পৌঁছেই যায়। ফলে তার অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে।

৪২. যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সংশোধন পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : অনেকে আমার শিক্ষকতার প্রাথমিক যুগের মারপিট করার উপর বর্তমান যুগের মারপিটকে তুলনা করেন। অথচ ঐ সময়ের মারপিট আর বর্তমান সময়ের মারপিটের মধ্যে অনেক তফাত। তখন যারা ছাত্রদেরকে প্রহার করতেন, সেটা করতেন স্নেহবশত। শুধু গোস্বা ঠান্ডা করার জন্য মারতেন না। আর যাদেরকে প্রহার করা হত তারা পালিয়েও যেতনা, প্রতিদ্বন্দ্বীও হত না। পক্ষান্তরে বর্তমানে এ দুটির কোনটাই নেই। দেওবন্দের শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ইযায আলী ছাহেব রহ. শিক্ষকতার প্রাথমিক যুগে বড় বড় ছাত্রকে পিটুনী দিতেন। কিন্তু ছাত্রদের অবস্থায় পরিবর্তন দেখে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অনেক বড় একজন শাইখ আমাকে বলেছেন : চোখে দেখা এমন যামানা এসে গেছে যে, শাইখ, উসতায, পিতা, স্বামী নিজ পদে থেকে স্বীয় অধীনস্তদের থেকে কাজ নিতে চাইলে কাজ নিতে পারেন না। শাইখ মুরীদ হয়ে, উসতায শিষ্য হয়ে পিতা পুত্র হয়ে, স্বামী স্ত্রী হয়ে যদি অধীনস্তদের থেকে কাজ নিতে পারে, তাহলে তো নিল, নতুবা পদে থেকে কাজ নেয়া দুষ্কর।

৪৩. প্রকৃত যিকিরকারীর জন্য সান্ত্বনা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যে ব্যক্তি ফিকিরের সাথে, কাকুতি-মিনতির সাথে মহান আল্লাহর যিকির করে, শুধুমাত্র চোখের কান্নার

সাথেই নয়, তো এরূপ ব্যক্তির সান্ত্বনার জন্য মহান আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে গেছে।

أَنَا جَلِيْسٌ مَنْ ذَكَرَنِيْ

"যে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গী"।

(শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৬৭০)

এমনিতে প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের সঙ্গী, যেহেতু তিনি হাযির-নাযির। কিন্তু এই যে বলা হয় أَنَا جَلِيْسٌ مَنْ ذَكَرَنِيْ এর দ্বারা বিশেষ সঙ্গী হওয়া উদ্দেশ্য। যেমন হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেন : "আমি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে (তাঁর শান অনুযায়ী) এসে যাই।" আল্লাহ পাক তো সব সময় হাযির-নাযির। কিন্তু এটা বলা হচ্ছে, বিশেষ তাওয়াজ্জুহ বুঝানোর জন্য।

রাত্রি জাগরণ পূর্ণ রাত না হলেও সামর্থ অনুযায়ী, সুযোগ মত যতটুকু হয় অতটুকুই যথেষ্ট। যদিও আল্লাহ পাকের এমন বান্দাও আছেন যিনি সারারাত ইবাদত বন্দেগী করতেন। যেমন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর কথা আমাদের হযরত থানভী রহ. আমাদেরকে শুনিয়েছেন। ইশার নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর বিছানায় শুয়ে পড়তেন। তো হাজী ছাহেব খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। তাঁর বিছানা ছাপ্পড়খাট বিশিষ্ট ছিল। যার চতুর্দিক বন্ধ থাকত। ইশার পর অল্প সময় এখানে আরাম করতেন। এরপর মুআয্যিনকে জিজ্ঞেস করতেন, সব নামাযী কি চলে গেছে নাকি এখনো কেউ মসজিদে আছে? যখন মুআয্যিন বলত: সবাই চলে গেছে। তখন বলতেন, মসজিদের দরওয়াজা বন্ধ করে দাও এবং নিজে নামাযে মাশগূল হয়ে যেতেন। সারা রাত নামায পড়তেন। অথচ আমাদের হযরত থানভী রহ. বলেন যে, হযরত হাজী ছাহেব রহ. এমন হালকা-পাতলা ছিলেন যে, যখন বাইরে বের হতেন আর তীব্র বাতাস প্রবাহিত হত, তখন আমাদের ভয় লাগত যে, হযরত পড়ে যান কিনা?

এজন্য সারারাত না পড়লেও অন্ততপক্ষে সুবহে সাদিকের আধাঘণ্টা পূর্বে উঠার অভ্যাস করা উচিত। যদি ইস্তিঞ্জায় বেশি সময় না লাগে।

আল্লাহ তা'আলা উপর্যপুরী উৎসাহ প্রদান করেন। অথচ মুমিন বান্দার শুধু ঈমান এর দাবীতে এই সব উৎসাহের প্রয়োজন নেই। ঈমান তো নিজেই স্মারক। সে নিজে ভিতরে ভিতরে মুরশিদ ও রাহবার (পথ প্রদর্শক) হয়ে বসে আছে। উৎসাহের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তারপরও মহান আল্লাহ উৎসাহের পর উৎসাহ দিতে থাকেন যেন যে কোন ভাবে আমার বান্দা কাজে লেগে থাকে। কেননা এতে তারই উপকার।

কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন : আমার সত্তা তো মুখাপেক্ষীহীন সত্তা। আমার সত্তার মধ্যে তো সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাখা। যেমন স্নেহশীল পিতা ছেলেকে বলেন : তুমি পড়ালেখা করে চলে আস। তোমার জন্য মিষ্টান্ন তৈরী রাখা হয়েছে। তুমি আসলে পরে তোমাকে দিব। এটা অতিরিক্ত স্নেহের দরুন এক ধরণের উৎসাহ।

এমনিভাবে মহান আল্লাহ উৎসাহ দেন। أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ আমি ঐ ব্যক্তির বিশেষ সঙ্গী যে আমাকে স্মরণ করে। এই 'মুরাকাবা' বা ধ্যান যিকিরকারীর জন্য কম কিসে? যে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার সঙ্গী হয়ে যান, যে তাঁর যিকির করে।

এর সাথে সাথে হে সালিক! হে মুজাহিদ ও হে মুহাজিরবৃন্দ!

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।"
(সূরা বাকারার-১৫২) আয়াতে কারীমাও মিলিয়ে নাও।

আসুন, আমরা দু'আ করি যেন মহান আল্লাহ আমাদের মন-মানসিকতা এমন বানিয়ে দেন।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে কুদসীর আলোকে যখন দ্বীনের পথে চলার জন্য আগ্রহ, স্পৃহা, আকর্ষণ ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে, তখন সে প্রতিটা মুহূর্তে মহান আল্লাহর নির্দেশ স্বত:স্ফূর্তচিত্তে পালন করতে থাকবে। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তাকে সার্বক্ষণিক ভাবে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করতে থাকেন।

বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদী রহ. মহান আল্লাহর 'আরহামুর রাহিমীন" হওয়াকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

کرم بین و لطف خداوند گار
گنہ بندہ کردہ است او شرم سار

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর দয়া মায়া দেখ যে, গুনাহ করল বান্দা অথচ লজ্জিত হচ্ছেন তিনি।

বাস্তবিকপক্ষে এটা হল একটি হাদীসে পাকের বিষয়বস্তু। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, যখন বান্দা গুনাহ করে তখন মহান আল্লাহ লজ্জা পান। যেমন স্নেহশীল পিতা যখন সন্তানকে কোন মন্দকর্মে লিপ্ত দেখেন, তখন তিনি লজ্জিত হন। একই অবস্থা হয় ঐ আরহামুর রাহিমীনের। এর থেকে বেশি স্নেহ আর কী হতে পারে?

এ বিষয়বস্তুটি যেন মনে থাকে। কোনভাবেই যেন এর বিপরীত অবস্থার দিকে আকর্ষণ না হয়। আর মানবীয় প্রকৃতির চাহিদায় যদি আকর্ষণ হয়েও যায়, তাহলে অবস্থা এমন হতে হবে, যেন তাওবা ছাড়া মনের মধ্যে শান্তি না আসে।

৪৪. একটি অদ্ভুত ফিল্ম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একদিন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আজকাল ছেলেরা বিগড়ে যাচ্ছে। এটা হল টেলিভিশনের কল্যাণে (?)। একই স্থানে বসে মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই মিলে টেলিভিশন দেখছে।

গত কয়েকদিন পূর্বে এক লোক আমার কাছে এসে বলল : হযরত! আমার মেয়ের বিবাহ ঠিক হয়েছে। বিবাহের তারিখও নির্ধারিত হয়েছে। এখন মেয়ে বলছে, আমি এখানে বিবাহ বসব না। হযরত! আপনি দু'আ করে দিন আমার মানসম্মানের ব্যাপার।

দেখুন, এই হল টেলিভিশন ও ফিল্মের কু-প্রতিক্রিয়া। বাচ্চারা টিভিতে যা কিছু দেখে, বাসার মানুষের সামনে সেটাই নকল করে। ফিল্ম প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত কথা মনে পড়ল। কিছুদিন পূর্বে সৌদীআরবের রিয়াদ

ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর এসেছিলেন। যিনি আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষায় পি.এইচ.ডি করেছেন। দশ দিনের ছুটি পেয়ে আমার এখানে পূর্ণ দশদিনই ছিলেন। ফেরার তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে বললেন, হযরত! আমি আপনার ফিল্ম প্রস্তুত করছি। আমি আঁতকে উঠে বললাম, ফিল্ম? এটা কেমন কথা? তিনি বললেন : আমি বসে বসে আপনার কর্মকান্ড দেখতে থাকি। আপনি এত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আপনার কাছে সব ধরণের মানুষ আসে। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, মধ্যবিত্ত তথা সর্বস্তরের মানুষ। কেউ কাপড় চায়, কেউ স্বীয় দুঃখ-কষ্টের কথা বলে, কেউ পারিবারিক সমস্যার কথা জানায়। আমি দেখি যে, অনেক দুঃখী মানুষ আপনার কাছে আসে, অথচ খুশীমনে দুঃখ ব্যথা ভুলে ফিরে যায়। তো এসব অবস্থার ফিল্ম আমার মস্তিষ্কে প্রস্তুত করছি। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর এইসব অবস্থা আমার উপর যাচাই-বাছাই করব এবং উপদেশ গ্রহণ করব। যে এই মানুষটা এত বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এত কর্মঠ আর আমি এমন যুবক হওয়া সত্ত্বেও এত অলস। এজন্যই আমার মস্তিষ্কে ফিল্ম তৈরী করছি।

দেখুন! লোকটি সত্যসন্ধানী ছিলেন। আখেরাতের চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল। নফস এর সংশোধন প্রত্যাশী ছিলেন। কত সুন্দর ফিল্ম তিনি প্রস্তুত করেছেন। অথচ আমাদের তরুণ প্রজন্ম নোংরা ফিল্ম দেখে রসাতলে যাচ্ছে। যদি ফিল্মের শখ থাকে তাহলে এমন ফিল্ম প্রস্তুত কর যেমনটি ঐ প্রফেসর ছাহেব তৈরী করেছেন।

সৌদী যাওয়ার পর আজ তাঁর চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন : আলহামদুলিল্লাহ, জালালাবাদে আপনার কথা কাজ ও অবস্থার যে মানসিক ফিল্ম প্রস্তুত করেছি, সেটার আলোকে কাজ করছি। স্বীয় নফসের হিসাব কিতাব নিচ্ছি।

এই হল তলবের প্রভাব।

আবার কিছু এমন মানুষও আছে, যারা এখানে আসে, শুনে, কিন্তু তাদের মধ্যে তলব নাই। এটা বুঝা যায় এভাবে যে, তাদের চাল-চলনে কোন পরিবর্তন আসেনা। যদি সত্যসন্ধানী হত তাহলে তার মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু পরিবর্তন হত।

আবার কিছু মানুষ আছে, যারা খানকাওয়ালাদের উপর আপত্তি করে! আরে তোমাদের লজ্জা লাগেনা তাঁদের ত্রুটিসমূহের ব্যাপারে আপত্তি তুলতে? তাঁরা তো দোষ-ত্রুটি বর্জনের ইচ্ছা করেছে। এজন্যই তো ঘর-বাড়ী ছেড়ে খানকায় চলে এসেছে। আগ্রহী ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে ধীরে হোক বা দ্রুত মহান আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে ইসলাহ বা সংশোধন অবশ্যই নসীব হবে। এটাই আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা। এরপরও কোন্ মুখে তোমরা আপত্তি তোল?

আজ লন্ডন থেকে একটি চিঠি এসেছে। কেউ এখানে এসেছিল। আমার তো মনে থাকে না। কে আসল, কে গেল? তিনি লিখেছেন : আমি হিন্দুস্তানে আপনার মজলিসে নিয়মিত শরীক হতাম। সেই আলোকে এখন আমি আমার নফসের নেগরানী করি। বাজারে গেলেও খানকা আমার সামনে থাকে। অর্থাৎ, খানকার তালীম অনুযায়ী আমল করি। স্বীয় নফসের হিসাব-কিতাব নেই।

দেখুন! এই হল অনুসন্ধিৎসা। শুরু থেকেই নফসের হিসাব-কিতাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদিও কোন কোন খানকাওয়ালা আপত্তিকর কথাবার্তা বলে : তো সেটার কারণ হল যোগ্যতার ঘাটতি। তাঁরাও এক সময় না এক সময় ঠিকই নিজেদেরকে শুধরে নেয়।

৪৫. যার নিজের ফিকির নাই, সে অন্যের কী ফিকির করবে?

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : প্রত্যেক জিনিস বানানোর একটা উদ্দেশ্য থাকে। যেমন বিদ্যুৎ চলতে চলতে হঠাৎ চলে গেল। নজর উঠানোর পর দেখা গেল যে, অন্যস্থানে জ্বলছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে জানা গেল যে, এখানে তার কেটে গেছে। ফলে আলো নিভে গেছে। তাহলে দেখুন, তার স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে যাওয়ার কারণে তার দ্বারা আসল যে মাকসাদ 'আলো' সেটা থাকল না। অন্ধকার হয়ে গেল।

এমনিভাবে মানবসৃষ্টিরও একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যের উপর থাকলে সঠিক অর্থে কার্যকরী, নতুবা দেখতে কাজ মনে হলেও বাস্তবে কাজ হবে না। এটাই হল "তরীকত" এর সারমর্ম। আমলকে আমল বানানো হল তরীকত এর কাজ। মানবসৃষ্টির যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করা

এটা তরীকত দ্বারা হাসিল হয়। কেননা তরীকত এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মানবসেবা'।

কবি বলেন–

طریقت بجز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجّاده و دلق نیست

অর্থাৎ, "তরীকত" হল শুধু মানবসেবার নাম। তাসবীহ, জায়নামায আর মোটা কাপড় পরিধান করা স্রেফ এটাই তরীকত নয়।

বর্তমানে লোকেরা 'ইস্তিকামাত' 'ইস্তিকামাত' (দৃঢ়তা, অটলতা) বলে চিৎকার করে। ইস্তিকামাত এর প্রকৃত অর্থ তারা বুঝতেই পারেনি। কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে ইস্তিকামাত এসে গেলে সেটার গ্রহণযোগ্যতা নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ বাসার মানুষ, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি সমালোচকদের সাথে উঠা-বসার মাধ্যমে ইস্তিকামাত না আসবে।

আর মানবসেবা শুধু এটা নয় যে, অন্যের খেদমতে লেগে থাকল, অথচ নিজের ব্যাপারে উদাসীন। বরং সে নিজেও তো একজন মাখলূক। তো সর্বপ্রথম তো নিজের খেদমত, যদি নিজের ফিকির না করে শুধু অন্যদের ফিকির করে তাহলে বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্য আছে। নিজের জানকে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করেনা, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অপরকে কী খেদমত করবে? আমাদের এখানে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ। ছোটকাল থেকে আমরা শুনে আসছি। "যে নিজের বাবাকে বাবা ডাকে না, সে প্রতিবেশীকে কী চাচা ডাকবে?"

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

"তোমরা কি অন্য লোকদেরকে পুণ্যের আদেশ কর, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াতও কর, তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?" (সূরা বাকারাহ : ৪৪)

এই বাণী শুধুমাত্র বদআমল আলেমদের জন্য নয়, বরং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের কথা ভুলে গিয়ে শুধু অন্যদের ফিকির করে। এজন্যই সাবধান করার উদ্দেশ্যে اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ "তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না" বলে দিয়েছেন।

সুতরাং এই আয়াতে কারীমাহ শুধুমাত্র আলেমদের সাথে খাস নয়।

৪৬. ভেজা সুলূক উদ্দেশ্য, শুকনো সুলূক নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমার এখানে এবং আমাদের হযরত থানভী রহ. এর নিকট শুকনো তাসাওউফ নেই। আছে খুব ভেজা ও আদ্র তাসাওউফ।

আমি একজন শুকনো সূফীকে দেখেছি। তার সামনে উৎকৃষ্টমানের কোর্মা আসলে সে এতে পানি ঢেলে দিল। জিজ্ঞেস করা হল, এটা কী করলে? উত্তরে বলল : নফসকে শাস্তি দেয়ার জন্য, যাতে নফস স্বাদ বঞ্চিত থাকে।

এটা আমার চাক্ষুষ দেখা ঘটনা। হে শুকনো সূফী! পানিওয়ালা কোর্মা দ্বারা তোমার অন্তরে মহান আল্লাহর কী মহব্বত আসবে? যদি ঐ খাঁটি কোর্মা খেতে, তাহলে লোকমা মুখে যাওয়া মাত্রই মহান আল্লাহর মহব্বতে ছটফট করতে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য খাও এবং নেক আমল করো"।

(সূরা মুমিনূন : ৫১)

খানা সুস্বাদু হয় ৩টি গুণের কারণে। ১. সুঘ্রাণ, ২, সুন্দর রং, ৩. সুন্দর স্বাদ। যখন এমন খানা ঐ ব্যক্তির মুখে পৌঁছে যাবে, যার দিলের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে, তখন মহব্বত আরো বেড়ে যাবে। তো এখন তার মন চাইবে, ফরয তো পড়লাম, সুন্নাতও পড়ে নেই। আল্লাহ পাক কত ভাল খানা খাইয়েছেন। চল আজ কিছু নফলও পড়ি। আরে আমি এত ভালো ভালো খানা খাই। এখন যদি আমল ভালো না করি তাহলে তো এটা হবে অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। ব্যস, তাহাজ্জুদে উঠার তাওফীক হয়ে গেল।

এই হল وَاعْمَلُوْا صَالِحًا "তোমরা নেক আমল কর" এর তারতীব বা বিন্যাস।

আমার কথাবার্তা হচ্ছে সুস্থ অভিরুচি সম্পন্ন সত্যসন্ধানী ব্যক্তি কে লক্ষ্য করে। এজন্যই বলছি كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ এর পর وَاعْمَلُوْا صَالِحًا এর প্রয়োজন ছিল না। কেননা সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির মন তো আপনা আপনি নেক আমলের দিকে যাবে। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু তাই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন وَاعْمَلُوْا صَالِحًا পরে বলেছেন اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত"। عَلِيْمٌ ইলম থেকে উদ্ভূত, ইলমের সম্পর্ক হল কলব বা হৃদয়ের সাথে। উদ্দেশ্য হল আমি তোমাদের আমল দেখছি। তোমরা কি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করছ নাকি আমাকে খুশী করার জন্য? ব্যস, শুধুমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেক আমল কর। মাখলূক থেকে দৃষ্টি হটিয়ে নাও।

৪৭. বাহাদুরীর দাবী হল দুর্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : প্রকৃত বীর দুর্বলকে কিছু বলে না। তার বীরত্বই তাকে বাঁধা দেয়।

একজন আমাকে বলেছেন যে, আমি জঙ্গলের ভেতরে হাঁটছিলাম, হঠাৎ করে সামনে একটি বাঘ চলে আসল। আমি চিন্তা করলাম এখন কী করব? সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মৃত হওয়ার ভান করব। ফলে আমি শুয়ে পড়লাম ও মুর্দা হয়ে গেলাম। বাঘ যখন দেখল যে, আমাকে দেখে এ মৃত হয়ে গেছে, আর মৃত মানুষ বাঘের লোকমা হতে পারে না। তাই আমাকে ছেড়ে অন্য পথে চলে গেছে।

এই হল বাঘ। সে মৃত খাবে না। সে অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবে না। এটা তার বাহাদুরীর বিপরীত কাজ।

আরেকটি ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি নদীর কিনার দিয়ে চলছিল। নদী চওড়া ছিল। কিন্তু নদীর পাশের রাস্তাটি এত সংকীর্ণ ছিল যে, শুধুমাত্র একজন মানুষ পার হতে পারত। ইত্যবসরে হঠাৎ দেখলাম যে, একটি বাঘ আসছে।

এটা দেখে আমার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল। একদম ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাঘ যখন আমার এ অবস্থা দেখল যে, এই বেচারা ভয়ে কাঁপছে, তখন সে দিক পরিবর্তন করল। লাফ দিয়ে নদীর অপর পাড়ে চলে গেল। আমার জন্য পথ পরিষ্কার করে দিল।

শরীয়ত বীরত্ব ও ভদ্রতা উভয়টিরই নির্দেশ দিয়েছে। দুর্বলের প্রতি সদয় হওয়ার দ্বারাও সুলূক অতিক্রম করা যায়।

৪৮. স্ত্রীর কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার প্রতিক্রিয়া

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একবার বূ আলী ইবনে সিনা ঐ সময়ের বিখ্যাত বুযুর্গ আবুল হাসান নূরী রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ এর জন্য গেলেন। ঘরে পৌঁছলেন, দরজায় করাঘাত করলেন। ভেতর থেকে স্ত্রীর আওয়াজ আসল, কে? বললেন, "আমি বূ আলী ইবনে সিনা, আবুল হাসান নূরীর সাথে সাক্ষাত করতে চাই"। ভেতর থেকে আওয়াজ আসল, কেন সাক্ষাত করতে এসেছেন? সে তো একজন লুটপাটকারী! বুযুর্গ বনে বসে আছে। মানুষদের কে ধোঁকা দেয়। সে এরকম এরকম!

বূ আলী ইবনে সিনা মনে মনে ভাবলেন, যখন স্বয়ং তাঁর স্ত্রীই তাঁর নিন্দাবাদ করছে তাহলে তিনি যে কেমন বুযুর্গ তা তো সহজেই অনুমেয়। ঘরোয়া ব্যাপারে তো স্ত্রীরাই বেশি জানে। আফসোস! অযথা সফর করলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করলেন যে, যখন এসেই গেছি, তখন সাক্ষাত করেই যাওয়া উচিত। বাইরে এসে লোকদেরকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে? লোকেরা বলল যে, তিনি বনে গিয়েছেন কাঠ কাটার জন্য ও তা বিক্রির জন্য। এটাই তাঁর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। নিজের ও পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ, এর মাধ্যমেই তিনি নির্বাহ করেন।

এটা শুনে ইবনে সিনা ঐ বনের দিকে রওয়ানা হলেন যে বনের দিকে লোকেরা ইঙ্গিত করেছিল। চলতে চলতে দেখলেন যে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বাঘের উপর লাকড়ীর স্তুপ রেখে আসছেন। ইবনে সিনা এ দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেলেন। আবুল হাসান নূরী রহ. যখন দেখলেন যে, ইবনে সিনা ভয় পাচ্ছেন তখন তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ইবনে সিনা! ভয় পেওনা, এটা মানুষদের কোন ক্ষতি করে না।

সালাম মুসাফাহার পর ইবনে সিনা বললেন, হযরত! একটি প্রশ্ন করতে চাই। এখানের দৃশ্য তো দেখছি, বনের হিংস্র বাঘ আপনার বোঝা বহন করছে। অথচ বাসায় আপনার স্ত্রী আপনার বদনাম করছে। এটা বুঝে আসল না।

আবুল হাসান নূরী রহ. উত্তরে বললেন, ঐ বাঘিনীর বোঝা বহন করি বলেই তো এই বাঘ আমার বোঝা বহন করে।

হে সালিকগণ! শুধু যিকির আর তাসবীহে লেগে থাকাই 'সুলূক' নয়। বরং উন্নত গুণাবলী অর্জনেরও ফিকির করতে হবে।

৪৯. বাসীরাত, হেদায়াত ও রহমতের মধ্যে ধারাবাহিকতা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

অর্থাৎ "এই কুরআন, তোমাদের প্রতিপালক এর পক্ষ হতে 'বাসায়ির' বা জ্ঞান-তত্ত্বেরও সমষ্টি। এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত"। (সূরা আ'রাফ : ২০৩)

بصائر এটা بصيرة এর বহুবচন। কোন কিছু প্রমাণের মাধ্যমে বুঝা। বুঝ সঠিক হবে তো সহীহ ফিকির হাসিল হবে। আর যখন সহীহ ফিকির হাসিল হবে তখন সঠিক পথ পাওয়া যাবে। এটাই হেদায়াত, যাকে هُدًى শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর যখন সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া গেল এবং এর উপর চলতে লাগল তখন কবূল হওয়ার ফলাফল শুভ পরিণতি হিসেবে হাসিল হল। এটাকে رَحْمَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই হল উল্লেখিত শব্দত্রয়ের মধ্যে তারতীব বা বিন্যাসের গুরুত্ব। আল্লাহর পথের পথিকদের উচিত সব সময় স্বীয় নফসের যাচাই-বাছাই করা যে, আমার নফস কোন্ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?

মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে নফসের মোট তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকার হল نَفْسِ أَمَّارَه 'নফসে আম্মারা' যা সব সময় খারাপ

কাজের প্ররোচণা দেয়। দ্বিতীয় প্রকার হল نَفْسِ لَوَّامَه নফসে লাউওয়ামাহ বা ভর্ৎসনাকারী অন্তর আর তৃতীয় প্রকার হল نَفْسِ مُطْمَئِنَّه নফসে মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত অন্তর।

প্রথমটির কথা আছে সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াতে। দ্বিতীয়টির প্রমাণ আছে সূরা কিয়ামাহ এর ২নং আয়াতে। আর তৃতীয়টির দলীল আছে সূরা ফজরের ২৭নং আয়াতে।

তো নফসের মোট ৩ প্রকার হল। প্রত্যেকের উচিত নিজ নফসের ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করা যে, আমার নফস কোন্ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত? এই অনুসন্ধিৎসা সত্যসন্ধানীর মধ্যে তখনই সৃষ্টি হবে, যখন তার বুঝ সঠিক হবে। এই অনুসন্ধিৎসা না থাকলে বুঝতে হবে সে আত্মশুদ্ধি প্রত্যাশী নয়। বুঝ সঠিক হওয়ার চাহিদা হল এটা চিন্তা করা যে, আমার নফস মুতমায়িন্নাহ হয়েছে নাকি হয়নি?

৫০. মুমিন ব্যক্তির দুনিয়াতে কিভাবে থাকা উচিত?

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : প্রত্যেক মুমিন আমভাবে এবং প্রত্যেক সালিক বিশেষভাবে এই নশ্বর জগতে এমনভাবে থাকার জন্য আদিষ্ট যে, প্রতিটি কাজ যেন শরীয়ত অনুযায়ী হয়। খানা খাওয়া এটাও ইবাদত। যেটাকে সাধারণত ইবাদত মনে করা হয় না। সব সময় এই খেয়াল থাকতে হবে যে, মহান আল্লাহ আমার কাছে কী চাচ্ছেন? তাঁর মর্জির বিপরীত যেন না হয়। এমনকি অনুত্তম কোন কাজও যেন না হয়। সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে। তারপরও হয়ে গেলে এমন তাওবা করবে যেমনটি নাজায়িয কাজ থেকে করা হয়। ব্যাপারটির উদাহরণ নিম্নরূপ :

কালেক্টরের পিওন তার অফিসের কর্মচারী হয়। ঘরের কাজ তার দায়িত্বে থাকে না কিন্তু সে কালেক্টরের সাথে বেশি সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য ঘরের কাজও এমনভাবে আঞ্জাম দেয় যেমনটি অফিসের কাজ। কোন কাজে ত্রুটি হয়ে গেলে এমনভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে যেমনটি অফিসের কাজে ভুল হলে মাফ চাওয়া হয়।

হযরত মুআবিয়া রাযি. তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার কারণে সারাদিন কান্নাকাটি করেছেন। কেননা এই তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়া মহব্বতের আদব

পরিপন্থী কাজ। এর দ্বারা বুঝে নিন সাহাবায়ে কেরামের রাযি. মতভেদের দিকে আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। আমরা তো দেখি, সাহাবায়ে কেরাম মহান আল্লাহর মহব্বতে ডুবা। এমন পবিত্র আত্মার অধিকারী মানুষগণ কি পদমর্যাদা লাভের জন্য লড়াই করতে পারেন? কস্মিনকালেও নয়। তাঁদের পারস্পরিক মতপার্থক্য সব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ছিল।

তো হযরত মুআবিয়া রাযি. রাতে তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার দরূন দিনভর কান্নাকাটি করে কাটালেন। আজ ইশার পরপরই শুয়ে পড়লেন। তাহাজ্জুদের সময় দেখলেন কেউ তাকে তাহাজ্জুদের জন্য ডাকছে যে, তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। তাহাজ্জুদ পড়ে নিন।

হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, তুমি কে? বলল, আমি সেই যে আপনাকে গতকাল ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, তুই তাহলে শয়তান? বলল, জী হ্যাঁ। তখন হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন : শয়তান আবার তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করে নাকি? তোর কাজ তো মানুষকে শুইয়ে রাখা। তখন শয়তান বলল : হুযুর! গতকাল আপনাকে শুইয়ে দিয়েছিলাম। আপনি পূর্ণ দিন কান্নাকাটি করেছেন। এই কান্নার ফলে আপনার পদমর্যাদা এত বেড়ে গেছে যে, তাহাজ্জুদ পড়ার দ্বারা হত না। এজন্য উঠিয়ে দিতে এসেছি যে, আপনি তাহাজ্জুদই পড়ে নিন।

বুঝা গেল, শয়তান কাউকে দ্বীনী কোন কাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিলে তার উদ্দেশ্য থাকে যেন এর থেকে যেটা বড় কাজ সেটা থেকে বিরত রাখতে পারে। এমনটি বলবেন না যে, তিনি তো সাহাবী ছিলেন। আর আমরা তো সাহাবী নই। তিনিও আশেকে রাসূল ছিলেন। আর আমরাও আশেকে রাসূল!!

৫১. ইলম এর সাথে হিলমও (নম্রতা) জরূরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ইলমের জন্য হিলমও জরূরী। নম্রতা ও বিনয় ব্যতীত জ্ঞানের প্রসিদ্ধি হয় না। এজন্যই হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ أَغِنِّيْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ

"হে আল্লাহ! আপনি ইলম দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন এবং নম্রতার মাধ্যমে আমাকে সুসজ্জিত করুন"। (কানযুল উম্মাল)

মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলমের সাথে হিলম তথা জ্ঞানের সাথে নম্রতার সমন্বয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলমের উপর পুরোপুরি আমল হবে না। প্রতিবন্ধকতা আসতেই থাকবে। কেউ হয়ত একটু আপত্তি করল, ব্যস তবিয়ত আমল থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেল।

ইলম তো আমলের জন্য। আর এই আমল পুরোপুরি তখনই সম্ভব যখন বিনয় ও নম্রতা থাকবে। নতুবা ঐ ইলম দ্বারা না নিজের উপকার হবে আর না অন্য কে উপকৃত করতে পারবে। যখন ইলমের প্রচার-প্রসার করবে, তখন অনেক মানুষ তার বিরুদ্ধে চলে যাবে যে, এই লোক তো আমাদেরকে আমাদের আনন্দের জিনিস থেকে বাঁধা দেয়। ফলে মানুষ তার শত্রু হয়ে যাবে।

তাবলীগ কিভাবে করবে?

তাবলীগ দু প্রকার। ১. খাস তাবলীগ, ২. আম তাবলীগ। খাস তাবলীগ যেমন মাদরাসার শিক্ষা-দীক্ষা, এতেও অনেক বিনয়ের প্রয়োজন।

হে মুহতামিম ছাহেব! হে মুদাররিস ছাহেব! আপনি কি জানেন না বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে কেমন ছাত্র আসছে? কেমন তাদের স্পৃহা? কেমন বংশের ছেলে? সুতরাং হে মুহতামিম ও মুদাররিস ছাহেবান! যদি আপনাদের ইলমের সাথে হিলম না থাকে, তাহলে আপনারা কিভাবে খাস তাবলীগ করবেন?

মানুষ বাড়ী বানায়, মজবুত করেই বানায়। এর উপর প্লাস্টার কেন করে? যাতে করে পানি লেগে বাড়ী নরম হয়ে না যায়। এবং দেয়াল পড়ে না যায়। তো প্লাস্টার দ্বারা অতিরিক্ত মজবুত হয়। অতঃপর রং, নকশা কারুকাজ ইত্যাদি কেন করা হয়? যাতে দেখতে সুন্দর লাগে।

ঠিক তদ্রূপ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার পর নম্রতার মাধ্যমে সৌন্দর্য কামনা করেছেন। কেননা এটা ছাড়া ইলম দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়া যায় না।

এজন্য হে ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ! ইলমের দ্বারা সহীহ উপকার লাভের জন্য ইলমে সহীহ এর পাশাপাশি হিলম ও নম্রতাও জরূরী।

৫২. বিনা প্রয়োজনে টেক লাগিয়ে চারজানু হয়ে বসা অনুচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমার সারা জীবনের অভ্যাস এটাই ছিল যে, কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতাম না আর কখনো বালিশে হেলান দিতাম না। ব্যস, যে পার্শ্বের উপর বসেছি তো বসেছি। কিন্তু এখন অপারগ হয়ে গেছি। পা জবাব দিয়ে দিয়েছে।

আমার কাছে আশ্চর্য লাগে, অনেক যুবক ছেলে হেলান দিয়ে বসে! এমনকি চারজানু তথা আসন গেড়ে বসে পড়ে!!

৫৩. মেহমানের জন্য কিছু আদব

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ফিকহী মাসআলা হল, মেহমানকে মেযবান যেখানে বসাবে সেখানে বসে যাবে। জানিনা এর গূঢ়তত্ত্ব কী?

এমনিভাবে খানার সময় যে মেহমান এর সামনে যে প্লেট রাখবে, সেটার মধ্যে পরিবর্তন করবে না। হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর একটি কিতাব আছে "আদাবুল মুআশারাত" নামে। এই কিতাবে এইসব কথা লেখা আছে। ছাত্ররা এটা দেখেইনা। এটা দেখা উচিত। হযরত থানভী রহ. এর ছোট ছোট কিতাবের মধ্যে মণিমুক্তা ভরা।

এমনিভাবে কোন বরতন থেকে কোন জিনিস সরাসরি নিবে না। এটা আসলে একটা মূলনীতি। যার সম্পর্ক সৃষ্টির শুরুর সাথে। বিস্তারিত বিবরণ হল, যখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন :

اِنِّیۡ جَاعِلٌ فِی الۡاَرۡضِ خَلِیۡفَۃً ؕ

"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বা প্রতিনিধি বানাতে চাই"

(সূরা বাকারাহ : ৩০)

এ কথাটা মহান আল্লাহ বলেছেন অন্য সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করার পর। 'খলীফা" শব্দটাই বলছে, মহান আল্লাহ এমন এক মাখলূক সৃষ্টি করবেন যার মধ্যে তিনি স্বীয় দিয়ানতী ও আমানতী গুণ স্থানান্তরিত করে পৃথিবীতে পাঠাবেন। সে মূলনীতির ক্ষেত্রে কখনো আল্লাহর বিরোধিতা করবে না। আর শাখা-প্রশাখাগত ব্যাপারে ইজতিহাদ চালাবে না। প্রয়োজনের খাতিরে যদি

চালিয়েও দেয়, তাহলে আমি বাকী রাখলে বাকী থাকবে। আর আমি না রাখলে থাকবে না। তো সে আমার পুরো সিফাতের সাথে থাকবে। এটাকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য শব্দে এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِه

"আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে নিজ আকৃতিতে বানিয়েছেন"।

(সহীহ বুখারী, পৃ: ৯১৯)

এর অর্থ এটা নয় যে, মহান আল্লাহর কোন বিশেষ আকৃতি আছে। যার উপর আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন। বরং প্রত্যেক জিনিসের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই তো আমাদের নিকট যখন 'মীরাছ' সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে, তখন উত্তর লেখার সময় আমরা লিখি صورتِ مسئله এখানে মাসআলার সূরত বলতে আকৃতি বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, মাসআলার হাত-পা, নাক , কান, চোখ ইত্যাদি হবে। বরং মাসআলার কাইফিয়ত বা অবস্থা তথা বিবরণ উদ্দেশ্য থাকে।

ঠিক এখানেও এটাই উদ্দেশ্য যে, মহান আল্লাহ হযরত আদম আ. কে নিজ সিফাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এসব গুণ হযরত আদম আ. এর মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। যেমন বলা হয় زَيْدٌ أَسَدٌ 'যায়েদ সিংহ' তো এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যায়েদের আকৃতি সিংহের মত। বরং প্রকৃত মর্ম হল সিংহের বিশেষ গুণ তথা বীরত্ব যায়েদের মধ্যে এত বেশি মাত্রায় পাওয়া যায় যে, কেমন যেন সে হুবহু সিংহ হয়ে গেছে। কেননা যদি পূর্ণ বীরত্ব যায়েদের মধ্যে উপস্থিত করানো উদ্দেশ্য না হত, তাহলে তো زيد كالأسد বা 'যায়েদ সিংহের মত' বলা হত।

এখানেও ব্যাপারটাকে সেভাবেই বুঝতে হবে। হযরত আদম আ. এর মধ্যে মহান আল্লাহর সিফাত পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

এটাই সেই জিনিস যা মানসূর হাল্লাজের মধ্যে জোশের সাথে এসে গিয়েছিল। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সিফাতের তাজাল্লীর প্রাবল্য এত বেশি হয়ে গেছে যে, এই জোশে أنا الحق 'আমিই হক' বলে ফেলেছে। তাহলে তিনি কী অন্যায় করলেন? এতে কোন খারাবী ছিল না। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, যদি কোন খারাবী নাই থাকে তাহলে তাঁকে শূলীতে দেয়া হল কেন?

আসলে এটা ভিন্ন ব্যাপার। যেটা আমার হযরত থানভী রহ. এর বক্তব্যের আলোকে আমি আপনাদেরকে বলছি। এর বিবরণ হল এই যে, মানসূর হাল্লাজের মধ্যে 'ওয়াহদাতুল উজূদ' এর প্রাবল্য ছিল। এটা হযরত শিবলী রহ. এর মধ্যেও ছিল। কিন্তু হযরত শিবলীর শাইখ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি মানসূর হাল্লাজের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। যার কারণ হল এই যে, তিনি শাইখের অনুমতি ছাড়াই মক্কা শরীফ সফর করেছিলেন। এরপর অনেক কঠিন কঠিন মুজাহাদা করেছেন। যদ্দরুন তাঁর থেকে বাহ্যিক বেশ কিছু কারামাত প্রকাশ পায়। বহু মানুষ তার ভক্ত হয়ে যায়। আর তিনিও শাইখের অনুমতি ছাড়াই বাইআত করা আরম্ভ করে দেন। দেশে ফেরার পর শাইখের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝলেন না। ফলশ্রুতিতে আপন শাইখের সাথে তাঁর দূরত্ব বেড়ে গেল। শাইখ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর এটা মহান আল্লাহর একটা রীতি যে, শাইখের অসন্তুষ্টির কারণে আখেরাতের কোন ক্ষতি হয় না ঠিক, যেমনটা স্বয়ং গুনাহের দ্বারা হয়। কিন্তু শাইখের অসন্তুষ্টির প্রতিক্রিয়া দুনিয়ার লোকসানের উপর পড়ে। যেমন কেউ তাঁর শাইখের ইচ্ছার বিপরীত কোন কাজ করল, শর্ত হল সেটা শরীয়ত বিরোধী না হতে হবে। তাহলে দুনিয়াবী ক্ষতি হবে। যেমন কারো বাসায় যদি অতিথি আসে আর সে ঐ অতিথির খেদমত না করে, তাহলে সে আর আসবে না।

৫৪. যেমন অতিথি সেরকম আপ্যায়ন

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : দিলে যে কথাটা আসে, সেটাও আল্লাহর মেহমান। তার সম্মান এটাই যে, তার উপর আমল করতে হবে। আমল না করলে ক্ষতি হবে। এখন ঐ ক্ষতি সম্মান, সম্পদ আত্মমর্যাদা ইত্যাদি অনেক কিছুরই হতে পারে। এমনিভাবে শাইখের অসন্তুষ্টির প্রভাব কোন কিছুর উপর পড়েই যায়। আর শাইখের অসন্তুষ্টি শুধু গুনাহের উপরই সীমাবদ্ধ নয়, তবিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে।

হাদীসে পাকে এর প্রমাণ আছে, হযরত ওয়াহশী রাযি. যিনি কাফের অবস্থায় হযরত হামযা রাযি. কে শহীদ করেছিলেন। পরবর্তীতে ঈমান

আনয়ন করেন এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইয়ামামার যুদ্ধে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসাইলামাকে হত্যা করেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহশী রাযি. কে বললেন, তুমি কি আমার সামনে না এসে থাকতে পারবে? কেননা তুমি আমার সামনে আসলে আমার চাচা শহীদ হওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে। ফলে তিনি ফিরে চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় আর কোনদিন মদীনা মুনাওয়ারায় আসেননি।

তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে কষ্ট ছিল সেটা ছিল স্বভাবসুলভ বা প্রকৃতিগত কষ্ট। কেননা হযরত ওয়াহশীর রাযি. হযরত হামযা রাযি. কে শহীদ করা কোন্ গুনাহ ছিল? যেহেতু তিনি তখন মুসলমানই ছিলেন না। কিন্তু হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه

"নিশ্চয়ই ইসলাম তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহকে খতম করে দেয়"।

(সহীহ মুসলিম, ১২১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ২৫১৫)

আসল কথা হল হযরত হামযা রাযি. এর শাহাদাতের স্মৃতি মনে পড়লে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরে এক প্রকারের কষ্ট অনুভব হত। যদ্দরুন তাঁর পবিত্র অন্তর অনিচ্ছাকৃতভাবেই বিষণ্ন হত। এই বিষণ্নতার কারণে হযরত ওয়াহশীর রাযি. ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। কেননা তবিয়তগত বিষণ্নতার কারণে খুসূসী ফয়েয বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তো বয়ানকারীর তবিয়তও বয়ান করা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

যাই হোক, এর মধ্যে বিশেষভাবে হযরত ওয়াহশী রাযি. এর লাভ ছিল এবং অন্যান্যদের উপকার নিহিত ছিল। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেছেন। এছাড়া এ আশংকাও ছিল যে, এমন কোন আয়াত নাযিল হতে পারে, যাতে হযরত ওয়াহশী রাযি. এর বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মির্যা মাযহার জানেজাঁনা রহ. মানুষের সাথে মেলামেশা খুব কম করতেন। কেউ একজন আরয করল, লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসে, অথচ আপনি নিষেধ করে দেন। মানুষেরা তো হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

হযরত বললেন : "কী করব? লোকেরা আসে, তাদের উল্টা-পাল্টা কাজের কারণে আমার কষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ নিয়ে নেন। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট একাধিকবার দরখাস্ত করেছি যেন আমার কারণে কারো থেকে প্রতিশোধ নেয়া না হয়। আমার অন্যান্য দু'আ তো কবূল হয় কিন্তু এই দু'আ কবূল হয় না। এজন্য মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই মানুষের সাথে মেলামেশা কম করি"।

যেমন অনেক সময় যার সাথে ঘটনা ঘটেছে তিনি মাফ করে দিলেও সরকার মাফ করে না বরং সরকার নিজেই বাদী হয়ে মামলা চালায়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কোন কোন বুযুর্গের পক্ষ থেকে বাদী হয়ে যান। কেন হন? ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُه بِالْحَرْبِ

"যে আমার কোন বন্ধুকে কষ্ট দিবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫০২)

ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারে না। এতে কোন অসুবিধাও নেই। কিন্তু যিনি বলছেন তাঁর উপর আস্থা রেখে মেনে নিন। যখন পরিশুদ্ধ বুঝ আসবে তখন আপনা আপনিই বুঝতে পারবেন। আর হাদীসের পর তো কোন কথাই অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিতীয় একটি ঘটনা শুনুন। জনৈক বুযুর্গ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কেউ একজন তাঁর সাথে মারাত্মক বেআদবী করল। বুযুর্গ আরো সামনে অগ্রসর হয়ে খাদেমকে বললেন, একে একটা ঘুষি মার। খাদেম একটু বিলম্ব করল, হঠাৎ করে লোকটি মারা গেল। বুযুর্গ খাদেমের সাথে গোস্বা করে বললেন, তুমি বিলম্ব করে একে শেষ করে দিলে। আমি দেখলাম, তার গোস্তাখীর উপর আল্লাহর আযাব আসছে। আমি চেয়েছিলাম নিজেই প্রতিশোধ নেব। কিন্তু তুমি বিলম্ব করলে, ফলে আল্লাহ তা'আলা বদলা নিয়ে নিলেন।

এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহশী রাযি. কে তার কল্যাণের জন্যই নিষেধ করে দিয়েছেন। প্রকৃতিগত ব্যাপার থেকে নবীগণও পবিত্র হন না। নবী সেটা দূর করার ব্যাপারে আদিষ্ট নন।

আমাদের হযরত থানভী রহ. ঘটনা শুনিয়েছেন যে, কিছু কিছু জিনিস তবিয়তগত হয়। কী আর করা? আমি এ ব্যাপারে খুব লক্ষ্য রাখি। এই যেমন বাইতুল খালায় আসা যাওয়ার পথ সংকীর্ণ। আমি যখন ইস্তিঞ্জা শুকাই ঐ মুহূর্তে কেউ সেদিকে চলে আসলে আমাকে জড়সড় হয়ে দাঁড়াতে হয়। তাদের এই তাওফীক হয় না যে, একটু আদবের সাথে যাবে। আমাকেই একদিকে হটে যেতে হয়। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার খেয়াল হয় যে, এই লোকটির মধ্যে আদবের কমতি আছে।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর শরীর ভারী ছিল। তো হযরত বলতেন যে, ভালবাসার দাবীদার কোন ব্যক্তি যখন এ কাজ করে তখন প্রকৃতিগতভাবেই মনে হয় যে, এর মধ্যে আদবের ঘাটতি আছে।

হযরত ওয়াহশী রাযি. এর ঘটনা দ্বারা আরেকটি বিষয় জানা গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সব সময় হকের মুশাহাদা ছিল। কিন্তু এই মুশাহাদা বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকরণ সত্ত্বেও এমন আত্মভোলা অবস্থা হতনা যে, অন্য কোন কথা মনে থাকবে না। বরং এমন মুশাহাদার মধ্যেও তিনি স্বভাববান্ধব কিছু কিছু ব্যাপারে প্রভাবিত হতেন।

এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, নামাযের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে এদিক সেদিকের খেয়াল আসলে সেটা 'মুশাহাদা' এবং 'হুযূর' এর পরিপন্থী নয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়।

সালেক তথা আল্লাহর পথের পথিক এজন্য ঘাবড়ে যায় যেহেতু 'সুলূকের' মাসআলা তার জানা নাই। সে নামাযের মধ্যে এসব খেয়ালকে 'হুযূরের' পরিপন্থী বিষয় মনে করে। এজন্য ঘাবড়ে যায়। কথা অনেক দূরে চলে গেছে।

আমি বলছিলাম যে, মেহমান যেন মেযবানের অনুমতি ব্যতীত নিজ পাত্র থেকে কাউকে কিছু না দেয়। আর এ ব্যাপারটি সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে। যখন মহান আল্লাহ হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখলেন, তখন আদম আ. বললেন, "আল্লাহ! আমার অন্তর জমছে না। কোন সঙ্গী হলে ভাল হয়।" ব্যস এটা বলামাত্রই তাঁর মধ্যে তন্দ্রার ভাব আসল এবং তাঁর বাম পাজড় থেকে হযরত হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করা হল। যখন তাঁর তন্দ্রাভাব

দূর হল তখন দেখলেন যে, সুন্দরী রূপসী একজন নারী বিদ্যমান। তবিয়ত আকৃষ্ট হল। হযরত আদম আ. হাত বাড়ালেন।

ইরশাদ হল : না, না, আগে বিবাহ হতে দাও, ফলে বিবাহ হল।

তাহলে দেখুন, জান্নাতে হযরত আদম আ. আল্লাহ পাকের মেহমান। মেযবান অর্থাৎ মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত হযরত হাওয়া আ.কে স্পর্শ করার অনুমতি পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে এক্ষেত্রেও বুঝতে হবে। এ অধমের কথাবার্তা এমনই হয়।

৫৫. কাফের ও মুশরিক খোদাদ্রোহী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মহান আল্লাহ চাইলে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু শিরকের গুনাহ কস্মিনকালেও মাফ করবেন না। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ কখনোই মাফ করবেন না। অবশ্য শিরক ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ যাকে চাইবেন মাফ করে দিবেন"। (সূরা নিসা : ১১৬)

এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, কুফর ও শিরকের কোন ক্ষমা নাই। এটা হল নকলী বা কুরআন সুন্নাহভিত্তিক দলীল। আর আকলী বা যুক্তিভিত্তিক দলীল হচ্ছে এই যে, কাফের মুশরিকদের উদাহরণ হল, বিদ্রোহীর মত। কেননা যেমনিভাবে বিদ্রোহী ব্যক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কে অস্বীকারকারী, আর পৃথিবীর নিয়ম হল এই যে, রাজা সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহীকে ক্ষমা করা হয় না।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্তানের কোন কোন সম্প্রদায়ের উপর যখন লুটপাট ছিনতাই আর অগ্নিকান্ডের তুফান বয়ে চলল, সবাই চোখ বন্ধ করে দেখতে থাকল। জাতির সব অপরাধ মাফ। কিন্তু যখন কুফর আর শিরকের মুআমালা আসল, হুকুমতের মধ্যে অন্য মানুষ শরীক হতে থাকল, আর মনে করতে

লাগল যে, আমার হুকুমত তথা রাজত্ব চলছে, তখন এই শিরক ফিল হুকুমত' বা রাজত্বের অংশীদারিত্বকে রাষ্ট্র সহ্য করল না এবং উচ্চপদস্থ অফিসার, জমিদার সবাইকে গ্রেফতার করা হল আর ঘোষণা করে দেয়া হল যে, সবাই এই শিরক থেকে তাওবা করুন, ক্ষমা চেয়ে নিন, তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে যারা তাওবা করলেন, তাদেরকে মুক্তি দেয়া হল।

এমনিভাবে যখন কোন কাফের বা মুশরিক কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে তখন মহান আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই ইসলাম তার পূর্বের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১)

এ বিষয়বস্তুর উপর যখন আমি বাদ যোহর আলোচনা করছিলাম, তখন ভূপালের কাযিউল কুযাত বা প্রধান কাজীও বিদ্যমান ছিলেন। যিনি বড় আলেম হওয়ার সাথে সাথে আমার মুজাযও (বাইআতের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত) বটে। তিনি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছসিত ছিলেন। বিশেষত শিরক ফিল হুকুমত শিরোনামে আমি যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, এর উপর তিনি আত্মহারা হয়ে যান।

আসল কথা হল যাদের মধ্যে ইলমী অভিরুচি আছে, তাঁরাই আনন্দিত হয়। যখন কোন ইলমী কথা তার কানে পড়ে বা কোন কঠিন মাসআলার সমাধান পায় তখন তারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ঘটনা। যখন তিনি কোন জটিল মাসআলার তাহকীক করতেন যাতে সময় বেশি লাগত, সহজে সমাধান হত না। এ জাতীয় মাসআলা যখন হল্ হত তথা সঠিক সমাধান বের হয়ে আসত তখন তিনি দারুণ আনন্দিত হতেন। কেননা, উলামায়ে কেরামের নিকট সারা পৃথিবী একদিকে আর ইলমী মাসআলা একদিকে।

এমনিভাবে দুনিয়াবী কোন দুর্লভ বস্তু যখন অনেক খোঁজাখুজির পর পাওয়া যায় তখন মানুষ অনেক আনন্দিত হয়। আমাদের একজন শিক্ষক

ছিলেন খুবই পরিশ্রমী ও স্নেহপরায়ণ। শরহে জামী بحث فعل পর্যন্ত আমাদের থেকে মুখস্ত শুনতেন। আমাদের এখানে বিরলায় পড়াতেন। মাগরিবের পর বসে আমাদেরকে পড়া মুখস্ত করাতেন।

একদিন আমি সবক মুখস্ত করছিলাম, হুযুর আমাকে ডাকলেন আর বললেন যে, তাঁর কোমরে ব্যথা হচ্ছে, আমি যেন একটু টিপে দেই। আমার উপর এটা সব সময় আমার মহান শিক্ষকবৃন্দের বিশেষ স্নেহ ও দয়া যে, তাঁরা আমার দ্বারা খেদমত নিতেন।

আমি হযরতের কোমর দাবানো আরম্ভ করলাম। মাশাআল্লাহ, খুব ভারী শরীর ছিল। এর মধ্যেই বললেন, আজ আমার খুব আনন্দ অনুভূত হচ্ছে, এত আনন্দ যে, পুরো পৃথিবীর রাজত্ব পেলেও এত আনন্দ হত না। ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমি ডাভেল, রান্দির ইত্যাদি স্থানে গিয়েছি। আমি গাছের একটি শিকড়ের সন্ধানে ছিলাম। সেটা পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু আজকে সকালে যখন হাঁটতে যাই তখন সেই শিকড় পেয়ে গেছি। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

তাহলে দেখুন, সামান্য একটি গাছের শিকড় বা চারা পেয়ে যদি মানুষ এত আনন্দিত হতে পারে, তাহলে যাঁরা ইলমী অভিরুচি রাখেন, তাঁদের যখন কোন ইলমী সমস্যার সমাধান হয় কতটুকু আনন্দিত হতে পারেন? এই ইলমের সামনে সারা পৃথিবী তুচ্ছ। ইলম দ্বারা কোন্ ইলম উদ্দেশ্য? ইলমে ওয়াহী। চাই সেটা عبارة চতুষ্টয় তথা ১। عبارة النصّ । ২ إشارة النص । ৩. دلالة النص । 4 اقتضاء النص এর মধ্যে থেকে যে কোনটির দ্বারাই হোক না কেন। অথবা حقيقت বা مجاز এর দ্বারা হোক কিংবা اجماع বা قياس দ্বারা। اجماع কিন্তু نص এর মত অকাট্য প্রমাণ।

দুনিয়ার অন্যান্য বিদ্যার কোন মাসআলা হল্ বা সমাধান হলে যদি এত আনন্দ লাগতে পারে, তাহলে ইলমে ওয়াহীর কোন মাসআলা হল্ হলে কী পরিমাণ আনন্দ অনুভূত হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

আর যে মহান সত্তা অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সরাসরি মহান আল্লাহ থেকে ইলম হাসিল করছেন তাঁর অভ্যন্তরীণ আত্মিক প্রশান্তি ও কলবী প্রফুল্লতার কী অবস্থা হতে পারে? যদি মাহবূবে হাকীকী

তথা প্রকৃত প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহ সরাসরি কথা বলেন সে ক্ষেত্রে অবস্থা কেমন হবে? এজন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহী অবতরণের সময় ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন।

আসল কথা হল, যখন সরাসরি কথা বলা হয়, তখন আর কোন খবর থাকে না। মানুষ আত্মহারা হয়ে যায়।

তো যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় অন্য কোন কিছুর খবর থাকত না, সেহেতু অন্য কোন কিছু শামেল হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না? কারণ ওহীর শব্দের সাথে অন্য কোন শব্দের মিল নেই। অতএব পুরো ওয়াহী সরাসরি মহান আল্লাহর কালাম। কাজেই এতে ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। এটা যুক্তির কষ্টিপাথরেও অসম্ভব। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীম যেভাবে নাযিল করেছেন ঠিক সেভাবেই আছে।

হে দুনিয়াদারগণ! এরপরও আপনারা কেন উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করেন? আলেমগণের কোন কথা বা কাজে অহংকার প্রকাশ পেলে আপনারা কোন্ সাহসে তাঁদের সমালোচনা করেন? আপনারা যদি কোট পাতলূন পরিধান করে অহংকার করতে পারেন, তাহলে আলেমগণ ফেরেশতাসুলভ পোষাক পরিধান করে অহংকার করলে ঠিকই আছে। কারণ আপনাদের নিকট যে বস্তু আছে অর্থাৎ সম্পদ সেটা হল ধ্বংসশীল পক্ষান্তরে আলেমদের নিকট যে বস্তু আছে অর্থাৎ ইলম সেটা হল চিরন্তন। কথাটা আমি শুধু তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য বলেছি। নতুবা ইলমে ওয়াহী যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, অতই বিনয় বাড়তে থাকে।

তো হে তালিবে ইলমগণ! এই ইলমী যওক বা ঝোঁক বড় অদ্ভুত জিনিস। এই ঝোঁক সৃষ্টি করো। এজন্যই মজলিসে কোন যওকওয়ালা থাকলে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করো। তাঁদের কেমন আনন্দ লাগে। যেমন যওকসম্পন্ন কোন কবির সামনে যখন কবিতা পাঠ করা হয়, তখন সে যে স্বাদ পায় ঐ স্বাদ আমরা পাইনা। যে প্রথম কবিতায় ابر বা মেঘ নিয়ে আসল আর দ্বিতীয় কবিতায় আনল مطر বা বৃষ্টি।

مختصر المعانى (মুখতাসারুল মা'আনী : আরবী অলংকার শাস্ত্রবিষয়ক অসাধারণ কিতাব, আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. রচিত) পড়ার পরও যদি যওক না আসে তাহলে তো বড় তাজ্জবের ব্যাপার।

এমনিভাবে যওকওয়ালা ব্যক্তি জানে সূরা আর রাহমানে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতে কারীমের তাকরার বা বারবার উল্লেখ কেন? এজন্যই ভূপালের কাজী ছাহেব বাদ যোহর ও বাদ আসরের মজলিস দ্বারা আনন্দিত হচ্ছিলেন। যেহেতু অদ্ভুত ইস্তিম্বাতাত তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসায়িল আহরণ হচ্ছিল।

কথা শুরু করেছিলাম কী দিয়ে? আর চলে গেছি কোথায়? যদিও সেটা শরয়ী তাফসীর নয় কিন্তু শরীয়তের বিপরীতও নয়। এটা কে এক বিশেষ ধরণের কিয়াস বলে। আমাদের তো প্রত্যেক কথায় ওয়াহীর কথা মনে পড়ে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই তো হল ওয়াহীর উপর আমল করা। ব্যস! জান্নাতও সরাসরি আকাঙ্খিত নয়। বরং দীদারে ইলাহীর কারণে আকাঙ্খিত। এই দীদার যদি দোযখেও হয়, তাহলে সেটাই আমাদের আরাধ্য বস্তু। জনৈক কবি খুব সুন্দর বলেছেন :

خاک ایسی زندگی پر ہم کہیں اور تم کہیں

অর্থাৎ, ঐ জীবনের উপর মাটি পড়ুক, যেখানে আমি কোথায় আর তুমি কোথায়?

হযরত বাবা ফরিদ ছাহেব রহ. কুতুব ছাহেব রহ. এর খেদমতে থাকতেন। একবার কোথাও জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন। ফেরার পর কুতুব ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন, ফরিদ তুমি কিছু শুনেছ? কোন্ বুযুর্গ নাকি দিল্লীতে এসেছে আর বলাবলি করছে, আমার অন্তরে একথা এসেছে "যে ব্যক্তি অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত আমাকে দেখবে সে জান্নাতী"। বাবা ফরিদ আরয করলেন, জ্বী হযরত শুনেছি। কুতুব ছাহেব রহ. বললেন, তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তাহলে তুমিও জান্নাতী হয়ে যেতে!

আরয করলেন, হযরত! এটা তার অন্তরে উদ্রেক হওয়া একটা কথামাত্র। আর সাধারণত আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে যে কথার উদ্রেক হয় সেটা হক হয়। তো তাকে দেখে না হয় আমি জান্নাতী হলাম। আর হযরত! আপনার ব্যাপারে তো আমার ধারণা এটাই যে আপনি জান্নাতী। কিন্তু আল্লাহ না করুন এমনও তো হতে পারে যে, আপনি জাহান্নামে চলে যাবেন, তো হযরত এমন জান্নাত নিয়ে আমি কী করব? যেখানে আমি আছি অথচ আপনি নেই!

ব্যস এই ভক্তিপূর্ণ কথা শুনে কুতুব ছাহেব রহ. এর জোশ উঠল এবং বললেন, উনি তো একথা বলছেন যে, "যে আমাকে অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত দেখবে সে জান্নাতী" আর আমি বলি "যে তোমার কবর যিয়ারত করবে সে জান্নাতী"।

হযরত কুতুব ছাহেব রহ. এর দিলে তখনই এ কথাটা এসেছে। আমি বাবা ফরিদ রহ. এর মাযারে গিয়েছি। সেখানে একটি দরওয়াজা আছে। যেখানে লেখা আছে باب الجنة যা "জান্নাতের দরওয়াজা"।

এই ঘটনা এই প্রেক্ষিতে মনে আসল যে, আসল উদ্দেশ্য হল দীদারে ইলাহী। জান্নাত মূলত উদ্দেশ্য নয়। বরং দীদারে ইলাহীর ক্ষেত্র হওয়ার কারণে সেটা উদ্দেশ্য।

৫৬. কঠোরতার শর্তসমূহ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শরীয়তের মূলবিধান হল নমনীয়তা। কিন্তু যদি কেউ অপারগ হয়ে যায় উদাহরণস্বরূপ অপরজন সব ধরণের নম্রতা সত্ত্বেও নিবৃত্ত হচ্ছে না। এদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পেরেশানী হচ্ছে এবং তার সামর্থও আছে যে, কঠোরতার কারণে তার শরীর প্রভাবিত হয় না। তার অন্তর শক্তিশালী এবং মস্তিষ্কও শক্তিশালী। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মজবুত, আর অন্যের পক্ষ থেকে কোন বিপরীত ধর্মী কথা শুনলে সে সেটা সহ্যও করতে পারে। দুনিয়াবী ক্ষতি এবং দ্বীনী কাজে কোন অসুবিধাও না হয়, তাহলে কঠোরতার অনুমতি আছে। নতুবা ধৈর্যই ধরতে থাকবে। কেননা অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি এমন হয় যার না আছে আখেরাতের ভয় আর না আছে দুনিয়ার লাজ-লজ্জা, এদিকে এ ব্যক্তির আখেরাতের ভয়ও আছে আবার দুনিয়ার লাজ-লজ্জাও আছে, তাহলে এমতাবস্থায় সবর ও ধৈর্যধারণ ব্যতীত আর কোন উপায় নেই।

এমন লাপরোয়া মানুষের সাথেও আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আচরণ করে দেখিয়েছেন। তাইতো হযরত আয়েশা রাযি. বলেন : জনৈক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে ঢুকার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। তাকে চিনতে পেরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ "গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি"। পরে যখন সে ভিতরে প্রবেশ করল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে নরম ও কোমল আচরণ করলেন।

তো দেখুন এমন মানুষের সাথে নরম ব্যবহার এটা উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই করেছেন।

এখন এটা জানার পর সময় মত মনে রেখে কাজ করা যাকে "ইসতিহযার" বলা হয় এটা হল উম্মতের কাজ। অনেক মানুষ বীরত্ব দেখিয়ে বলে, আমি কারো কাছে নত হয়ে কাজ করতে চাই না। কিন্তু যখন কোন মুসীবত চলে আসে, তখন খুব নত হয়ে যায়। এই সব হল অনভিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ।

৫৭. প্রশান্তি আসে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা, ধারণাপ্রসূত প্রমাণ দ্বারা নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : তখন আমার ছেলেবেলা। আমাদের মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. আলীগড়ে আগমন করলেন। তখন সেখানে কংগ্রেসের সাংঘাতিক দাপট ছিল। ইউনিভার্সিটির ধর্মবিভাগের জনৈক প্রফেসর আগমন করলেন এবং আরয করলেন যে হযরত! অনুমতি হলে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত বললেন : খুব ভাল, তিনি বললেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : "যেখানে ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায় সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে"। (সহীহ ইবনে হিব্বান ১০:২৫৯)

হযরত থানভী রহ. বললেন : আপনি হাদীসের মর্ম বুঝেননি নাকি ব্যভিচারের সাথে মহামারীর যোগসূত্র বুঝতে পারছেন না? অন্যায় ও তার শাস্তির মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা বুঝে আসছে না? তো এতে কী অসুবিধা? তিনি বললেন : মনে যাতে প্রশান্তি আসে, এজন্য বুঝতে চাই।

হযরত থানভী রহ. বললেন, প্রশান্তি কাংখিত হওয়ার কী প্রমাণ আছে? তিনি বললেন : কুরআনে কারীমে হযরত ইবরাহীম আ. এর ঘটনায় আছে :

وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ

"কিন্তু যাতে আমার অন্তর প্রশান্ত হয়"। (সূরা বাকারাহ : ২৬০)

হযরতওয়ালা থানভী রহ. বললেন : যদি হযরত ইবরাহীম আ. এর মনে প্রশান্তি এসে থাকে, তো এটার কী প্রমাণ যে, আপনার অন্তরেও প্রশান্তি আসবে?

এবার ঐ প্রফেসর ছাহেব বললেন : হযরত! বুঝে এসে গেছে।

উদ্দেশ্য হল এই যে, ইবরাহীম আ. কে তো আল্লাহ তা'আলা চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, চারটা পাখী আন। এগুলো জবেহ করে টুকরো টুকরো করে পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখ। অতঃপর ডাক। দেখবে প্রত্যেকের অংশ একত্রিত হয়ে পুনরায় জীবিত হয়ে তোমার সামনে এসে পড়বে।

কিন্তু আপনাকে তো আর চাক্ষুষ দেখাতে পারব না যে, ব্যভিচারের ফলে কিভাবে মহামারী আসে। যা কিছু বলব যুক্তির আলোকে বলব। তো হতে পারে যে, ঐ যুক্তিগত প্রমাণের দ্বারা আপনার অন্তরে প্রশান্তি আসবে না।

৫৮. মুজাদ্দিদের একটি আলামত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মুজাদ্দিদ বা যুগসংস্কারকের এটাও একটি আলামত বা লক্ষণ যে, তাঁর মনে ঐসব কথাবার্তা আসে, যা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বড় বড় আলেমদের মনে আসে না।

৫৯. শরীয়তের দোষ অনুসন্ধান করা খুবই অন্যায়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শরীয়তের মধ্যে দোষ বের করার দৃষ্টান্ত এরকম : জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তায় সে দেখল যে, একটি আয়না পড়ে আছে। সেটা উঠিয়ে দেখল, তো স্বীয় কদাকার আকৃতি নজরে পড়ল। কালো রং, মোটা মোটা ঠোঁট। ফলে সে আয়নাকে লক্ষ্য করে বলল, তুই দেখতে বিশ্রী বলেই তো কেউ তোকে রাস্তায় নিক্ষেপ করেছে।

তো দেখুন! এই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি নিজের কুশ্রী হওয়ার সম্বন্ধ করল আয়নার দিকে। এমনিভাবে লোকেরা নিজেদের দোষ চাপায় শরীয়তের উপর।

অথবা আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করি। জনৈকা মহিলা তার বাচ্চার পায়খানা পরিস্কার করছিল। ইতোমধ্যেই শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেল যে, চাঁদ দেখা

গেছে। এটা শোনামাত্রই ঐ মহিলা কোন রকমে বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নাকে আঙ্গুল রেখে চাঁদ দেখতে লাগল। আঙ্গুলে কিছু পায়খানা লেগেছিল। সেটার দুর্গন্ধ নাকে আসল। তখন মহিলা বলল : আজকের চাঁদে এমন দুর্গন্ধ কেন? তার নিজের আঙ্গুলের দুর্গন্ধ চাঁদের মধ্যে দেখতে পেয়েছে।

৬০. আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক কষ্ট হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মুরীদ হওয়া সহজ কাজ নয়। কেননা শাইখের শিক্ষার অনুসরণ বড় কঠিন বিষয়। নফস এসে নানা বাঁধা বিপত্তি সৃষ্টি করে। কেননা সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করতে হয়। মনের পছন্দনীয় অনেক কাজ কমিয়ে ফেলতে হয়।

যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো"। (সূরা হাশর : ১৮)

تَقْوٰى (ভয়) এবং قُوَّةٌ (শক্তি) উভয়টির মূলধাতু একই। তো সারকথা হচ্ছে এই যে, তাকওয়া পয়দা হওয়ার পর তোমাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি চলে আসবে। এরপর যেখানে মন চায় যাবে। এজন্যই হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : মুত্তাকী ব্যক্তি জঙ্গল ময়দান যেখানেই যাক তার কোন ভয় নেই। তবে হ্যাঁ মানবিক চাহিদার কারণে অথবা শারীরিক দুর্বলতার দরুন যদি কিছু ভয় হয়, তাহলে ঐ ভয় হল সাময়িক একটি ভয়। এমন ভয় তো আম্বিয়ায়ে কেরামেরও আ. হয়েছে। তাইতো হযরত মূসা আ. যখন স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাপ হয়ে গেল। তখন তিনি ভয় পেয়ে পিছে হটে গেলেন। অথচ তাঁর জানা ছিল যে, এটা আমারই লাঠি। এটা হল স্বভাবগত ভয়। যেটা তাকওয়ার পরিপন্থী নয়।

আসল ব্যাপার হল, যখন কারো তাকওয়া অর্জিত হয় এবং সে মহান আল্লাহর গুণাবলীর বিস্তারিত ইলম হাসিল করে, তখন তার মহান আল্লাহর মারিফাত নসীব হওয়ার কারণে বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয় আর বিশেষ নৈকট্য পেরেশানী কে চায়। نزدیکاں را بیش بود حیرانی অর্থাৎ কাছের মানুষের পেরেশানী বেশি হয়।

এর দ্বারা এটাও বুঝে আসল যে, কেউ যদি জানতে চায় মহান আল্লাহর নৈকট্য আমার কতটুকু হাসিল হয়েছে? তাহলে এটা দেখতে হবে যে, আমার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় কী পরিমাণ আছে? এটাকেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ

"আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তোমাদের থেকে আল্লাহ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০)

তাহলে নৈকট্যের পরিমাণ জানার জন্য এটা জানা জরূরী যে, আমার কতটুকু ইলম আছে এবং কী পরিমাণ মহান আল্লাহর ভয় আছে? উভয়টি থাকলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে হবে, অহংকার করা যাবে না।

এর পাশাপাশি ফারায়িয, ওয়াজিবাত, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, মুস্তাহাব্বাত, মানদূবাত, সবকিছু যথাযথভাবে আদায় করতে হবে এবং হারাম, মাকরূহ, মুশতাবিহ বা সন্দেহযুক্ত জিনিস এবং অনুত্তম কাজসমূহ সবকিছু বর্জন করতে হবে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের গুনাহই ত্যাগ করতে হবে। যেমনিভাবে ব্যভিচার হারাম, পরনিন্দাও হারাম। বরং ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য গুনাহ। যেমনিভাবে মদ্যপান পরিত্যাগ করতে হবে, মিথ্যা কথা বলাও ছাড়তে হবে।

ব্যস, সব সময় স্বীয় আমল ও চরিত্রের সমীক্ষা নিতে থাকবে। এর দ্বারাই সুলূক বা আল্লাহর পথে চলা সহজ হবে এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যও হাসিল হতে থাকবে। অনেক জিনিস জায়িয হলেও অনুত্তম। সুলূকের মধ্যে সেগুলোও বাদ দিতে হয়।

দেখুন থুথু পবিত্র। অথচ মসজিদে নববীতে যদি কেউ থুথু ফেলে তাহলে আপনার চেহারা গোস্বায় লাল হয়ে যায়। কারণ হল, তার সুলূক সীমার বাইরে গিয়েছিল। তাহলে সাহাবায়ে কেরামের জন্য এমন পবিত্র স্থানে এমন আচরণ কিভাবে সঠিক হতে পারে?

বাকি থাকল গ্রাম্য ব্যক্তির পেশাব করার উপর বাঁধা না দেয়া। এর দ্বারা যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। কেননা সেই বেদুইন বা গ্রাম্য ব্যক্তি তো সুলূকের

মধ্যে এইমাত্র প্রবেশ করেছিল। সে তো এখনো পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারেনি। অথচ সাহাবায়ে কিরাম তো সুলূকের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ইহসানের মাকামও তাঁরা অতিক্রম করেছেন। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, নতুনদের সাথে এক ধরণের আচরণ হয় আর পুরাতনদের সাথে আরেক ধরণের আচরণ হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ল। অতীতকালে কোন এক রাজার একজন দাস ছিল। যার দায়িত্ব ছিল রাজাকে পাহারা দেয়া। শাহী দরবার চলছিল। কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। রাজার দৃষ্টি যখন ঐ দাসের উপর পতিত হল তখন দেখা গেল যে, দাস রাজার প্রতি লক্ষ্য রাখছে না বরং অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। রাজা রাজকীয় মেজাজে ছিলেন। নির্দেশ দিলেন দাসের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার। ফলশ্রুতিতে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হল। অথচ অত্যন্ত চৌকস দাস ছিল।

একবার উজির রাজার মেজাজ বুঝে আরয করলেন যে, হুযূর! বেআদবী ক্ষমা করবেন। ঐ দাসটি তো অত্যন্ত যোগ্য সুদর্শন ও চৌকস ছিল। তাকে হত্যা করলেন? প্রতি উত্তরে রাজা বললেন, তার থেকে আস্থা উঠে গিয়েছিল। সে আর পৃথিবীতে থাকার যোগ্য ছিল না। সে তো ছিল আমার প্রহরী। তখন দরবার চলছিল। তাই তার জন্য উচিত ছিল পূর্ণ সতর্কতার সাথে আমার দিকে লক্ষ্য রাখা। ঐ সময় যদি আমার কোন দুর্ঘটনা হত, তাহলে কী অবস্থা হত?

যেহেতু সেই দাসটি তার দাসত্বের দায়িত্ব আদায় করেনি, তাই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরাও আল্লাহ পাকের দাস। যখন তোমরা নামায পড়ো, সেজদার সময় মাথা জমিনে রাখো অথচ অন্তর কোথায় কোথায় ঘুরছে? তাহলে তো তোমরাও দাসত্ব থেকে বের হয়ে গেলে। তোমাদের কে তো ঐ সময়ই ধ্বংস করে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়ালু, নিজ দয়ার কারণে তিনি এমনটি করবেন না। অবশ্য বাতেনী ধ্বংস হতে থাকে। সেটা হল নামায থেকে দিল উঠে যায়। এবং নামাযের দ্বারা দিলে যে শক্তি আসার কথা ছিল যে, মাখলূকের ভয় অন্তর থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যাবে সেটা হয় না।

তো কথা হচ্ছিল এটাই যে, যে ব্যক্তির মহান আল্লাহর নৈকট্য নসীব হয়, সে খুব দেখে শুনে কদম ফেলে। যেখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করে না, শরীয়ত অনুযায়ী পদযুগলকে পরিচালনা করে। তাহলে এই ব্যক্তি গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে। এটাকেই বলা হয়েছে :

أَلْاَنْبِيَاءُ مَعْصُوْمُوْنَ وَالْأَوْلِيَاءُ مَحْفُوْظُوْنَ

অর্থাৎ, "নবীগণ নিষ্পাপ ও ওলীগণ সংরক্ষিত"।

ফলে তার মন মানসিকতাই এমন হয়ে যাবে যে, আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করতে ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করতে তার আর চিন্তা করতে হবে না। বরং চিন্তা ভাবনা ছাড়াই সুন্নাতের উপর আমল হতে থাকবে। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় তার আর চিন্তা করতে হবে না যে, এখন কি আমি ডান পা বের করব নাকি বাম পা বরং বাম পাই বাইরে বের হবে। আর যখন নামায পড়ে বাইরে বের হবে তখন যিকিরে লেগে থাকবে। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

অর্থাৎ, "যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) অনুসন্ধান করো এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো"। (সূরা জুমুআহ : ১০)

যখন যিকিরে লেগে থাকবে, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও এটার খেয়ালই করবে যে, কিভাবে কিনব বা বেচব? অথচ যারা মাপে কমবেশ করে তাদের শাস্তি অনিবার্য।

তো যেমনিভাবে আমাদেরকে নামাযের ব্যাপারে সম্বোধন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বেশি বেশি যিকির করতেও বলা হয়েছে। কেননা, শাখা-প্রশাখাগত ব্যাপারে মুসলমানদের কেই সম্বোধন করা হয়েছে। কাফেরগণ শাখাগত বিধি-বিধানের ব্যাপারে আদিষ্ট নয়।

তো মুসলমানদের কে শুধুমাত্র নামায রোযার নির্দেশই দেয়া হয়নি বরং এর পাশাপাশি ঐসব জিনিসের ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি সে এসব বিষয়ে আমল না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার হয়ত ইলমই নেই। অথবা ইলম আছে কিন্তু বিশ্বাস নেই।

যদি ইলম বা জ্ঞান না থাকে তাহলে এটাও অপরাধ। কেননা নিয়ম না জানা অন্যায়। আর যদি ইলম থাকে কিন্তু আমল না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার নিজ ইলমের উপর ইয়াকীন বা বিশ্বাস নেই। যদি তার বিশ্বাস থাকত, তবে অবশ্যই আমল করত।

সারকথা এটাই যে, যদি অন্তরে তাকওয়া থাকে, তাহলে শরীয়ত তবিয়ত বনে যায়। এরপর আর চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। নফস দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়া থেকে বের হয়ে যায়।

৬১. "ঘুমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নেই" কথাটার মর্ম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কিছু কিছু তালিবে ইলম আছে, ঘুমিয়ে পড়লে নামায ছুটে যায়। তাদেরকে সতর্ক করা হলে বলে لَا تَفْرِيْطَ فِي النَّوْمِ "ঘুমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নেই" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮১)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ তালিবে ইলমরা হাদীসের প্রকৃত মর্ম বুঝেনি। হাদীস বুঝতে হলে 'শানে উরূদ' তথা ঐ সময়ের প্রেক্ষাপট জানতে হয়। হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি.কে সঙ্গে নিয়ে সফরে ছিলেন। রাতভর সফর করেছেন। শেষ রাতে আরাম করার জন্য নামলেন। আর হযরত বেলাল রাযি.কে ফজরের নামাযের সময় জাগানোর যিম্মাদার বানালেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন।

হযরত বেলাল রাযি. উদয়স্থলের দিকে মুখ করে উটের হাওদার সাথে টেক লাগিয়ে বসে গেছেন যে, যখন সুবহে সাদিকের আলো ফুটবে, তখন সাহাবায়ে কেরামকে জাগিয়ে দিব। কিন্তু তাঁরও চোখ লেগে গেল। এমনকি সূর্য উদিত হয়ে গেল।

সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘুম ভাঙ্গল। তিনি অবস্থা দেখে আওয়াজ দিলেন : "হে বেলাল! হে বেলাল!" হযরত বেলাল রাযি. জাগ্রত হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জিনিস আপনাকে ধরেছে ঐ জিনিস আমাকেও ধরেছে। অর্থাৎ 'নিদ্রা'।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছেন যে, আমাদের ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁদের পেরেশানী ও অস্থিরতা দূর করার জন্য বললেন, لَا تَفْرِيْطَ فِي النَّوْمِ তথা "ঘুমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নেই"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮১) যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম রাযি. বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তাই তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে। কেননা যিনি কাজের ইহতিমাম করেন ও পরিশ্রম করেন, তার সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে যে স্বাধীন ও দায়িত্বহীন হয় তাকে সান্ত্বনা দেয়া হয় না।

তো ঐ ছাত্ররাও কি এভাবে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী বা উদ্যমী ছিল? আর তাদেরও কি নামায ছুটে গেলে এমন পেরেশানী হয়? বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীস যে, "আমার উভয় চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৭) এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ কেন খুলল না?

তাহলে তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও কাজের মধ্যে বাহ্যিকভাবে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। উত্তর হচ্ছে এই যে, আমলের মাধ্যমে শরীয়ত পূর্ণ করার প্রয়োজন ছিল যে, নামায কাযা হয়ে গেলে কিভাবে আদায় করতে হয়? কাযার উপর দুঃখ হলে কিভাবে সেটা দূর করা হবে? ইত্যাদি।

বাস্তব কথা হল, তাঁরা ঘুমাননি বরং তাঁদেরকে তাকবীনীভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে করে এ জাতীয় পরিস্থিতিতে শরীয়তের কর্মনীতি নির্ধারণ করা যায়।

৬২. আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে অশ্রু পড়ার মূল্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মুমিন ব্যক্তির চোখ থেকে মহান আল্লাহর ভয়ে যে অশ্রু ঝরে সেটা হীরা মোতি পান্না থেকেও অনেক মূল্যবান।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَدْخُلُ النَّارَ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"যে চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে এক ফোটা পানি বের হবে, ঐ চোখ জাহান্নামে যাবে না"। (মুসনাদে আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী, হাদীস নং ২৫৬৫)

৬৩. নবীর পদতলে ওলীর দীক্ষা, কথাটার মর্ম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এই যে একটা কথা বলা হয়, প্রত্যেক ওলী কোন-না কোন নবীর পদতলে দীক্ষাপ্রাপ্ত। এর প্রকৃত মর্ম হল: প্রত্যেক ওলী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধীনে দীক্ষালাভ করেন। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সমস্ত নবীর শান বিদ্যমান। তাঁর মধ্যে হযরত ঈসা আ. এর শানও আছে, শানে ইবরাহীমীও আ. আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই শানকেই কদমে মূসা ও কদমে ঈসা ইত্যাদি শব্দে ব্যক্ত করা হয়, খুব বুঝে নিন।

৬৪. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা উচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : থানাভবন খানকায় অবস্থিত মাদরাসার অদ্ভুত তাওয়াক্কুলনির্ভর পন্থা ছিল, কখনো সেখানে "হেদায়া" পর্যন্ত পড়ানো হত। কখনো আরো কম হত। সেখানের মুদাররিসদের বলে দেয়া হত যে, আমদানী হলে ভাতা দিয়ে দেয়া হবে। নতুবা অপারগতা প্রকাশ করে দেয়া হবে। যদি তাওয়াক্কুলের যিন্দেগী যাপন করতে পারেন তাহলেই এখানে থাকবেন। যখন টাকা আসবে তখন সব টাকা আপনাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।

কত সুন্দর পেরেশানীমুক্ত স্বাধীন জীবন। পক্ষান্তরে আমরা একটি বিশেষ নেসাব নির্ধারণ করে নিয়েছি। ঐ পর্যন্ত তালীম জরূরী। এখন চাঁদা করে বেড়ায়। আর ধনী মানুষদের তোষামোদ ও খোশামোদ করে। অযোগ্য ছাত্রদের ছাড় দেওয়া হয়। থানাভবনে এইসব জিনিস থেকে সতর্ক থাকা হত।

৬৫. যাঁরা খাদেমে ইলম, তাঁদের ব্যবসায় জড়ানো অনুচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এই যুগে বিশেষত আলেমদের জন্য ব্যবসা ও দোকানদারী করা সমীচীন নয়। কেননা এতে শিক্ষা-দীক্ষার কাজ ভালভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে না। কেননা, যেটা ব্যবসার সময় সেটা তালীম তারবিয়্যাতেরও সময়। তো একই সময়ে দুই কাজ হয় কিভাবে?

ইমাম আবু হানীফার উপর তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা, প্রথমত ব্যবসা ইমাম ছাহেবের পৈত্রিক পেশা ছিল। দ্বিতীয়ত দোকানে ম্যানেজার রাখা ছিল। ইমাম ছাহেব দিন শেষে সামান্য হিসাব কিতাব দেখতেন। তৃতীয়ত সম্পদ জমা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বা এটাও উদ্দেশ্য ছিল না যে, নিজ পরিবারের সদস্যদের কে খুব শান-শওকতের সাথে রাখবেন, বিবাহ শাদীতে খুব খরচ করবেন। নিজে ভাল কাপড় পরিধান করবেন আর পরিবারের সদস্যদেরকেও ভাল কাপড় পরিধান করাবেন।

তো সম্পদ জমা করা, বিলাসিতা ইত্যাদি তাদের মাকসাদ ছিল না। বরং উলামায়ে কিরামের খেদমত এবং গরীব মানুষের সেবা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। জিহাদে খরচ করা উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ইমামে আযম ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে নিজেদের তুলনা করা অনুচিত।

৬৬. গুনাহের উপলক্ষও গুনাহ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাকওয়ার অবস্থা ছিল এই যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যিনি অত্যন্ত অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন, যখন ইলম শেখার উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট আসেন, তখন আবু হানীফা রহ. বলেন, তোমার যেহেতু এখনো দাড়ি উঠেনি, তাই তুমি ক্লাসে আমার পিছনে বসবে। বুঝা গেল যে, সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা চাই।

এজন্যই ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেওনা"। (সূরাতুল ইসরা, আয়াত নং ৩২)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

"তোমরা দুজন (হযরত আদম ও হাওয়া) এই বৃক্ষের নিকটে যেওনা"। (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ৩৫)

উদ্দেশ্য হল, ব্যভিচারের যেসব উপলক্ষ আছে তথা দেখা, ছোঁয়া, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি এগুলোও করবে না। এমনিভাবে হযরত আদম ও

হযরত হাওয়া কে বলা হয়েছে যে, ঐ গাছের কাছেও যাবে না। তো আসলে কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল না। নিষেধ ছিল ফল খাওয়া। কিন্তু কাছে যাওয়া হল খাওয়ার বাহ্যিক উপলক্ষ। এজন্য এটা থেকেও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

দেখুন, যখন মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন মদের পাশাপাশি ঐসব পাত্র যেগুলোতে মদ রাখা হয়েছিল এবং মদ বানানো হত সেগুলোর ব্যবহারও নিষেধ করে দেয়া হল। কারণ ছিল এটাই যে, যেহেতু তারা মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের বাসায় সব সময় মদ থাকত, ফলে এ আশংকা ছিল যে, ঐসব পাত্র দেখে তাদের পুরনো নেশা জেগে উঠবে এবং আবারো মদপানে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এজন্য ঐ পাত্র ব্যবহারও নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। এবং যেসব মটকায় মদ রাখা ছিল, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এর দ্বারাই এ মূলনীতি বের হয়ে আসল যে, যে জিনিস গুনাহের উপলক্ষ হয় সেটাও নিষেধ।

৬৭. তালিবানে ইলমে নবুওয়াতের নিয়্যত কী হওয়া চাই?

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হে তালাবারা! এমনভাবে ইলম শিখ যেভাবে ইমাম গাযালী রহ. ইলম শিখেছেন। ঘটনা হচ্ছে এই যে, বাদশাহ নিযামুল মুলক তূসী রহ. বাগদাদে (ইরাকের রাজধানী) নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একবার তিনি মাদরাসা পরিদর্শনের জন্য গোপনে রাত্রে সেখানে গেলেন। দেখলেন যে, ছাত্ররা কিতাব দেখায় ব্যস্ত। একজন তালিবে ইলম কে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কিজন্য পড়ালেখা করছ? সে বলল, আমার আব্বা ক্বাযী ছাহেব। তাই আমি এজন্য পড়াশোনা করছি যাতে তাঁর পরে আমি কাযী হতে পারি। আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন : সে বলল যে, আমার আব্বা উযীর। আমার ইচ্ছা হল তাঁর পরে আমি উযীর হব। এভাবে তিনি ছাত্রদের মধ্যে ঘুরতে থাকলেন। ছাত্ররা দুনিয়াবী বিভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা বলতে থাকল।

নিযামুল মুলকের খুব অনুশোচনা হল যে, এরা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করছে। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মাদরাসা বন্ধ করে

দিবেন। সামনে অগ্রসর হওয়ার পর একজন তালিবে ইলমকে দেখলেন যে, চেরাগ জ্বলছে আর সে কিতাব অধ্যয়নে বিভোর। তাঁর নিযামুল মুলকের আগমনের খবরও হয়নি। বাদশাহ তাঁকে গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন দেখে খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ছেলে!" সেই তালিবে ইলম চমকে উঠলেন এবং বাদশার দিকে তাকালেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে তুমি কী পড়ছ? তালিবে ইলম কিতাবের নাম বললেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে পড়ালেখা করছ? তালিবে ইলম উত্তরে বললেন : "আমি বিবেক দ্বারা বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের একজন খালিক ও মালিক আছে। আর এটাও বিবেকেরই কথা যে, মালিকের কিছু বিধি-বিধান থাকে। যেগুলোর উপর আমল করা জরূরী। এদিকে ইলম ব্যতীত আমল সম্ভব নয়। এজন্য পড়ালেখা করছি। যাতে করে ঐ সব বিধি-বিধান জেনে তদনুযায়ী আমল করতে পারি"।

বাদশাহ খুব খুশী হলেন। সকালে দরবারে এসে বললেন : আমি অদ্য রাতে নিযামিয়া মাদরাসায় গিয়েছিলাম। ছাত্ররা সবাই পেটের জন্য পড়ালেখা করছে। আমি ইচ্ছা করেছিলাম মাদরাসা বন্ধ করে দিব। কিন্তু একজন মাত্র তালিবে ইলম পেলাম যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম শিখছে। এজন্য আমি মাদরাসা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আপনারা কি জানেন ঐ তালিবে ইলম কে ছিলেন? ঐ তালিবে ইলমই হলেন ইমাম গাযালী রহ.।

এ ঘটনার আলোকে বুঝা গেল যে, কওমী মাদরাসাগুলোর ব্যাপারে এই আপত্তি যে, এরা সব বেকার। অযথাই এদের কে ভর্তি করা হয় ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা এই তালিবে ইলমদের মধ্যেই দু'একজন এমনও থাকবে যারা ইমাম গাযালী রহ. এর মত হবে।

আপনারা আমার কথা মনোযোগের সাথে শুনুন। যা আমি আমার মুরব্বীদের মুখে শুনেছি যে, এমন ছাত্রদের কেও ভর্তি করে নাও। সে পড়ালেখা না করলে নিজেই নিজের ক্ষতি করছে। আমাদের তো ফায়েদা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা মাদরাসার সংখ্যা বাড়ছে। মাদরাসার প্রসিদ্ধি হচ্ছে।

আমি আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলি, ঐ ছাত্রেরও ফায়েদা হবে। কেননা যেহেতু সবকে বসে, সেখানে বসে নেককার শিক্ষকদের মুখনিঃসৃত

মূল্যবান বাণী শুনছে। কিছু না কিছু দ্বীনী কথা তার কানে অবশ্যই পড়বে। এরপর যখন সনদ নিয়ে যাবে, তখন তার সনদ তাকে প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। সিনেমা ইত্যাদি অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। আর গেলেও লুকিয়ে লুকিয়ে যাবে। চেহারা-মুখ ঢেকে যাবে। লুকিয়ে বসবে। এরপর কারো কাছে এসে আর এসব কথা বলবে না। উৎসাহ দিবে না। অথচ তারই আপন ভাই যে মাদরাসায় পড়ে না সে দাড়িও মুন্ডন করবে। প্রকাশ্যে সিনেমাও দেখতে যাবে। আর বন্ধুদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলবে যে, আজ তো দারুণ সুন্দর একটা শো ছিল। কালকে তোমরাও যেও। তোমাদের কাছে পয়সা না থাকলে আমিই দিব।

মানে সে নিজেও গুনাহ করল। আর অন্যকে দিয়েও গুনাহ করাল। পক্ষান্তরে ঐ তালিবে ইলম সেও সিনেমা দেখেছে। কিন্তু লুকিয়ে, লজ্জিত হয়ে। আর তার ভাই দেখেছে প্রকাশ্যে, অন্যকেও লিপ্ত করিয়েছে। লুকিয়ে গুনাহ করা অনেক হালকা জিনিস। আর প্রকাশ্যে গুনাহ করা অনেক ভারী জিনিস। এজন্য তালিবে ইলম ও গাইরে তালিবে ইলমের সিনেমা দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। লোকেরা বলে, এই সব তালিবে ইলমদের চেয়ে মূর্খ মানুষও ভাল।

এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। খুব বুঝে নিন। তবে হ্যাঁ, তালিবে ইলমদের মধ্যে দুটি জিনিস যেন না থাকে। ১. তারা যেন ষড়যন্ত্রমূলক কোন কাজ না করে, যার মধ্যে ধর্মঘট ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। ২. তার মন মানসিকতায় যেন লোভ না থাকে। একটি বর্ণনায় এসেছে–

اَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الدِّيْنِ مَا لَمْ يُخَالِطِ الْأُمَرَاءَ فَإِذَا هُمْ خَالَطُوْهُمْ فَهُمْ لُصُوْصُ الدِّيْنِ

"উলামায়ে কেরাম দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, যতক্ষণ পর্যন্ত আমীর বা বড়লোক শ্রেণীর মানুষের সাথে উঠাবসা না করবে, এরপরও যদি তারা আমীর শ্রেণীর লোকদের সাথে মেলামেশা করে, তবে এরাই দ্বীনের চোর"। (জামিউ বয়ানিল ইলম ১: ৩৪৩; হিলয়াতুল আউলিয়া ৩:১৯৪)

এ প্রসঙ্গেই আমার শাইখ হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর কথা মনে পড়ল। হযরত বলেন, জনৈক যুবরাজ রাত্রিবেলা ভ্রমণে বের হল, তার সঙ্গে একটি দামী মুক্তা ছিল। ঘটনাক্রমে ঐ মুক্তাটি নুড়িপাথরের মধ্যে পড়ে গেল। অনেক অনুসন্ধানের পরও পাওয়া গেল না। যুবরাজ নির্দেশ দিলেন

যেখানে মুক্তা পড়ে গেছে, সেখানের সমস্ত নুড়িপাথর কুড়িয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসা হোক। ফলে নির্দেশ পালন করা হল। সমস্ত নুড়িপাথর নিয়ে আসা হল। সকালবেলা যখন ঐ মুক্তা অনুসন্ধান করা হল, তখন ঐ পাথরকণার মধ্যেই মুক্তাটি পাওয়া গেল।

এমনিভাবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষও পাথর কংকর জমা করে আছেন। এদের মধ্যেই কোন হীরা-মোতি থাকবে। যে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য দ্বারা জাগতকে চমকে দিবে অর্থাৎ পুরো জগতের সংশোধনের মাধ্যম হবে।

৬৮. ভাল এবং পাতলা কাপড় পরিধানের বিধান

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মিশকাত শরীফের এক হাদীসে এসেছে, জনৈক সাহাবী একটি ভাল ও পাতলা কাপড় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসেবে দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা কবূল করে তাঁকেই ফিরিয়ে দেন এবং বলেন যে, অর্ধেক ব্যবহার করবে তুমি। আর বাকি অর্ধেক দিবে তোমার স্ত্রীকে। যখন ঐ সাহাবী ফিরে যেতে উদ্যত হলেন তখন বললেন যে, তোমার স্ত্রীকে বলবে যেন সে এ কাপড়ের নিচে অন্য কাপড়ও পরিধান করে যাতে করে তার শরীর দেখা না যায়।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পাতলা কাপড় পরিধান করা সুন্নাত পরিপন্থী নয়। তবে মহিলাগণ পাতলা কাপড়ের নিচে কোন মোটা কাপড়ও পরিধান করবে। যাতে করে শরীর দৃশ্যমান না হয়।

৬৯. ঈমান ও যিকির আহার স্বল্পতার উপলক্ষ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اَلْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

অর্থাৎ "ঈমানদার ব্যক্তি এক আঁতুড়িতে খায় পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তি সাত আঁতুড়িতে খায়।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৬১)

তো এর কারণ হল ঈমানদার ব্যক্তির খোরাকী হল কালিমায়ে তায়্যিবাহ। স্বয়ং ঈমানও মুমিনের খাদ্য এবং ঈমানের অংশসমূহও।

যেহেতু আমাদের মাটির শরীর। এর টিকে থাকার জন্য অল্প খাদ্য যা এক আঁতুড়িতে এসে যায় যথেষ্ট। আর এটা ঐ মুমিন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে এখনো পর্যন্ত কোন আমল করেনি। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটা জনৈক নওমুসলিম ব্যক্তির ঈমান আনার সময় বলেছিলেন। যেহেতু ঈমান আনার পূর্বে তিনি পানাহার বেশি করেছেন। ঈমান আনার পর তাঁর খাদ্য কমে গিয়েছিল।

এমনিভাবে যখন আমল বেড়ে যায় আর ঈমানের মধ্যে সার্বক্ষণিক তাকওয়া ও যিকিরের আধিক্যের দরূন শক্তি আসতে থাকে, তখন খাওয়া কমতে থাকে।

এ কারণেই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের শারীরিক খাদ্য কম হয়। যিকির ও তাকওয়াই হল তাঁদের খাদ্য। খুব ভালভাবে বুঝে নিন।

৭০. কাশফ ও ইলহাম অর্থহীন জিনিস

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ইলহাম ও কাশফ কোন বিশেষ কিছু নয়। কাশফ তো জীব-জন্তুরও হয়। দেখুন, মৌমাছির অন্তরে এ কথা কে ঢেলে দিয়েছেন যে, ভালগাছ থেকে মধু চুষতে হবে। আর এভাবে টপকাতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَ اَوۡحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِیۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعۡرِشُوۡنَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ کُلِیۡ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُکِیۡ سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا ؕ یَخۡرُجُ مِنۡۢ بُطُوۡنِہَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُہٗ فِیۡہِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۶۹﴾

"আপনার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এই নির্দেশ সঞ্চার করেন যে, পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে নিজ ঘর তৈরি কর। তারপর সব রকম ফল থেকে নিজেদের খাদ্য আহরণ কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেই পথে চল"।

(সূরা নাহল, আয়াত নং ৬৮-৬৯)

অতএব, দেখুন মৌমাছির প্রতি ইলহাম হওয়া স্বয়ং কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

দুগ্ধপোষ্য শিশুরও ইলহাম হয়। এটা তো ইলহামই যে, শিশু নাক চুষে না বরং স্তন চুষে। সুতরাং ইলহাম আহামরি কিছুই নয়, আসল জিনিস হল সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ।

হযরত হাসান বসরী রহ. এর ঘটনা। একবার তিনি পানির উপর জায়নামায বিছিয়ে নামায আদায় করছিলেন। এদিকে তাঁর মহিলা শিষ্য হযরত রাবেয়া বসরী রাহ. বেরিয়ে আসলেন। তিনি বাতাসে জায়নামায বিছিয়ে নামায আরম্ভ করে দিলেন। তখন হযরত হাসান বসরী রাহ. বললেন, রাবেয়া! আমি তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম না। হযরত রাবেয়া রাহ. আরয করেন, আপনি যেটা করে দেখালেন সেটা তো একটা মাছ করে দেখায়। আর আমি যেটা করে দেখালাম সেটা একটি মাছি করে দেখায়।

দেখুন তিনি স্বীয় উসতায হযরত হাসান বসরী রাহ. থেকে নিজেকে নিচে রেখে মাছির উপমা দিয়েছেন।

এই হল আদব ও সম্মান।

বুঝা গেল যে, মাছ বা মাছি যে কাজ করতে পারে সেটা করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। প্রকৃত কৃতিত্ব হল সুন্নাহ থেকে এক কদমও বিচ্যুত না হওয়া।

৭১. জোশ কোন কৃতিত্ব নয় বরং হুঁশ ও বুদ্ধিমত্তাই হল কৃতিত্বের ব্যাপার

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন যে, কোন কাজে অতিমাত্রায় জোশ থাকা ভাল নয়। এটা কোন কৃতিত্ব নয়। আবার যদি বলা হয় যে এটা দোষ তাহলে সেটাও সমস্যা। কেননা জোশের মধ্যে অস্থিরতা থাকে। আর যখন সেটা থাকে না তখনও কষ্ট হয়। যদি জোশ প্রশংসনীয় কোন ব্যাপারই হত তবে আল্লাহ তা'আলার মধ্যে হত। যখন আল্লাহর মধ্যে নাই তো বুঝা গেল যে, এটা কোন কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। অবশ্য ঘটনাক্রমে হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

কামেলদের মধ্যে সাধারণত জোশ থাকে না। কিন্তু অনেক সময় তাঁদেরও জোশ চলে আসে। আবার ফেরেশতাদের মধ্যেও অনেক সময়

জোশের প্রাবল্য হয়। যখন ফিরআউনকে ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল এবং সে ডুবতে লাগল তখন বলতে লাগল :

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ

"আমি ঈমান আনলাম ঐ মাবূদের উপর যাঁর উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই"। (সূরা ইউনুস : ৯০)

ঐ সময় হযরত জিব্রীল আ. সমুদ্রের কর্দমাক্ত মাটি তার মুখে ঠাসানো আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈমান তো হল অন্তরের বিশ্বাসের নাম। মাটি দ্বারা যবান বন্ধ করার দ্বারা কী লাভ হল? উত্তর হল : এটা হযরত জিব্রীল আ. এর জোশের দরূন হালতের প্রাবল্য হয়েছে। যে ব্যাপারে তিনি অপারগ ছিলেন।

তাহলে দেখুন! হালতের প্রাবল্য ফেরেশতাদেরও হয়। আর মহান আল্লাহ জোশ ও প্রাবল্য জাতীয় অবস্থা থেকে পবিত্র।

এর দ্বারা আহলে বিদআতের একটি কথারও খন্ডন হয়ে গেল। তারা বলে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া ছিল না। প্রমাণ হিসেবে তারা বলে যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ থেকে ফিরছিলেন তখন নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা নাকি বলেছেন, হে আমার মাহবূব! আপনি তো চলে যাচ্ছেন, তাহলে আমার সান্ত্বনা ও প্রশান্তি কিভাবে হবে? এজন্য আমার শান্তির জন্য আপনার ছায়া রেখে যান!!

এটা একটা গাঁজাখোরী ও কুফরী কথা। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় তাআসসুরাত ও কাইফিয়াত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

তো কথা চলছিল জোশ ও হাল নিয়ে। অবশ্য হাল কোন কোন সময় প্রশংসনীয় হয়। যদিও কাংখিত নয়। কেননা আগামীতে এ অবস্থা থেকে উন্নতির আশা থাকে। ব্যাপারটির উদাহরণ এমনই যেমন এক ব্যক্তি বালিশ উঠাতে উদ্যত হল, জোশের কারণে একটির পরিবর্তে দুটি উঠিয়ে ফেলল! এখন সে চিন্তা করছে যে, দ্বিতীয়টা কোথায় রাখব? যেখান থেকে বালিশ উঠিয়েছিল সেখানে না রেখে অন্য স্থানে রেখে দিল। এটা কোন হুঁশের কথা

নয় বরং জোশের কথা। আসলে হুঁশ অনেক বড় নেয়ামত। যার হুঁশ থাকে সে বিগড়ানো কাজকেও সামলে নিতে পারে।

এ প্রসঙ্গেই একটি ঘটনা মনে পড়ল। একবার একটি রাজকীয় হাতি বিগড়ে গেল। শাহী আস্তাবল থেকে বের হয়ে লোক বসতিতে চলে আসল। লোকেরা এদিক সেদিক ছুটোছুটি আরম্ভ করল।

একটি বাচ্চা এ দৃশ্য দেখে একটি কুকুরছানা উঠিয়ে হাতির শূঁড় বরাবর নিক্ষেপ করল। কুকুর ছানার চিৎকারে হাতি ঘাবড়ে গেল এবং ফিরে চলে গেল। এটা তো হুঁশের কথাই ছিল।

কোন কাজে ঝামেলা সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ ছেড়ে দিবে। মনকে অন্য কোন দিকে নিবদ্ধ করবে। চাই যিকির হোক বা কুরআন তিলাওয়াত বা কোন কিতাব অধ্যয়নে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে।

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীন লায়লা মজনুর কিচ্ছা দ্বারাও সুন্দর উপদেশ গ্রহণ করেছেন। মাওলানা রূমী রহ. আল্লাহ পাকের মহব্বতের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন :

عشق مولی کئے کم از لیلیٰ بود
گوئے گشتن بہراو اولی بود

মাওলার ইশক লাইলার ইশকের থেকে কিভাবে কম হতে পারে? এর জন্য ফুটবল হয়ে যাওয়াই বেশি উপযুক্ত।

এতে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একদিন মজনু লায়লার সাথে সাক্ষাত করার জন্য উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে যাচ্ছিল। উটনীর বাচ্চা ছিল। বাচ্চা কিছুটা দূরে চলে গেলে উটনী তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যেত।

কয়েকবার এ ঘটনা ঘটল। তখন মজনু বলল যে, তোমার মাহবূব হল পিছে আর আমার মাহবূব হল সামনে। তোমার সাথে আমার বনবে না। ব্যস এক বিশেষ অবস্থা চলে আসল। ফলে সে চলন্ত উটনী থেকে লাফিয়ে পড়ল। যদ্দরূন তার পায়ের নলার হাড্ডি ভেঙ্গে গেল। ফলে সে মাটিতে শুয়ে ফুটবলের মত ঘুরে ঘুরে চলা শুরু করে দিল।

এটাকেই মাওলানা রূমী রহ. বলেছেন : گوئے گشتن بہراو اولی بود তথা এর জন্য ফুটবল হয়ে যাওয়াই বেশি ভাল।

মাওলানা রূমী রহ. লায়লা মজনুর ঘটনা দ্বারা ভাল ফলাফল বের করেছেন। তো ঘাবড়ে যাওয়ার সময় মুবাহ ঘটনাসমূহ দ্বারা যদি উপদেশ গ্রহণ করা হয় তাহলে কী সমস্যা?

মোটকথা, হুঁশ অনেক বড় দৌলত। হুঁশওয়ালা ব্যক্তি তিনিই যিনি সময়ের মূল্যায়ন করেন। মহান আল্লাহ সময়ের শপথ করে বলেছেন :

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ চরম ক্ষতির মধ্যে আছে"।

(সূরা আসর : ১-২)

আল্লাহ তা'আলা শপথ করে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, সময় অত্যন্ত দামী বস্তু। তাই অতি অবশ্যই এর মূল্যায়ন করা উচিত। মোটকথা, হুঁশ-বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকা অনেক বড় দৌলত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযি. কে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, হে উমর! ঐ সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন তুমি কবরে থাকবে। আর ফেরেশতারা অত্যন্ত ভয়ংকর আকৃতিতে ঐ নির্জনতায় তোমার কাছে আসবে। আর আসা মাত্রই তিনটা প্রশ্ন করবে।

১. مَن رَّبُّكَ؟ বা তোমার প্রভু কে?

২. مَا دِيْنُكَ؟ বা তোমার ধর্ম কী?

৩. مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ؟ বা এই লোকটি কে?

হযরত উমর রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু বলুন তো ঐ সময় আমাদের হুঁশ বুদ্ধি ঠিক থাকবে তো? উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মুমিন ব্যক্তির হুঁশবুদ্ধি তো আরো বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। হযরত উমর রাযি. বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কোন পরওয়া নেই"।

তাহলে দেখুন আখেরাতে কোন্ জিনিস কাজে আসল? হুঁশ। দুনিয়ার জন্য কোন্ জিনিস কাজে আসল? সেটাও হুঁশ।

এমনিভাবে তালিবে ইলম ও সালিকীন এর জন্য কোন্ জিনিস অধিক উপকারী? হুঁশই কাজে আসবে।

অতএব, যখন হুঁশ এমন দামী ও অদ্বিতীয় জিনিস, তখন প্রত্যেক ঐ জিনিস থেকে দূরে পালাতে হবে যা মানুষের হুঁশ-বুদ্ধিকে খতম করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ : আফিম, গাঁজা বা নেশাজাতীয় অন্য কোন দ্রব্য খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনিভাবে দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা, বেশি সম্পদের ভালোবাসা, স্ত্রী-সন্তানের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভালোবাসা, কোন সুশ্রী বালক বা বেগানা নারীর ভালোবাসা ইত্যাদি। এসব হুঁশকে নষ্টকারী জিনিস, কাজেই এসব বর্জন করতে হবে।

এমনিভাবে কোন মুবাহ বা বৈধ জিনিস কিন্তু সেটা কে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, আমাদের হুঁশ ঠিক থাকে না, প্রথম দিন থেকেই এসব বস্তু বর্জন করতে হবে। মোটকথা, প্রত্যেক ঐ জিনিস যার দ্বারা নেশার অবস্থা সৃষ্টি হয় সেটা থেকে বাঁচতে হবে। সম্পদ একটা নেশা। যখন এর ভূত মাথায় চড়ে তখন খুব মুশকিল হয়ে যায়। পূর্বে একথা প্রসিদ্ধ ছিল, যার কাছে একশত টাকা আছে, তার মধ্যে এক বোতল নেশাও আছে।

পদের মোহ। এটাও একটা নেশা। এটা থেকেও বাঁচতে হবে। দেখুন এমপি বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য কত টাকা-পয়সা খরচ করা হয়। কিন্তু কেন? ঐ পদের নেশা। মনে করুন কারো কাছে সম্পদ নাই কিন্তু সে মন্ত্রী হয়ে গেল, তাহলে সে নিজেকে লাখপতি বা কোটিপতির থেকেও সৌভাগ্যবান মনে করে।

বুঝা গেল, পদমর্যাদার নেশা সম্পদের নেশার চেয়েও মারাত্মক। তাজ্জবের ব্যাপার হল এই যে, মদ্যপান কে খারাপ মনে করা হয়। এর উপর লা হাওলা---ও পড়া হয়। অথচ নিজে পদমর্যাদার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। লজ্জাও পায় না। মদপানকারী ব্যক্তি তো নিজেকে খারাপ মনে করে। কিন্তু পদের নেশায় বিভোর ব্যক্তি নিজেকে খারাপ মনে করে না।

মোটকথা যেমনিভাবে মদের নেশা নিন্দনীয়, ঐসব জিনিসের নেশাও নিন্দনীয়। কারো সম্পদ ও পদমর্যাদা লাভ হলে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। সীমার বাইরে যাওয়া অনুচিত। কারণ এসব হল ক্ষণস্থায়ী বস্তু।

বাবা ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ রহ. বলেন, আমি ছয়শত আউলিয়ায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাত করেছি। আর তাঁদের সকলের কাছে ৪টা প্রশ্ন করেছি। সবাই একই উত্তর দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন হলঃ বুদ্ধিমান কে? সবাই উত্তর দিয়েছেন : বুদ্ধিমান হল ঐ ব্যক্তি যে নিজ মনিবকে চিনে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল : হুঁশিয়ার কে? ছয়শত ওলী উত্তর দিয়েছেন, হুঁশিয়ার ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে কোন অবস্থাতেই পেরেশান হয় না। মনের মধ্যে সাহস ও হিম্মত রাখতে হবে। সামান্য কিছুতেই উত্তেজিত হওয়া এটা সুস্থ রুচির পরিচায়ক নয়।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিলঃ মালদার বা সম্পদশালী কোন্ ব্যক্তি? ছয়শত বুযুর্গ উত্তর দিয়েছেন, যার মধ্যে অল্পে তুষ্টি আছে। অথচ আমরা মনে করি যার কাছে কোটি কোটি টাকা আছে। সে ধনী। এটা ভুল ধারণা।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিলঃ অভাবী কাকে বলে? সবাই উত্তর দিয়েছেন : অভাবী হল ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে লোভ আছে। লোভীর পেট কখনো ভরে না। লোভ এমন খারাপ জিনিস যে, মাছি লোভের তাড়নায় শিরা চাটতে আসে আর তাতে ফেঁসে যায়। এমনিভাবে লোভী ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে ফেঁসে যায়। নিজেও খায় না অন্যকেও খাওয়ায় না।

৭২. আমল আকাংখিত, আহওয়াল বা বিশেষ অবস্থা আকাংখিত নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমাদের এখানে পাটিয়ালা থেকে একজন শাইখ এসেছিলেন। যাঁর মুরীদের সংখ্যা এক হাজার। ফজরের নামাযের পর তিনি আমাকে ধরলেন এবং বললেন : আপনার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। আমি আরয করলাম : সেগুলো কি? তিনি বলতে লাগলেন : 'সালিক' বা আল্লাহর পথের পথিক কত প্রকার? আমি বললাম, ৪ প্রকার।

১. সালিকে মাজযূব

২. মাজযূব সালিক

৩. সালিকে মহয

৪. মাজযূবে মহয

আমি প্রত্যেকের সংজ্ঞা ও আলামত বর্ণনা করলাম।

পরবর্তীতে তিনি কথা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি এক বুযুর্গের নিকট গিয়েছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর আমি জামাআতের সাথে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলাম। কিন্তু তিনি গেলেন না। আমি নামাযের পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নামায পড়তে গেলেন না? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ সময় আমার উপর এক অত্যাশ্চর্য কাইফিয়্যাত বিরাজমান ছিল। জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে গেলে ঐ কাইফিয়্যাত চলে যেত! নামায আমি এখন পড়ে নিব। আমার প্রশ্ন হল, এই কাজটা উনি সঠিক করেছেন নাকি বেঠিক?

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার উপর استغراقی کیفیت বা আত্মহারা অবস্থা ছিল কিনা? তিনি বলেন, استغراقی کیفیت তো ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে, তার استغراق ছিল না? তিনি বললেন, আমি ব্যাপারটা এভাবে বুঝতে পারি যে, নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কি জানতেন না যে, নামায হচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমার জানা ছিল।

এইসব বিষয় তদন্ত করার পর আমি বললাম যে, ঐ লোকটি শরীয়তের বরখেলাফ করেছে। তার উচিত ছিল সেই হাল বা বিশেষ অবস্থা ছেড়ে দিয়ে আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া। কেননা আহওয়াল বা বিশেষ অবস্থা কাম্য নয় বরং আমল কাম্য। জামাআতের সাথে নামায একটি আমল। হালের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত ছিল।

এইসব খারাবীর কারণ হল অনেক মাশায়িখ আহওয়াল কে মাকসূদ বা উদ্দেশ্য মনে করে বসে আছে। আমলকে তারা মামূলী বিষয় মনে করে। আমাদের হযরত থানভী রহ. বলতেন : "বর্তমানে অনেক মাশায়িখও আহওয়াল কে আসল মনে করে বসে আছে। আর আমলকে তারা সাধারণ ব্যাপার মনে করে। বিশেষ অবস্থাকে তারা যেরকম গুরুত্ব দেয়, আমলকে সেরকম গুরুত্ব দেয় না। অথচ আমলই হল মূল উদ্দেশ্য। হালত তো হল মনের প্রশান্তির জন্য"।

ব্যাপারটির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আমলের উপর অটলতা আহওয়ালের বরকতে হয়। নতুবা যদি কেউ শ্রেফ আমলদার হয় কিন্তু ছাহেবে হাল না হয় তাহলে আশংকা আছে যে, মুসীবত ও পেরেশানীর সময়, অসুস্থ অবস্থায় বা সফরে সে আমল ছেড়ে দিবে। যেহেতু প্রতিবন্ধকতা এসে গেছে। আর ঐ প্রতিবন্ধকতা দূর করার মত কেউ নেই। তো ঐ অলসতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আহওয়াল সৃষ্টি করা হয়। এজন্যই এ সমস্ত যিকির ইত্যাদি করানো হয়। কেননা অভ্যাসগতভাবেই এগুলো ব্যতীত বিশেষ হালত সৃষ্টি হয় না। আর এই বিশেষ হালত ছাড়া সাধারণত আমলের উপর অটলতাও নসীব হয় না। এজন্য 'আহওয়াল' হাসিল করা বা করানো হয়। যাতে করে আমলের উপর সার্বক্ষণিকতা বজায় থাকে।

কিন্তু যদি হাল ও আমলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তাহলে আমলকে প্রাধান্য দিতে হবে। যখন আমলের সাথে হাল যোগ হয়, তখন অবস্থা এমন হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যাঁরা বদরযুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন ছিলেন এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছেন।

বুঝা গেল যে, আমলই মাকসূদ বা মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু শুকনো আমল নয়। শুকনো আমলে পাবন্দী হলেও ভারসাম্য থাকবে না এবং এমন নামায হবে যেমন কোন ইমাম মাগরিবের নামাযে اَرَءَيْتَ الَّذِىْ এবং اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ পড়ে দিল।

নামাযের পর এক মুসল্লী বলছে : হুযূর! আপনি তো আজকে লম্বা নামায পড়িয়েছেন। তো এর কারণ কী ছিল? কারণ এটাই যে, আমল তো ছিল কিন্তু হাল ছিল না। এমনিভাবে লোকেরা তারাবীহ পড়ে কিন্তু এমন হাফেয ছাহেবকে পছন্দ করে যিনি এত দ্রুত নামায পড়ান যে, يَعْلَمُوْنَ বা تَعْلَمُوْنَ ব্যতীত আর কিছুই বুঝে আসে না।

বুঝে আসল যে, আমলের সাথে হালের সমন্বয় থাকা দরকার। শাইখ ব্যতীত এটা হাসিল হওয়া প্রায় অসম্ভব।

এ আলোচনা দ্বারা হক্কানী পীরের প্রয়োজনীয়তাও বুঝে আসল। হালতের কোন না কোন প্রতিক্রিয়া অবশ্যই থাকে। মনে করুন আপনি একটা সময় পর্যন্ত "খামীরায়ে গাওযবান আম্বরী জাওয়াহেরওয়ালা খাসসুল

খাস" (মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধিকারী ইউনানী ঔষধ –অনুবাদক) খেলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন। তাহলে আপনার শারীরিক শক্তি ও মানসিক প্রশান্তি এখনো অটুট থাকবে। কিন্তু সেই জোশ ও হাল থাকবে না। অনুরূপভাবে হালত দূর হয়ে গেলে আমলের মধ্যে জোশ ও প্রেমিকসুলভ বিশেষ অবস্থা থাকে না। কিন্তু সেটার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই থাকে। দেখুন নতুন স্ত্রীর সাথে জোশ ও শওক থাকে। কিন্তু একটা সময় পার হওয়ার পর সেই জোশ আর বাকী থাকে না। কিন্তু সম্পর্ক ঠিকই বাকী থাকে। এই সম্পর্ককেই 'উনস' বলে।

এভাবেই বুঝে নিন যে, হালাতের পর আমলের মধ্যে যদিও জোশ থাকে না, তবে উন্‌স ও সম্পর্ক ঠিকই থাকে।

৭৩. একটি দুর্লভ মালফূয

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যেমনিভাবে বিশেষ অবস্থার প্রাবল্যের সময় শরীয়তের সীমার লংঘন প্রকৃতিগতভাবে হয়, তদ্রূপ বিশেষ অবস্থা দূর হয়ে যাওয়ার পরও প্রকৃতিগতভাবে এর বহিঃপ্রকাশ হয়। মক্কী জীবনে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মধ্যে আহওয়ালা বা বিশেষ অবস্থার জোশ ছিল। ঐ সময় জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করা হত। কিন্তু অনুমতি হয়নি। কেননা তখনো পর্যন্ত আখলাক পরিপূর্ণ হয়নি। মারকায হাসিল হয়নি।

কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হল, তখন কোন কোন সাহাবী বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! করব তো সেটাই যা আপনি বলবেন কিন্তু যদি এ মুহূর্তে জিহাদের বিধান দেয়া না হত তাহলে ভাল হত। যাতে করে মক্কী জীবনের ক্লান্তি দূর হয়ে যেত"।

(সূরা বাকারাহ, আয়াত নং : ২১৬ এর প্রতি ইঙ্গিত)

৭৪. তাকওয়া এবং যিকির প্রশান্তির উপলক্ষ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের অন্তরে তাকওয়া ও অধিক যিকির দ্বারা প্রশান্তি আসে। এজন্যই তাঁরা প্রত্যেক বেহুদা কথাবার্তার দ্বারা ঘাবড়ে যান। পেরেশান হয়ে পড়েন। অবশ্য আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাবলে তারা উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও করে ফেলেন। এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতও বটে। প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তি বুঝে মুআমালা করতেন। ছোটদের সাথে ছোটদের মত আর বড়দের সাথে বড়দের মত আচরণ করতেন।

৭৫. প্রকৃত মর্যাদা কী?

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমি যখন জালালাবাদে আসি, তখন আমার বয়স আনুমানিক ২৭ বছর। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, বাসায় পানি নাই। আমি বলেছি কোন ব্যাপার নয়। আমি কূঁয়া থেকে পানি উঠিয়ে আনব। কলসি উঠিয়েছি। মিন্নীওয়ালী মসজিদে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে এসেছি। আমার স্ত্রী কোন সময় হয়ত রুটি বানাচ্ছে আমি পাশে বসে সেঁকে দিয়েছি। বের করে করে পাত্রে রেখেছি। বকরীর দুধ দোহন করেছি। কাপড় সেলাই করেছি। তালি লাগিয়েছি।

মোটকথা সব ধরনের কাজ করেছি। অথচ বর্তমানে সব কাজ স্ত্রীর দায়িত্বে চাপিয়ে দেয়া হয়। এটা অনুচিত কাজ। যখন 'ফানা' বা আত্মবিলোপের অবস্থা এসে যাবে, তখন অবস্থাই অন্য রকম হবে।

৭৬. ঘরের কাজ বা বাইরের কাজ মর্যাদা পরিপন্থী নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মুসলমানদের অবস্থা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত হবে তখনই তারা প্রকৃত মর্যাদাবান হতে পারবে। বর্তমানে আমরা অনেক ঘরোয়া কাজ বা বাজারের কাজকে মর্যাদা পরিপন্থী মনে করি। কারণ হল, প্রকৃত মর্যাদা যে কী জিনিস সেটা আমরা বুঝিই না। শুধুমাত্র বাহ্যিক টিপটপকে সম্মান ও মর্যাদা মনে করি। অথচ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর এবং বাহির এর সব কাজই করতেন। তাহলে এটা কি মর্যাদা পরিপন্থী হয়েছে? মুসলমানদের উচিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ন্যায় হালত বানানো।

৭৭. শাইখের স্থানেরও আদব আছে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শাইখের স্থানেরও সম্মান করতে হয়। জনৈক মুরীদের ঘটনা। তিনি কোন কাজে বাজার গিয়েছিলেন।

সেখানে সিপাহীরা কোন অপরাধে তাকে পাকড়াও করে। আর জেলখানায় নিয়ে তার পায়ে বেড়ী লাগিয়ে দেয়। এখন এ বেচারা পেরেশান। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করছে : হে আল্লাহ! আমি কোন্ অপরাধ করেছি, যদ্দরূন আমার পায়ে বেড়ী দেয়া হল? দিলের মধ্যে একথা ঢেলে দেয়া হল, তুমি ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন নিজ শাইখের মুসল্লায় পা রেখেছিলে। আর এখনো পর্যন্ত সতর্ক হয়ে তাওবা করনি। এটা হল তার শাস্তি।

ঘাবড়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাওবা ও ইসতিগফারে লেগে গেলেন।

সাথে সাথে নির্দেশ এসে গেছে যে, প্রকৃত অপরাধী পাওয়া গেছে। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উনি নির্দোষ। কাজেই তাকে মুক্তি দেয়া হোক।

এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি তো আর জেনে বুঝে পা রাখেননি। অনিচ্ছায় পা পড়ে গেছে। এর উপর শাস্তি হল কেন?

উত্তর হল, সতর্কতার কমতির কারণে শাস্তি হয়েছে। মুরীদের দ্বারা এ অসতর্কতা প্রকাশ পেল কেন? এর উপর তাম্বীহ ছিল।

যেমন আমাদের হযরত মাওলানা থানভী রহ. এর খেদমতে কেউ উপস্থিত হলে এবং ভুল করলে হযরত মনে কষ্ট পেতেন। আর হযরত রহ. বলতেন : তোমার কথায় কষ্ট পেয়েছি। তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলত : হযরত! আমি তো ইচ্ছা করে আপনাকে কষ্ট দেইনি। তখন হযরত রহ. বলতেন : তাওবা, তাওবা। কোন মুসলমানের নিয়্যতের উপর হামলা করা কিভাবে জায়িয হতে পারে? আমি কি একথা বলেছি যে, তুমি জেনে-বুঝে কষ্ট দিয়েছ। আমি যে কথা বলছি সেটা হল তুমি কেন আমার জন্য পীড়াদায়ক জিনিসগুলোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করনি?

৭৮. ভন্ড পীরদের থেকে সাবধান

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শরীয়তবিরোধী পন্থায় যারা মুরীদের উপর এমন বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যেটা ক্রিয়াশীলও হয়, তাদের কাছে কখনোই যাবেন না। এমনটি মনে করা উচিত নয় যে, আমার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। অবশ্যই হবে। বড় বড় আলেমের উপরও প্রভাব পড়েছে।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. এর যুগে একটি বাতিল ফিরকা ছিল। যারা অঙ্গচতুষ্টয়ের চুল মুন্ডন করত। অর্থাৎ মাথা, ভ্রু, মোঁচ ও দাড়ি। এই ফিরকা বিভিন্ন ধরনের রিয়াযত ও সাধনা করত যা দ্বারা নফসের মধ্যে সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর ঐ সূক্ষ্মতার কারণে বিভিন্ন আকৃতি পরিবর্তন করতে পারত। যেভাবে ফেরেশতারা পরিবর্তন করে। তাদের কেউ কেউ ঘন্টার পর ঘন্টা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার এমন অনুশীলন করে যে, তার চাহনীর মধ্যে আকর্ষণ এসে যায়। এর প্রতিক্রিয়া হয় এটাই যে, যে ব্যক্তি তার সামনে থাকে আর তাকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়। সে চুম্বক আকর্ষণে চলে আসে। যেরকম কিছু সাপ আছে, যার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে সন্মোহিত হয়ে চলে আসে। এই সন্মোহন যেমনিভাবে চোখের দ্বারা হয়, মুখের দ্বারাও হয়। কল্পনার দ্বারাও হয়।

এমন ভ্রান্ত ফিরকার এক লোক দিল্লীর বাইরে এক বাগানে থাকত। তার নাম ছিল গুলযার। জনৈক সিপাহী ছুটি নিয়ে দিল্লী আসে। হাঁটতে হাঁটতে সে ঐ বাগানে পৌঁছে যায়। গুলযার পায়ের আওয়াজ শুনে হাঁক দিল "কে"? উত্তরে সে বলল : আমি হলাম নাসীম। গুলযার সেখান থেকেই বলল, নাসীম! তুমি গুলযারকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

এই আওয়াজের এমন প্রতিক্রিয়া হল যে, ঐ সিপাহী গুলযারের ভক্ত হয়ে গেল এবং তার অফিসারের কাছে ইস্তিফানামা পাঠিয়ে দিল। আর বাড়ী-ঘর ছেড়ে চারো পশম কর্তন করে গুলযারের চেলা হয়ে গেল। পরবর্তীতে গুলযারের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করা আরম্ভ করল।

হযরত শাহ ছাহেব রহ. এর নিকট যখন তার ব্যাপারে আলোচনা হল তখন কেউ কেউ বললেন, তার সাথে মুনাযারা তথা বিতর্ক করা উচিত। যাতে এ ফিতনা কমে যায়। একজন আলেম প্রস্তুত হলেন, তাকে মুনাযারার জন্য নাসীম ছাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল। ঐ আলেম সেখানে গিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল যে, শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. আমাকে আপনার সাথে মুনাযারার জন্য পাঠিয়েছেন। আপনি এই এই ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে রেখেছেন। নাসীম শাহ বলল : আপনি তো এখন খুব ক্লান্ত। তাই বিশ্রাম করুন। পরে দেখা যাবে। ফলে ঐ আলেম শুয়ে পড়লেন। এদিকে নাসীম

শাহ তার মাথার পাশে বসে তাওয়াজ্জুহ দেয়া আরম্ভ করল। অনেকক্ষণ পর ঐ আলেম ঘুম থেকে উঠলে নাসীম শাহ নিজ চেলাদেরকে বলল : এর জন্য পাকোয়ান রান্না কর। (নতুন কেউ মুরীদ হলে তার জন্য পাকোয়ান বা বিশেষ পিঠা রান্না করে মুরীদদের মধ্যে বণ্টন করা হত)। মুরীদরা বলল, কে আবার নতুন মুরীদ হল যে আমাদেরকে পাকোয়ান রান্না করার নির্দেশ দিচ্ছেন? নাসীম শাহ বলল : আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘুমন্ত আলেম যখন উঠবে তখন তার প্রথম কথা এটাই হবে যে, আমাকে মুরীদ করে নিন। মুরীদরা বলল : হতে পারে তিনি মুনাযারা করবেন এবং মুনাযারায় জিতে যাবেন।

পীর ছাহেব বললেন : "আমি তোমাদের কে পাকোয়ান পাকানোর নির্দেশ দিচ্ছি। এ মুরীদ হওয়া ছাড়া অন্য কথা বলবে না"। তার স্বীয় তাওয়াজ্জুহের ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল।

মোটকথা, এমনটিই হল। উনি উঠামাত্রই বললেন : হযরত! আমাকে আপনার মুরীদ বানিয়ে নিন। নাসীম বলল : আপনি তো হযরত শাহ ছাহেব রহ. কর্তৃক প্রেরিত মানুষ। আমার সাথে মুনাযারার জন্য এসেছেন। ঐ আলেম বললেন : আমি মুনাযারা বা বিতর্ক ইত্যাদি কিছুই করতে চাই না। শুধু আপনার কাছে মুরীদ হতে চাই।

নাসীম বলল, আমার এখানে তো ৪ প্রকারের পশম মুন্ডানোর নিয়ম আছে। বললেন : আমি প্রস্তুত। ফলশ্রুতিতে মুহূর্তের মধ্যে ৪প্রকারের পশম মুন্ডন করে ফেলল।

অতঃপর নাসীম বলল : এটা ভালো মনে হচ্ছে না যে, আমরা তো পাকোয়ান খাব অথচ শাহ ছাহেব (মাওলানা আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.) পাকোয়ান খাবেন না। শাহ ছাহেবের কাছেও এ পাকোয়ান নিয়ে যাও। ফলে সে এর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল আর একটি হাঁড়িতে পাকোয়ান ভরে শাহ ছাহেব রহ. এর খেদমতে পেশ করল। আর বলল যে, আমার শাইখ নাসীম শাহ আমাকে মুরীদ বানানো উপলক্ষে এ পাকোয়ান রান্না করেছেন। সেটা আপনার কাছেও পাঠিয়েছেন। কবূল করেন। (শাহ ছাহেব রহ. শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন) একজন বলল : হযরত! এতো সেই লোক যাকে নাসীম শাহের সাথে মুনাযারার জন্য পাঠানো

হয়েছিল। সে নিজে চারো চুল পরিস্কার করে এসেছে। শাহ ছাহেব বললেন : আমার সামনে থেকে দূর হও। সেখান থেকে তাকে বের করে দিলেন।

তাহলে দেখুন! কী প্রতিক্রিয়া হল? আর সেটাও একজন আলেম মানুষের উপর। এজন্য এজাতীয় মানুষের কাছেই যাওয়া উচিত নয়।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, শাহ ছাহেব রহ. তাকে ভাগিয়ে দিলেন কেন? বরং তিনি নাসীম শাহের বিপরীত তাওয়াজ্জুহ দিয়ে সেটা দূর করে দিতেন। কেননা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. নিজেও তাওয়াজ্জুহধারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। উত্তর হচ্ছে এই যে, হয়ত শাহ ছাহেব রহ. এর মনে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ঐ বদতাওয়াজ্জুহ এত বেশি ক্রিয়া করেছে যে, যদি এখন লক্ষ ভালো তাওয়াজ্জুহ দেয়া হয়, তবুও ক্রিয়া করবে না। কোন কোন খারাপ ক্রিয়া এমনই মারাত্মক হয় যে, বিগত দিনের ইবাদাতের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। আর আগামীতেও কোন ভাল প্রতিক্রিয়া হয় না।

দেখুন শয়তান যখন পুরোপুরি শয়তান হয়ে গেল, তখন মহান আল্লাহ তাকে বুঝানো সত্ত্বেও সে নিবৃত্ত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ۝

"তুমি কি অহংকার করলে নাকি বাস্তবেই বড়দের মধ্যে হয়ে গেছ"।
(সূরা সোয়াদ : ৭৫)

এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বুঝানোর তালকীনই ছিল। ব্যস ঠিক সেভাবেই এখানেও বুঝে নিন।

৭৯. মাশায়িখের মাধ্যমে ইসলাহ করানো জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেছেন : একবার আমার নিকট পুরানো দিনের জনৈক বুযুর্গ তাশরীফ আনলেন এবং কথায় কথায় বললেন : "মৌলভী যাকারিয়া! তোমাদের মাদরাসাগুলোতে পড়া-পড়ানো কেমন হয় তা তো তুমি জান। তবে হ্যাঁ একটা কথা আমরা জানি যে, পূর্বের যুগে কোন বুযুর্গ

একস্থানে বসতেন তো আলোচনা হত যে, কোন্ জিনিস জায়েয আর কোন্ জিনিস নাজায়েয? এখন আর জায়েয নাজায়েযের আলোচনা নাই।"

বাস্তবেই এই বুযুর্গ সঠিক কথা বলেছেন। আমরা আমাদের মজলিসগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব এগুলোতে কী হয়? গীবত হয়, অন্যের ব্যাপারে সমালোচনা হয়। এদিক সেদিকের অনর্থক কথাবার্তা হয়। অথচ তারা পড়েন ও পড়ান।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَالَا يَعْنِيْهِ

করা।" (তিরমিযী শরীফ, ২:৫৫)

কিন্তু আমাদের অনর্থক কথাবার্তা ছুটে না। কেননা আমরা বুযুর্গানে দ্বীনের রঙে রঙীন হতে পারি না। তাঁদের সান্নিধ্যে যাই না।

এই রং খানকাহগুলোতে পাওয়া যায়। আমাকে ক্ষমা করবেন। এটা ব্যতীত ইলমের রং চড়ে না। কেননা শাইখের ওখানে তো আমলেরই তালীম হয়। তিনি বিভিন্নভাবে আমলের উৎসাহ দিতে থাকেন।

৮০. অত্যন্ত সুন্দরভাবে তারবিয়্যত হওয়া উচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একবার এক প্রসিদ্ধ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা থানাভবন আগমন করেন। ঘটনাক্রমে তিনি মসজিদের দরওয়াযায় দাঁড়িয়ে হযরত থানভী রহ.কে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছিলেন। হযরতওয়ালা থানভী রহ. বিষয়টা লক্ষ্য করলেন। কিছুক্ষণ সময় নিলেন একথা ভেবে যে, হয়ত ঘটনাক্রমে দেখছেন। অল্প সময় পরে পুনরায় হযরতের নজর পড়ল। তখন লক্ষ্য করলেন যে, ঐ আগন্তুক এখনো দেখছেন!

হযরত তাঁর খাস খাদেম ভাই নিয়ায হুসাইন ছাহেবকে বললেন : এই লোকটা কে? যে আমার দিকে এমন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে? ভাই নিয়ায আরয করলেন যে, ইনি হলেন ঐ ব্যক্তি। হযরত বললেন : আমাদের

লোক হয়েও এমনটি করছে কেন? আপনি তাকে গিয়ে বলুন : উনি যে এমনভাবে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন তাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কী করব আমার মূত্রথলি এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, কেউ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে পেশাবের ফোঁটা আসার আশংকা হয়।

দেখুন! হযরতওয়ালা থানভী রহ. তারবিয়্যতের কত সুন্দর পথ অবলম্বন করেছেন। অথচ কারো দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে অন্তরে চাপ পড়ে যা সামাজিকতা পরিপন্থী কাজ।

ঐ ব্যক্তি যেহেতু বড় মানুষ ছিলেন তাই তাঁর তারবিয়্যতের জন্য আমাদের হযরত কত সুন্দর ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করেছেন।

তারবিয়্যতের পদ্ধতি শেখা উচিত। সবাইকে একই লাঠি দিয়ে হাঁকানো উচিত নয়।

৮১. উসতাযের প্রশংসা করা উচিত। শিষ্যের নয়।

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন :

একটি কাগজে খুব সুন্দর 'জীম' লেখা ছিল। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল : কত সুন্দর প্রশংসাযোগ্য জীম লিখেছে। আরেকজন বলল : আরে বেকুব! জীমের কি কোন প্রশংসা হয় এটা তো হল ঐ কলমের মুন্সীয়ানা। যে এত সুন্দর করে লিখেছে। তৃতীয়জন বলল : আরে বেকুব! ঐ হাতের প্রশংসা যে এটা লিখেছে। চতুর্থজন বলল : আরে বেকুবের দল! এটা জীম, কলম বা হাত কারো প্রশংসার বিষয় নয় বরং ঐ সত্তা প্রশংসার উপযুক্ত যার হাতে কলম আছে। আর তিনি এমন জীম লিখে দিয়েছেন। এই চতুর্থ জন খুব সুন্দর কথা বলেছে যে, যোগ্য শিষ্যের প্রশংসা নয় বরং ঐ উসতাদের প্রশংসা করা উচিত যিনি নিজ প্রচেষ্টা ও মেহনতে এমন শিষ্য তৈরী করেছেন।

অনুরূপভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রশংসা নয় বরং মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন বানিয়েছেন।

৮২. ঈমান হল ভয় ও আশার মাঝামাঝি একটি অবস্থা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ঈমান হল ভয় ও আশার মাঝামাঝি। এর অর্থ হল আমল করার পর মহান আল্লাহর কাছে আশা রাখবে। কিন্তু এমন আশা করবে না যে তার মধ্যে কোন ভয়ই নেই। বরং এমন আশংকা রাখবে যে, হতে পারে আমার ইবাদতে এমন কোন ত্রুটি আছে, যে কারণে আমার ইবাদত কবূলই হচ্ছে না।

'আশা'র অর্থ এটা নয় যে, যা মনে চায় তাই করবে। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু মাফ করে দিবেন। যেমনটি সাধারণ মানুষের ধারণা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

আবার কেউ কেউ একটি বানোয়াট কাহিনীও বলে থাকে। জনৈক ব্যক্তি কারীম কারীম বলত অথচ তাকে ক্ষমা করা হয়নি আর অন্য একজন কারী কারী বলত, নামটাও সঠিকভাবে বলতে পারত না। অথচ তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে।

তাহলে বুঝুন মহান আল্লাহ কত দয়ালু। প্রথমত: এ ঘটনাটি সঠিক নয়। সঠিক নাম উচ্চারণকারীকে ক্ষমা করা হবে না। আর বেঠিক নাম উচ্চারণকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এটা কি হয়? আর যদি ঘটনাটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এমনও হতে পারে যে, 'কারীম' শব্দ উচ্চারণকারী রিয়ার সাথে নাম নিত। পক্ষান্তরে যিনি কারী কারী করতেন তিনি যদিও জিহবা ভারী হওয়ার কারণে বিশুদ্ধ নাম নিতে পারতেন না কিন্তু বলতেন ইখলাসের সাথে। তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তো তাকেও আমলের বরকতেই ক্ষমা করা হয়েছে। কেননা ইখলাস অনেক বড় আমল। আর অনেকে তো এ পর্যন্ত বলার দুঃসাহস দেখায় যে, মৌলভী ছাহেব! তোমরা জান্নাতে চলে যেও। আমরা জাহান্নামেই চলে যাব!

দিল্লীর জনৈক রসিক কবির ঘটনা মনে পড়ল। আমি তার নাম বলতে চাচ্ছি না। ঐ কবির স্ত্রী নামাযী ছিল। একদিন সেই কবি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলছে : তুমি তো নামাযী মানুষ জান্নাতে যাবে। যেখানে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা থাকবে। তুমি ছোট জাতের মানুষের সাথেই থাকবে। আর আমি জাহান্নামে গিয়ে কারূন, হামান, শাদ্দাদ জাতীয় রাজা বাদশাহদের সাথে থাকব!

একথাটা যদিও রসিকতার ছলে বলেছিল। কিন্তু কথাটা কত জঘন্য।

মোটকথা "ঈমান ভয় ও আশার মাঝামাঝি" কথাটার প্রকৃত মর্ম হল আমলের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। কেননা আমাদের অন্তরে নির্দেশ প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকে। নির্দেশ প্রদানকারী যত বড় তার নির্দেশও তত বড়। সাধারণ একজন পুলিশ আর পুলিশসুপারের নির্দেশ কি এক সমান হবে? সাধারণ পুলিশ পানি চাইলে তাকে না দিলেও হয়ত চলবে। কিন্তু পুলিশ সুপারকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন উপায় আছে কি? যদিও আপনি জানেন যে, পুলিশসুপার খুব নরম মনের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেন। তারপরও তাঁর বিশেষ পদমর্যাদার কারণে আপনি তাঁকে না করতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ যদিও অত্যন্ত দয়ালু কিন্তু তাঁর মর্যাদার দাবী হল তিনি যে নির্দেশ যেভাবে দিয়েছেন কোন ধরনের কমবেশি করা ব্যতীত ঐ নির্দেশ ঠিক সেভাবে পালন করা।

তবে হ্যাঁ যদি তিনি নিজেই কোন ক্ষেত্রে ছাড় দেন সে ক্ষেত্রে ঐ ছাড়ের উপর আমল করা উচিত। এত বেশি ভয় থাকা উচিত নয় যে, হতাশ হয়ে পড়ল। আবার এত আশাবাদী হওয়াও ঠিক নয় যে, আমলই খতম হয়ে গেল যে, না আছে নামায আর না আছে রোযা।

৮৩. ভালোবাসা থাকলে কষ্ট সহ্য করা সহজ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আয়াতে কারীমা,

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

"আগ্রহী ব্যক্তিদের এ ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত।"

(সূরা তাতফীফ, আয়াত ২৬)

কাউকে দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী দেখলে এ অভিলাষ ব্যক্ত করবে যে, আহা যদি আমিও এ কাজ করতে পারতাম তাহলে কতইনা ভাল হত।

যদি এটা না হত তাহলে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

কেন বলেছেন? অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনটি ভয় করার হক আছে। আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

আল্লাহ পাক বলছেন : হে আমাকে মান্যকারীগণ! তোমরা আমাকে মহব্বতের সাথে মান্য করেছ। প্রাথমিক রং যেটা আমাকে মান্য করার কারণে এসেছে মহব্বত থেকে এসেছে। কেননা অধিকাংশ মুসলমান ভয় বা চাপে পড়ে মুসলমান হয়েছে।

স্বীয় অন্তরে মহব্বত বা ভালোবাসা সৃষ্টি কর। এটা একটি প্রকৃতগত জিনিস। اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" উত্তরে সকলে বলল : بَلٰى অর্থাৎ অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। (সূরা আরাফ, আয়াত ১৭২)

আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করা মাত্রই মানুষ উত্তর দেয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। কেননা ইশকের ময়দানে আসা মাত্রই সীমাহীন মুসীবত আসাও আরম্ভ হয়।

ইশকে মাজাযী তথা কৃত্রিম ভালোবাসার মধ্যেই যেখানে বালা মুসীবত থাকে, সেখানে ইশকে হাকীকী তথা মাওলার সাথে প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে কী পরিমাণ বালা মুসীবত হবে। তাতো বলাই বাহুল্য।

ফরহাদ শিরীনের উপর আসক্ত হয়ে পড়েছিল। শিরীন ছিল শাহজাদী। ফরহাদ রাজার কাছে শিরীনের বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠাল। বড়রা যেহেতু বড়ই হন। সরাসরি নিষেধ করেন না। বরং কৌশলে এড়িয়ে যান।

ফলশ্রুতিতে রাজা এই শর্ত দিল যে, আমার মহল পর্যন্ত যদি দুধের নহর আনতে পার তাহলে তোমার সাথে আমার মেয়ে শিরীনের বিবাহ দিব।

এখন নহর তাও আবার দুধের নহর কিভাবে আনবে? কিন্তু ইশকের ময়দানে সব কষ্ট কর্পূর হয়ে যায়।

ফলে ফরহাদ নহর খনন আরম্ভ করল। দুধ প্রবাহিত করাও আরম্ভ করল। যখন ঐ দুধের নহর রাজার মহলের কাছাকাছি চলে আসল। আর রাজার আশংকা হল যে, এতো সফলকাম হয়ে যাবে আর পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী মেয়েকে বিবাহ দিতে হবে তখন খবর প্রসিদ্ধ করে দিল যে, শিরীন এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে এ সংবাদ ফরহাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এটা শোনামাত্রই যে কোদাল দিয়ে নহর খনন করছিল, ঐ কোদালই সঙ্গে সঙ্গে মাথায় মেরে আত্মহত্যা করল।

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, তাকে মাফ করা হবে কিনা? এরা হল মূলত : معذور তথা অপারগ। ماجور বা সওয়াবপ্রাপ্তও নয় আবার مازور বা গুনাহগারও নয়। معذور হওয়ার কারণে ক্ষমা তো করা হবে বটে কিন্তু দারাজাত বা বিশেষ মর্যাদা লাভ হবে না। কেননা দারাজাত তো পাওয়া যায় নেক আমলের কল্যাণে। পক্ষান্তরে নহর খনন করা (ব্যক্তিগত স্বার্থে) কোন সৎকর্ম নয়।

যেমন থানাভবনে এক শাইখযাদা ছিল। সে তার সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে গালি দিত। ফলে সবাই তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তার বিবাহ হল। পুরো সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিল যে, তার বিবাহ অনুষ্ঠানে শরীক হবে না। এখন এই লোকটা যার কাছেই যায় সেই শরীক হতে অপারগতা প্রকাশ করে।

এ লোকটা খুব পেরেশান হল, কেননা বিবাহ-শাদীতে আত্মীয় স্বজন না আসা সাংঘাতিক অপমানের ব্যাপার।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে তো সবাইকে তোষামোদ ও খোশামোদ করা হয়। এ পরিস্থিতি দেখে সে বলল : এখন থেকে আমি আর কাউকে গালি দিব না। তার কাছের লোকেরা বলল : তোমার কথার উপর আমাদের আস্থা নেই। তখন সে বলল : আচ্ছা আস্থা অর্জনের পন্থা কী হতে পারে? আত্মীয়রা বলল : হ্যাঁ। একটিই পথ আছে। সেটা হল শাহ বিলায়েত রহ.-এর মাজারে হাত রেখে কসম খেতে হবে। তাহলেই বিশ্বাস করব। থানাভবনের লোকজন শাহ বিলায়েত রহ.কে খুব মান্য করত। তারা প্রস্তুত হয়ে গেল। সবাই মিলে সেখানে পৌঁছল আর মাজারে হাত রেখে বলল যে, অমুকের মায়ের সাথে আমি...করি। এরা আমাকে বলছে যেন আমি আর গালি না দেই। তো আমি কসম খেয়ে বলছি : তাদের মাকে আমি... করি। এখন থেকে তাদেরকে আর গালি দিব না।

আত্মীয় স্বজন সকলেই তার কসম খাওয়া দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল আর বলতে লাগল যে, এতো মাযূর তথা অপারগ ব্যক্তি যে মাজারেও গালি দিচ্ছে। এখন তার গালিকে কেউ খারাপ মনে করবে না।

তো মাখলূকই যদি মাযূর মনে করে মাফ করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মাযূর ব্যক্তিকে কেন ক্ষমা করবেন না?

৮৫. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীন এখনো আছেন

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন বুযুর্গের নিকট পীড়াপীড়ি করা অনুচিত। আর স্বীয় শাইখের নিকট তো পীড়াপীড়ি করাই অন্যায়। এতে ক্ষতির আশংকা আছে।

আমি ডাভেল শহরের ওয়াযে বলেছিলাম যে, কোন কোন আলেম বলে থাকেন : ইসলাহ বা আত্মশুদ্ধি তো অবশ্যই জরুরী কিন্তু বর্তমান যুগে আগের মত মানুষ কোথায়? যাদের দ্বারা ইসলাহ করানো হবে?

আমাকে ক্ষমা করবেন। এমন কথা তো কোন তালিবে ইলমও বলতে পারে যে, এখন ইমাম গাযালী-রাযী প্রমুখের ন্যায় ব্যক্তিত্ব কোথায়?

তাহলে এ মাদরাসাগুলো কেন চালু রেখেছে? আর যদি আপনারা একথা বলেন যে, ইমাম গাযালী রহ. ইমাম রাযী রহ. এর মত মহান মনীষী যদিও এখন নেই কিন্তু বর্তমান কালের ছাত্রদের তৃপ্তির জন্য যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে যদিও হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, হযরত শিবলী এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর ন্যায় মাশায়িখ নাই কিন্তু বর্তমান যুগের তালিবদের তৃপ্তির জন্য যথেষ্ট। নতুবা তো ঐ প্রবাদ বাস্তবে পরিণত হবে "খানা খাব ঘি দ্বারা নতুবা মুছে যাব অন্তর থেকে!!"

যেমনটি কয়েক বছর পূর্বে জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট শেষ রাতে চোখ না খোলা ও তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার অভিযোগ করল। আমি বললাম: ইশার পর পড়ে নাও। এর দ্বারাও তাহাজ্জুদের সাওয়াব পাওয়া যায়। উনি বললেন : মাওলানা ছাহেব! তাহাজ্জুদ তো সেটাই যেটা শেষ রাতে উঠে আদায় করা হয়। এতে যে আনন্দ সেটা ইশার পর কিভাবে হাসিল হবে?

তো এটা হল শয়তানী মন্ত্রণা। শেষ রাত্রেও উঠতে দিবে না আবার ইশার পরও পড়তে দিবে না।

অনুরূপভাবে এটাও একটি শয়তানী কুমন্ত্রণা যে, বর্তমান যুগে পূর্বযুগের মাশায়িখ কোথায়?

এ ব্যাপারেই একটি ঘটনা মনে পড়ল।

একবার মাওলানা আব্দুল মাজেদ ছাহেব দরিয়াবাদী রহ. এবং মাওলানা আব্দুল বারী ছাহেব নদভী লাখনভী রহ. হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য আসলেন। তো হযরত মাদানী রহ. উভয়কে সাথে নিয়ে থানাভবনে আসলেন এবং হযরতওয়ালা থানভী রহ.-কে বললেন : আপনি এ দুজনকে মুরীদ করে নিন। হযরত থানভী রহ. বললেন : আপনিই মুরীদ করে নিন। আপনিও তো একজন শাইখ বা পীর ছাহেব।

তখন হযরত মাদানী রহ. বললেন : আমি এর যোগ্য কোথায়? হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বললেন : যোগ্য হওয়ার মর্ম যদি হয় জুনায়েদ-শিবলীর মত না হওয়া তাহলে তো আপনি এটাও না ওটাও না। আর যদি যোগ্য দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁদের সংশোধনের যোগ্য হওয়া, সেক্ষেত্রে আপনিও যোগ্য আমিও যোগ্য। কিন্তু আপনি জানেন এ পথে মুনাসাবাত বা মনের মিল থাকা শর্ত। আর এ দুজনের আপনার সাথে মুনাসাবাত আছে আমার সাথে নেই। কেননা আপনিও "খাদেমে কওম" বা জাতির সেবক আর এরাও জাতির সেবক অথচ আমি হলাম "নাদেমে কওম" বা জাতির লজ্জা।

ফলশ্রুতিতে হযরত মাদানী রহ. উভয়কে মুরীদ করে নিলেন। যদিও ইসলাহী সম্পর্ক হযরত থানভী রহ. এর সাথেই ছিল।

তাহলে দেখুন, বর্তমান যুগের তালিবদের ইসলাহের যোগ্য মাশায়িখ অবশ্যই আছেন।

৮৫. তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ বলেন : তাওবার উদাহরণ হল পানির ন্যায়। যেমনিভাবে পানি বাহ্যিক নাপাকীকে দূর করে পবিত্র করে দেয়, অনুরূপভাবে তাওবার পানি অভ্যন্তরীণ নাপাকীকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। আমরা বাহ্যিক নাপাকীর জন্য পানি ব্যবহার করি, তাহলে গুনাহের নাপাকী দূর করার জন্য কেন তাওবাকে ব্যবহার করি না?

আরে হতে পারে নাপাকী খুব শক্তভাবে লেগেছে, কিন্তু এটা হতেই পারে না যে, কেউ তাওবা করবে অথচ গুনাহের নাপাকী তার থেকে দূর হবে না।

অবশ্যই পাক হবে. আর এমনভাবে পাক হবে যে, যে আমলনামায় গুনাহ লিখে দেয়া হয়েছিল সেখান থেকেও মিটে যাবে।

আর জনাব! যেভাবে আমলনামা থেকে মিটে যাবে। অনুরূপভাবে কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের স্মৃতি থেকেও মিটে যাবে। যে তাঁরা মনে করতে চাইলেও মনে করতে পারবেন না। তাহলে এমন অব্যর্থ মহৌষধ তাওবা থেকে কোন আমরা বিমুখ থাকি?

এটা একটা শয়তানী খেয়াল যে, তাওবা করে কী হবে? যেহেতু শয়তান নিজে তাওবা করেনি, তাই সে মুসলমানদেরকেও তাওবা করতে দেয় না। এজন্য অবশ্যই তাওবা করা উতি। শয়তানের কথা কিছুতেই মানা উচিত নয়।

হাবীব আজমী রহ প্রাথমিক যুগে বড় সুদখোর ছিলেন। তার অবস্থা ছিল এই যে, ঘরে রুটি রান্না হত আর তরকারী আনতেন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের বাসা হতে। কারো ফরিয়াদ বা অনুরোধ শুনতেন না।

একবারের ঘটনা। স্ত্রীকে রুটি বানাতে বলে বাইরে গেলেন তরকারী আনতে। যাদেরকে ঋণ দিয়েছিলেন তাদের বাসা থেকে আনার উদ্দেশ্যে। এক বাসায় কড়া নাড়লেন। একজন মহিলা আসলেন। হাবীব তার কাছে তরকারী চাইলেন। মহিলা বললেন : আমরা গরীব মানুষ। তরকারী কোথা থেকে দেব? হাবীব আজমী বললেন : চুলায় তো পাতিল দেখছি, রান্নাও হচ্ছে। মহিলা বললেন : আমার বাচ্চারা কয়েক দিন যাবত না খেয়ে আছে। আজ প্রতিবেশীর কাছ থেকে অল্প একটু গোশত পেয়ে বাচ্চাদের জন্য রান্না বসিয়েছি। হাবীব আজমী রহ বললেন : ঐটাই দিয়ে দাও। এটা হতে পারে না যে হাবীব শূন্য হাতে যাবে। চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে করতে নারীটি ঐ পাতিল দিয়ে দিল। হাবীব আজমী রহ সেটা নিয়ে ঘরে পৌছল। আর স্ত্রীকে বলল : আমি গোসল সেরে আসছি তুমি তাড়াতাড়ি সালন বের করে প্রস্তুত রাখ। স্ত্রী হাঁড়ির ঢাকনা সরানোর পর দেখল যে, সেখানে গোশতের পরিবর্তে রক্ত ভরে আছে।

হাবীব আসার পর স্ত্রী বললেন : এটা আপনি কী এনেছেন? এর মধ্যে তো রক্ত ভরা, হাবীব দেখার পর অন্তরে দারুণ চোট পেলেন। আর চিন্তা করলেন যে, আমি সুদ কী খাই মানুষের রক্ত চুষি।

এ অবস্থাতেই হযরত হাসান বসরী রহ. এর খেদমতে তাওবার উদ্দেশ্যে গেলেন। রাস্তায় শিশুরা খেলাধুলা করছিল। তাকে দেখে এক শিশু বলল : "দূরে সরে যাও। হাবীব আসছে। তার শরীরের ধুলাবালু যেন আমাদের গায়ে না লাগে। আর আমরা জাহান্নামে চলে না যাই।" এ কথা শুনে অন্তরে আরো চোট লাগল। হযরত হাসান বসরী রহ. এর হাতে হাত দিয়ে তাওবা করলেন। আর যাদের নিকট থেকে সুদ নিয়েছিলেন ফিরিয়ে দেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন।

বাসায় ফেরার সময় রাস্তায় শিশুদের সাথে পুনরায় সাক্ষাত হল। তখন তারা বলাবলি করছিল : হাবীব আজমী আসছে। পাক্কা তাওবা করে ফিরছে। আসো তাঁর সাথে মুসাফাহা করি। হতে পারে তাঁর বরকতে আমাদের ক্ষমা লাভ হবে।

দেখুন আল্লাহ তা'আলা তাওবার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে দিলেন।

পরবর্তী সময়ে তাঁর অবস্থা এমন হয়েছে যে, একবার তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন। তখন হযরত হাসান বসরী রহ. এদিকে এসে গিয়েছিলেন। হাবীব আজমীর রহ. পিছনে ইক্‌তিদা করার ইচ্ছা করলেন। নিকটবর্তী হওয়ার পর শুনলেন যে, 'اَلْحَمْدُ' না পড়ে 'اَلْهَمْدُ' ছোট হা দিয়ে পড়ছেন। (যেহেতু তিনি অনারব ছিলেন। বয়স্ক হয়ে কুরআন শিখেছিলেন তাই সহীহ শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করতে পারতেন না) হযরত হাসান বসরী اَلْهَمْدُ শুনে তাঁর পিছনে নামায পড়া থেকে বিরত থাকলেন।

পরে হাসান বসরী রহ. স্বপ্নে মহান আল্লাহকে দেখে আরয করলেন : ইয়া আল্লাহ! আপনার বিশেষ নৈকট্যের কোন পথ দয়া করে বলে দিন। ইরশাদ হল : সুযোগ তো দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি তো কদর করনি। আরয করলেন : সেটা কবে? ইরশাদ হল : হাবীব আজমীর পিছনে নামায পড়া। আরয করলেন : সে তো হরফসমূহ সহীহ শুদ্ধভাবে আদায় করতে পারে না। ইরশাদ হল : তুমি শুধুমাত্র তাঁর উচ্চারণ দেখলে, যে ক্ষেত্রে সে মাযূর ছিল। অথচ তাঁর অন্তরটা দেখলে না যে কী পরিমাণ ইখলাস নিয়ে নামায পড়ছিল।

তাওবা প্রসঙ্গে এ ঘটনা বলছিলাম।

তো জনাব! যখন এমন সুদখোরের তাওবা কবূল হতে পারে, তাহলে আমার আপনার তাওবা দ্বারা কি ক্ষমা নসীব হবে না? অবশ্যই হবে। প্রয়োজন শুধু ইখলাস আর সততার।

৮৬. মহান আল্লাহর মহব্বতই আসল, কিন্তু সাথে ভয়ও থাকতে হবে

হওরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মহান আল্লাহর মহব্বতই হল প্রকৃত বিষয়। কিন্তু এর সাথে সাথে ভয়ও থাকতে হবে। যেমন উৎকৃষ্ট কোর্মার মধ্যে লবণ দেয়ার প্রয়োজন হয়। যদি কোর্মায় লবণ দেয়া না হয় তাহলে সেটা স্বাদহীন হয়ে যায়। খাওয়াই যায় না। অনুরূপভাবে যদি মহব্বতের সাথে ভয়ের সালাদ মিশ্রিত না থাকে, তাহলে অহংকারের আশংকা। যা মহব্বতের উপকারিতাকে নষ্ট করে দিবে। আর যেমনিভাবে লবণ না হলে খানা বিস্বাদ হয়ে যায়। আবার বেশি হলে তিক্ত হয়ে যায়। তো লবণ হওয়া উচিত নির্ধারিত পরিমাণে।

অনুরূপভাবে ভয়েরও পরিমাণ এমন হওয়া চাই যা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী ও গুনাহ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।

৮৭. হযরত আদম আ. এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাখ্যা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হযরত আদম আ. জান্নাতে অবস্থান করার সময় প্রকৃতি বিশুদ্ধ ছিল। মিথ্যা কথা তিনি জীবনে কখনো শুনেননি। আর শয়তানের কুমন্ত্রণাটিও ছিল বড় ভয়ংকর যে, তোমরা দুজন চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে এবং দীদারে ইলাহী নসীব হতে থাকবে। এ কথাগুলো সে কসম খেয়ে বলেছিল। মাহবূবে হাকীকী তথা প্রকৃত প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে বলেছে। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٥

"এবং তোমরা দুজন এ গাছের কাছে যাবে না তাহলে কিন্তু তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা বাকারাহ : ৩৫)

মনে ছিল না এ জন্য ভুলে গেছেন এবং ভুল কাজ করে ফেলেছেন।

কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে আদম আ. এখনো পর্যন্ত শিশু ছিলেন। আর শিশুরা সবসময় নিষ্পাপ হয়। যদি শিশু কোন অসৌজন্যমূলক কাজ করে তাহলে এর উপর পাকড়াও হয় না। সে নিষ্পাপই থাকে।

কেউ হযরত আদম আ. কে মন্দ বললে ঐ বদনামকারীর মাকামই নিচে নেমে যাবে। কিন্তু তাওবার পর হযরত আদম আ. এর মাকাম ঠিকই উপরে উঠে গেছে।

فَنَسِيَ اٰدَمُ বা "আমার বাচ্চা আদম ভুলে গেল" (সূরা ত্বহা ১১৫) এটা হল পারিভাষিক অনুবাদ। অর্থাৎ আদম ইচ্ছাকৃত ভুল করেনি, দুর্বলতা সামনে এসে গেছে। যদ্দরুন সে প্রভাবিত হয়েছে। আর এই সবকিছু করেছে আমার খাতিরে। আমার জন্য। কিন্তু তাঁর নিয়্যত ভালই ছিল। আর সরাসরি গুনাহ না হলেও যেহেতু আমার নির্দেশের বিপরীত কাজ হয়েছে। জানা নেই সামনে কি হবে? এজন্য সতর্ক করেছেন।

শেখ সাদী রহ. বলেন : گربہ کشتن روز اول প্রথম দিনই বিড়াল মারা উচিত।

অতএব সন্তানদেরকে ভুল থেকে রক্ষা করতে হলে প্রথম দিন থেকেই তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। যদিও গুনাহ নেই।

এ জন্যই হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ

অর্থাৎ "সন্তানের বয়স সাত বৎসর হলে তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও"। (আবূ দাউদ শরীফ ১ : ৭৭)

তো মহান আল্লাহ আগামী দিনের হেফাযতের স্বার্থে বলেছেন : **اِهْبِطَا جَمِيْعًا** "তোমরা উভয়ে এক সাথে নেমে যাও।" (সূরা ত্বহা : ১২৩) অর্থাৎ অন্য জগতে একটু পরিভ্রমণ করে আস। মস্তিষ্ক তাজা হবে। এখনো তো অভিজ্ঞতা হয়নি। অভিজ্ঞতাও হয়ে যাবে। তুমি ঐ জগতে গিয়ে দেখতে পাবে মানুষ কিভাবে মিথ্যা কথা বলে। আবার কিছু কিছু মানুষ কিভাবে প্রতারিত হয়। আবার কিছু মানুষ এমন সহজ সরল যে, কোন্টা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সেটাও বুঝে না।

মনে রাখতে হবে কুরআনে কারীমের যেসব স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. কে সতর্কতামূলক কিছু বলা হয়েছে, সেটা তাঁদের মাকাম অনুযায়ী তাঁদের জন্য সতর্কবার্তা।

এর দ্বারা তাঁদের নিষ্পাপত্বে কোন প্রভাব পড়বে না।

এজন্যই প্রবাদ আছে :

أَلْاَنْبِيَاءُ مَعْصُوْمُوْنَ وَالْاَوْلِيَاءُ مَحْفُوْظُوْنَ

অর্থাৎ "নবীগণ নিষ্পাপ আর ওলীগণ সংরক্ষিত"।

৮৮. ভালোবাসার অত্যাশ্চর্য প্রতিক্রিয়া

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ভালোবাসা একটি অদ্ভুত জিনিস। দেখুন মহান আল্লাহ আমানতের বোঝা পাহাড়, গাছ এবং জগতের অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণির উপর পেশ করেছেন। সবাই কানে হাত রেখেছে। অর্থাৎ এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু মানুষের সামনে যখন এ আমানত পেশ করা হল, তখন সে আগে বেড়ে এ দায়িত্ব গ্রহণ করল। কেননা তার মধ্যে ভালোবাসা ছিল। ভালোবাসার আতিশয্যে সে তো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত। এখন শুধু নির্দেশের প্রতীক্ষা। ভালোবাসার নিয়মকানূন নিরালা। হাদীসে পাক স্মরণে এল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় ঘোষণা করলেন। যদি আমি কাউকে মেরে থাকি তাহলে সে যেন আমাকে মারে, বকা দিয়ে থাকলে বকা দেয়। অর্থনৈতিক কোন হক থাকলে সেটা যেন আমার থেকে উসূল করে নেয়। তৃতীয় দিন একজন সাহাবী আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মেরেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে প্রহার করে নাও। সাহাবী আরয করলেন : আপনার শরীরে তো কাপড় আছে অথচ আমার শরীরে কাপড় ছিল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় উঠিয়ে নিলেন যাতে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারেন। ঐ সাহাবী অগ্রসর হলেন আর স্বীয় শরীর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরের সাথে লাগিয়ে দিয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উদ্দেশ্য তো ছিল এটা।

দেখুন ভালোবাসার প্রতিক্রিয়া।

এজন্যই আমি আমার বন্ধুদেরকে বলে থাকি : তোমরা কেন ভয়ের চক্করে পড়ে আছ? তোমরা ভালোবাসার চক্করে পড়। মহান আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি কর। কিন্তু ভয়ের চাট্নীর সাথে। কেননা যদি শ্রেফ ভালোবাসা হয় তাহলে পরবর্তীতে শুধু ঝগড়াই হবে। আর সম্পর্কের মধ্যে বিস্বাদ চলে আসবে।

জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল : বন্ধু কী করব? রাতে ঘুম আসে না ইঁদুর পেরেশান করে। বন্ধু বুঝমান ছিলেন। তিনি বললেন : রাতে বাতি বন্ধ করো না। জ্বালিয়ে রেখ। আলোর কারণে ইঁদুর ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী আসবে না। ফলশ্রুতিতে সে রাত্রে এমনটিই করল। কোন ক্ষতিকর প্রাণী বের হল না। খুব আরামে ঘুমিয়েছেন।

ঠিক তেমনিভাবে তোমরা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার রৌশনী সৃষ্টি কর। যেমনিভাবে ইঁদুর ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী সব বিদায় নেয়, তদ্রূপ ভালোবাসার প্রভাবে দুঃখ কষ্ট পেরেশানী সব দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা সবকিছু প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে এসেছে। এই মন মানসিকতা সমস্ত পেরেশানীকে দূর করে দিবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যস অবস্থা সেটাই হবে। যেমনটি কবি বলেন :

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

তোমার পদতলেই বের হোক মোর শেষ শ্বাস।
এটাই দিলের ব্যথা, এটাই মনের অভিলাষ।

মাথার উপর শাইখ থাকা অনেক বড় নেয়ামত। শর্ত হল তাঁকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত করাতে হবে এবং তাঁর ব্যবস্থাপত্রের অনুসরণ করতে হবে। নতুবা এ নদী পাড়ি দিতে পারবে না। কেননা নৌকা দ্বারা নদী পার হতে হয়। শাইখ হলেন নৌকাতুল্য। শাইখের অনুসরণ ব্যতীত এই উত্তাল নদী পাড়ি দেয়া কঠিন।

মনে রাখবেন, যেভাবে আপনারা ছাত্রদের পরীক্ষা নেন। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ আল্লাহর পথের পথিকদের পরীক্ষা নেন।

এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, আল্লাহওয়ালা বুর্যুগানে দ্বীনের নিকট সান্ত্বনার বাণী পাওয়া যায়। ইলমী তাহকীকাত তাঁদের মূল কাজ নয়। তাহকীকাতের স্থান হল মাদরাসা। এটা ভিন্ন কথা যে, অনেক সময় শাইখও ইলমী তাহকীক বয়ান করেন।

এ জন্যই হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব রহ. এর মজলিসে কোন সূক্ষ্ম কথার ব্যাপারে যদি কেউ বলত যে হযরত! বুঝে আসেনি তখন খুব কোমলকণ্ঠে বলতেন : "এটা খানকাহ। এটা মাদরাসা নয়। অন্য কোন মজলিসের অপেক্ষা করুন।"

হযরতের কথার উদ্দেশ্য হল প্রশ্নোত্তরের স্থান হল মাদরাসা। খানকাহ নয়। খানকাহ হল ডাক্তার সাহেবের ফার্মেসীর মত। এখানে বিভিন্ন আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা হয়।

যেমনিভাবে রোগীর জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের উপর আপত্তি উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে মাশায়িখের নিকট তালিবদের আপত্তি উঠানোর কোন সুযোগ নেই।

৮৯. এই শরীর জগত মহান আল্লাহর মাদরাসা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এই পুরো জগত, শরীর জগত মহান আল্লাহর মাদরাসা। এখানে সকলের পরীক্ষা হতে থাকে। যে বিশেষত্বের দাবী করবে, তার পরীক্ষা আরো বেশি হবে। কারণ বিনা পরীক্ষায় নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর মহান আল্লাহ যাকে বড় বানাতে চান তার তো আরো বড় পরীক্ষা নিবেন।

আমার সামনের ঘটনা। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন হেডমাস্টার ছাহেব যিনি হিন্দু ছিলেন। ক্লাসে প্রশ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। দুজন ছাত্রের উত্তর ভুল আসল। তিনি একজনকে প্রহার করলেন আর অপরজনকে কিছু বললেন না। যাকে মারা হয়েছিল ঐ ছাত্রটি বলল : স্যার! ভুলের কারণে আমাকে মারলেন অথচ ঐ ছাত্রটাকে মারলেন না!

হেডমাস্টার ছাহেব বললেন : "আমি চাই তুমি জীবনে কিছু একটা হও। এজন্য তোমাকে মেরেছি আর ঐ ছেলেটা প্রতিষ্ঠিত হোক এটা আমি

চাইনা তাই ওকে মারিনি। তোমাকে মারলে যদি তোমার মনে কষ্ট হয় তাহলে আগামীতে তোমাকেও মারব না।"

ছেলেটি খুব ভদ্র ছিল। সে বলল : না না স্যার অবশ্যই মারবেন।

তাহলে দেখলেন তো, যার ব্যাপারে মানুষ আশা করে যে সে ভবিষ্যত কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাকেই কথা শোনানো হয়। শাসন করা হয়। পরীক্ষাও এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

৯০. আনাড়ী মাশায়িখের অবস্থা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কিছু কিছু ধুরন্ধর মানুষ আছে যারা তাসাওউফের গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আত তাকাশশুফ' মাসায়িলে সুলূক, তারবিয়্যাতুস সালিক ইত্যাদি দেখে এর মধ্যে যে সন্তোষজনক হাল লেখা থাকে সেটাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে শাইখকে লিখে! যে শাইখ আমাকে কখনো না কখনো খিলাফত দিয়েই দিবেন!

তো এমন ব্যক্তি কী খলীফা আর রূহানী ডাক্তার হবেন? মানুষের দ্বীনকে বরবাদ করবে। আনাড়ী ডাক্তার হবে।

যেমনটি একটি ঘটনা আছে। জনৈক ডাক্তার নিজ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একজন রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন। নাড়িতে হাত রেখে বললেন : তুমি কমলা খেয়েছ। রোগী স্বীকার করল। ডাক্তার সতর্ক থাকার জন্য বলে ব্যবস্থাপত্র লিখে চলে এসেছেন।

রাস্তায় ছেলে জিজ্ঞেস করছে : আব্বা! আপনি কিভাবে বুঝলেন যে রোগীটি কমলা খেয়েছে। বাবা উত্তরে বললেন : তার নাড়ির মধ্যে শীতলতা অনুভব করেছি। এর দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি যে, সে ঠান্ডা কোন কিছু খেয়েছে। আর তার খাটের নিচে কমলার খোসা পড়েছিল। এর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে গেল যে ঐ ঠান্ডা বস্তু হল কমলা।

ব্যস। ছেলে মনে করল মূলনীতি আমার হাতে এসে গেছে যে, খাটের নিচে যেটাই থাকবে মনে করতে হবে যে সেটাই খেয়েছে!

পিতার মৃত্যুর পর ছেলের যুগ আসল। সে পিতার স্থলাভিষিক হল। জনৈক সম্পদশালী ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এর ডাক পড়ল। সে

খাটের নিচে উঁকি দিয়ে দেখল যে, পশমী বিছানা পড়ে আছে। ঐ ধনী ব্যক্তির নাড়িতে হাত রেখে সে বলল : মনে হয় আপনি পশমী বিছানা খেয়েছেন। ধনী মানুষটি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন : আরে পশমী বিছানাও কি কোন খাওয়ার জিনিস? আর চাকরদেরকে বললেন : এই মূর্খটার কান ধরে বাইরে বের করে দাও।

অনুরূপভাবে এ জাতীয় আনাড়ী মুরীদ খলীফা হলে মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করবে। পরিণতিতে সে নিজেও অপদস্থ হবে।

৯১. ভালোবাসা থাকলে নিজেই কষ্ট করে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যখন মহান আল্লাহর সাথে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন মাখলূক দ্বারা যে কোন কষ্ট পৌঁছলে সে এটা চিন্তা করে যে خَلْقُ اللهِ أَطْفَالُ اللهِ (সমস্ত মাখলূক আল্লাহর বাচ্চা) তাই সে সকলের কষ্ট সহ্য করে।

কেননা ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যেমনিভাবে প্রেমিক প্রেমাস্পদের মান অভিমান সহ্য করে। প্রেমাস্পদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মান অভিমানও বরদাশত করে।

একটা প্রতিক্রিয়া তো এই, আর আরেকটি প্রতিক্রিয়া হল সে নিজের থেকে কাউকে কষ্ট দিবে না।

যেমন এক বুযুর্গের ঘটনা আছে। তিনি সফরে ছিলেন। এক স্থানে স্বীয় লাঠি গেড়ে নামায পড়া আরম্ভ করলেন। অন্য একজন বুযুর্গ আসলেন। তিনি তাঁর লাঠি বরাবর নিজ লাঠি গেড়ে নফল নামায আরম্ভ করে দিলেন। এই দ্বিতীয় বুযুর্গের লাঠি বাতাসের ঝাপটায় প্রথম বুযুর্গের লাঠির উপর পড়ল। সেটাকেও ফেলে দিল। প্রথম বুযুর্গ নামায থেকে ফারেগ হয়ে স্বীয় লাঠি উঠিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বুযুর্গ দ্রুত নামায থেকে ফারেগ হয়ে দৌড়ে প্রথম বুযুর্গের কাছে আসলেন আর বললেন : আমার দ্বারা আপনি কষ্ট পেয়েছেন। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রথম বুযুর্গ বললেন : আপনার দ্বারা তো আমি কোন কষ্ট পাইনি। দ্বিতীয় বুযুর্গ বললেন : আমি এমনভাবে লাঠি গেড়েছিলাম যে সেটা আপনার লাঠির উপর পড়ে গেছে। যদ্দরূন আপনার

লাঠিও পড়ে গেছে। ফলে আপনাকে ঝুঁকে লাঠি উঠাতে হয়েছে, তো আমার কারণে আপনাকে ঝুঁকার কষ্ট করতে হল। দ্বিতীয় বুযুর্গ বললেন : এটা তো কষ্টের কোন ব্যাপার নয়। ঠিক আছে। মাফ করে দিলাম।

তো দেখুন। এই হল ভালোবাসার প্রতিক্রিয়া। এমন সামান্য ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়েও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

৯২. ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিক্ত জিনিসও মিষ্টি মনে হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ভালোবাসা সৃষ্টি হলে সমস্ত বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। আনুগত্য সহজ হয়ে যায়। বেআদবী হয় না। আর মনুষ্য স্বভাবের দরূন কখনো হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে এবং ক্ষতিপূরণ করে নেয়।

জনৈকা মহিলার স্বামী তাকে মহব্বত করত না। কিন্তু মহিলাটি তার স্বামীকে মহব্বত করত।

একবার স্বামী গাজর খাচ্ছিল। গাজরের নিচের অংশ স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করল। স্ত্রীর তো ঈদ হয়ে গেল। সে তার মায়ের কাছে সংবাদ পাঠাল : খেয়েছে গাজর, মেরেছে তার নিম্নাংশ।

এমনিভাবে জনৈক বড়লোক ব্যক্তির ছেলের ঘটনা। ঈদের দিন ছিল। স্ত্রী নতুন মূল্যবান কাপড় পরিধান করে সামনে আসল। ছেলেটি পান খাচ্ছিল। পানের পিক স্ত্রীর দামী কাপড়ের উপর ফেলে দিল। স্ত্রী কিছুই বলেনি। মুচকি হাসি দিয়েছে। নিজ কক্ষে গিয়ে অন্য কাপড় পরে এসেছে।

আজ আমরা নিজ স্বামী-স্ত্রীকে ভালোবাসিনা। বাইরের ছেলে মেয়ে আমাদের ভালো লাগে। মনে রাখবেন! প্রতিবেশীর হাঁড়ির মজা যে পেয়ে গেছে, বাসার হাঁড়ি তার কাছে ভালো লাগবে না। যতই সুস্বাদু হোক না কেন।

৯৩. কাজ হল আসল উদ্দেশ্য, পরিণামের চিন্তা করতে নেই

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : প্রত্যেকটা কাজ তার নিয়মানুযায়ী করতে হয়। সফলতা কবে আসবে এটা আমাদের জানা নেই। ব্যস দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে থাকবে।

অনেক সময় পরীক্ষা আসে, আর সাফল্য পেতে বিলম্ব হয়।

এ জাতীয় অবস্থা আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর সামনেও এসেছে। তাঁরাও চিৎকার করে বলেছেন? مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ "আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে?"
(সূরা বাকারাহ-২১৪)

সফলতা মহান আল্লাহ আপন কুদরতের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তিনিই জানেন সফলতা কবে আসবে? ব্যস কাজকে উদ্দেশ্য মনে করে ধীরে ধীরে আগাবে। এর মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও প্রশান্তি।

৯৪. ধর্মই আমানত ও সততার রক্ষাকবচ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ধর্মের কল্যাণেই মানুষ আমানত ও সততায় মযবূত হয়। ব্যাপারটাকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। দুজন মানুষ সফরে গেছেন। একজন ধনী। অপরজন দরিদ্র। ধনী ব্যক্তির সফরে ইন্তিকাল হয়ে গেল। তার কাছে এক কোটি টাকা আছে। ঐ সাথে থাকা দরিদ্র মানুষটি ছাড়া আর কেউ সেই টাকার ব্যাপারে জানে না। তো এখন যে ব্যক্তির দ্বীনের ব্যাপারে মযবূতী আছে, একমাত্র এমন ব্যক্তিই ঐ ধনীর পরিবারের কাছে এক কোটি টাকা ফেরত দিবে। কেননা তাঁর আকীদা হল : এমনটি না করলে আখেরাতে তাঁর শাস্তি হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাসী সে গুনাহ করতে পারে না। করলেও সে পূর্ণ স্বাদ পাবে না। কেননা তাঁর এই বিশ্বাস যে, আখেরাতে এর শাস্তি হবে, গুনাহকে স্বাদহীন বানিয়ে দিবে।

৯৫. সময়ের মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সকালে ঘুম থেকে উঠা হতে নিয়ে রাত্রে শোয়া পর্যন্ত সময়ের একটি নক্‌শা থাকা উচিত। ঐ নক্‌শা অনুযায়ী কাজ করা উচিত। যখন যা মনে চায় করলাম। এটা কোন জীবন নয়।

একবার হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর কাছে তাঁর উসতায শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. সাক্ষাতের

জন্য আসলেন। হযরত থানভী রহ. খেদমতে উপস্থিত হলেন। ইতোমধ্যে হযরত থানভী রহ. এর লেখালেখির সময় এসে গেল। হযরত কোন কিতাব লিখছিলেন। তখন লেখার চাহিদাও সৃষ্টি হল। ফলে হযরত থানভী রহ. স্বীয় উসতাযজীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন : হযরত! এটা আমার লেখালেখির সময়, অনুমতি কামনা করছি।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন : আমার কারণে আপনার কোন মামূল বাদ দিবেন না। ফলে হযরত থানভী রহ. লেখার জন্য চলে গেলেন। কিছুক্ষণ লিখে পুনরায় উসতাযজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন : এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন? থানভী রহ. আরয করলেন : দু এক লাইন লিখে চলে আসলাম। মামূল পূর্ণ হয়ে গেল। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. খুব খুশী হলেন।

এই হল সার্বজনীনতা। সময়ের হকও আদায় হল। মেহমানের হকও নষ্ট করলেন না।

এভাবেই সময়ের পাবন্দী করতে হয়। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও সময়সূচি ছিল। একটা সময় ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণে। আরেকটা সময় ছিল পরিবারের সদস্যদের জন্য। আরেকটা সময় পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন করতেন। ঐ সময় তাঁর নিকট কেউ আসতে পারত না। তখন মহান আল্লাহর সাথে বিশেষ মুহূর্ত হত।

অনুরূপভাবে উলামা মাশায়িখেরও একটা সময় সম্পূর্ণ নির্জনতার জন্য রাখা চাই। যাতে সে সময় নিজেকে ভরতে পারে। পরে যারা তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হতে চায় তাদের সামনে খালি করবে।

উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তারা খালি হন তাই ভরার প্রয়োজন হয়। বরং উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন ইলম দ্বারা স্বীয় অন্তকরণকে সুসমৃদ্ধ করবে।

৯৬. তাসাওউফ হল চরিত্র পরিশুদ্ধকরণের নাম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : তাসাওউফ ও সুলূক শুধুমাত্র ওযীফা আদায় করার নাম নয়। আবার এমনও নয় যে ওযীফা বেকার। বরং

আমার কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে : স্রেফ ওযীফার উপর ক্ষান্ত করা আর আত্মশুদ্ধির কোন কৌশল অবলম্বন না করা এটা ঠিক নয়।

সার্বক্ষণিক যিকির তাও আবার উচ্চস্বরে বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ নাজায়িয। কারণ বর্তমানে মানুষের মস্তিষ্ক, রগ, শিরা, উপশিরা সব দুর্বল হয়ে গেছে।

যদি কেউ বলে যে, 'যিয়াউল কুলূব' গ্রন্থে তো এ পদ্ধতি লিখেছে। আমি বলব : বাস্তবেই লিখেছে। কিন্তু সেটা শক্তিশালী মানুষদের জন্য।

আমাদের হযরত থানভী রহ. এটা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন।

তো আমি এটা বলি না যে, যিকির, শোগল সম্পূর্ণ বেকার। বরং শুধুমাত্র এগুলোর উপর ক্ষান্ত করা আর অভ্যন্তরীণ রোগসমূহের ইসলাহের কোন কৌশল অবলম্বন না করা সঠিক নয়। এটা তাসাওউফ নয়। কারণ তাসাওউফের আলোচ্য বিষয় হল অভ্যন্তরীণ চরিত্র পরিশুদ্ধকরণ। তো যতক্ষণ পর্যন্ত আখলাক বা চরিত্র পুরোপুরি পরিশুদ্ধ না হবে বুঝতে হবে তাসাওউফ আসেনি। আর সেটাও এমনভাবে অর্জন করতে হবে যেন এ ব্যাপারে যোগ্যতা হাসিল হয়ে যায়। মামুলি আখলাক হাসিল হওয়াটা তাসাওউফের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। দশ টাকা হারিয়ে গেল, অস্থির লাগেনি। কিন্তু আল্লাহ না করুন দশ হাজার টাকা খোয়া গেল আর তবিয়তে দারুণ অস্থিরতা দেখা দিল, তাহলে বুঝতে হবে যে, সবরের মাকাম হাসিল হয়নি। সামান্য কথায় গোস্বা আসল না কিন্তু কেউ মায়ের নাম তুলে গালি দিল আর গোস্বা এসে গেল তাহলে বুঝতে হবে যে এখনো তার সহিষ্ণুতা অর্জন হয়নি।

যারা শুধুমাত্র ওযীফার উপর ক্ষান্তকারী তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিগড়ে যায়। খুব কম নিজেকে সংবরণ করতে পারে।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলেন: জনৈক মূর্খ যিকিরকারী রাত্রে মসজিদে উচ্চস্বরে যিকির করত। একদিন এক মুসাফির আসলেন। রাতে মসজিদে ঘুমালেন। শেষ রাতে এই যিকিরকারী এসে যিকির করা আরম্ভ করলেন। মুসাফির ক্লান্ত ছিলেন, নাক ডেকে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলেন। তার নাক ডাকার আওয়াজে যিকিরকারীর যিকিরে অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে সে মুসাফিরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল : খরখর করে নাক ডাকছ। এতে আমার

যিকিরে অসুবিধা হচ্ছে। মুসাফির তো ক্লান্ত ছিলই। ফলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। যিকিরকারী পুনরায় জাগিয়ে দিল। মুসাফির আবার উঠে ঘুমিয়ে পড়ল। দু তিন বার এমনটি হল। ইনি জাগিয়ে দেন আর ইনি ঘুমিয়ে পড়েন।

এক পর্যায়ে ঐ যিকিরকারী চরম উত্তেজিত হয়ে ছুরি দিয়ে সে মুসাফিরের গলাই কেটে ফেলে। মসজিদ রক্তে ভেসে গেল আর সে যিকিরে লিপ্ত হয়ে গেল।

ফজরের সময় যখন মসজিদে মুসল্লীবৃন্দ আসল তখন দেখল যে শুধু রক্ত আর রক্ত। আর এই যিকিরকারী যিকিরে মাশগূল। জিজ্ঞেস করা হল : একে হত্যা করেছে কে? তখন খুব গর্বের সাথে বলল : আমিই হত্যা করেছি। এ নাক ডেকে ঘুমানোর কারণে আমার যিকিরে ব্যাঘাত ঘটছিল। তাই একে যবেহ করেছি!

তাহলে দেখুন। এই হল শুধুমাত্র যিকিরের প্রতিক্রিয়া। এই জঘন্য হত্যাকেও সে খারাপ মনে করেনি। মসজিদ রক্তে ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে অনুশোচনা আসেনি। সে ব্যস তার যিকিরের আনন্দে বিভোর।

অনুরূপভাবে জনৈক গাইরে মুহাক্কিক শাইখ কুরবানীর ঈদের দিন স্বীয় ছেলেকে যবেহ করে দিয়েছে। সে বলছিল যে, হযরত ইবরাহীম আ. নিজ ছেলের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। আমিও এমনটি করব!

এই সব হল সীমালংঘন আর মনের আবেগ পূর্ণ করা। হক্কানী পীর দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। যিনি মজলিস কায়িম করেন এবং তাসাওউফের মাসায়িল বর্ণনা করেন।

৯৭. তাবলীগের জন্য পাঁচটি শর্ত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ, বলেন : মুবাল্লিগের জন্য পাঁচটি শর্ত। ১. ইখলাস। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকা। না সম্পদের মোহ, না পদের মোহ, ২. সহীহ ইলম। অর্থাৎ যে জিনিসের তাবলীগ করছে সে জিনিস সম্পর্কে ভালভাবে জানা থাকতে হবে। ৩. ধৈর্য থাকা। অর্থাৎ কেউ শক্ত গালি দিলেও সেটা কে সহ্য করা, ৪. নম্রতা। সকলের সাথে নরম ও কোমল আচরণ করবে।

হযরত ইবরাহীম আ. এর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۝

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, (আল্লাহর স্মরণে) অত্যধিক আহ্ উহ্কারী (এবং) সর্বদা আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট ছিল।"

(সূরা হুদ : ৭৫)

ধৈর্য্যের ব্যাখ্যা হল অন্যের পক্ষ থেকে কোন কঠোর আচরণ হলে সে বরদাশত করে। আর নম্রতার ব্যাখ্যা হল সে নিজের পক্ষ থেকে অন্যান্যদের সাথে কোমল আচরণ করে।

৫. পঞ্চম শর্ত হল নিজে আমলকারী হওয়া। অবশ্য এটা ভিন্ন কথা যে নিজে আমল না করলেও অপরকে দ্বীনী কথা পৌঁছানোর দায়িত্ব ঠিকই বহাল থাকে। আর আয়াতে কারীমাহ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ "তোমরা এমন কথা কেন বলো যেটাকে তোমরা কর না" (সূরা সফ-২) এর মধ্যে অপরকে বলতে নিষেধ করা হয়নি। বরং লজ্জা দেয়া হয়েছে যে, বল অথচ করনা।

আয়াতে কারীমার অর্থ এটা নয় যে, আমল না করলে বলাও যাবে না।

তো তাবলীগের জন্য আমল করাও পূর্বশর্ত। কারণ এতে শ্রোতাদের মনে ভাল প্রভাব পড়ে।

৯৮. কানূন মূলত: সহজ হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কানূন মূলত: সহজ।

বনী ইসরাঈল গাভী যবেহ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুণাবলির প্রশ্ন করে নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারকে কঠিন করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তো সাধারণ একটি গাভী যবেহ করার কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তো বলেননি যে, এমন এমন গুণবিশিষ্ট গাভী যবেহ করতে হবে।

আর প্রাথমিক নিয়মকানূনও শুধুমাত্র নিজ রহমত প্রকাশ করার জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ নামায প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত করা হয়েছিল। শেষে পাঁচ ওয়াক্ত স্থির হয়েছে। কিন্তু সাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেয়া হবে।

তো এই কানূন হল শুধু তাঁর দয়া ও মায়া।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, শুরুতেই কেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল না? যখন নাকি এটাই উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর হলো : প্রথমত: মহান আল্লাহ স্বীয় রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চান। দ্বিতীয়ত: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান। যে তিনি আমার এত প্রিয় যে, তাঁর সুপারিশ আমি অবশ্যই কবূল করি। আর যখন দুনিয়াতে সুপারিশ কবূল করা হয়েছে, তো কেয়ামতের দিন কেন কবূল করা হবে না?

এই হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাকাম।

কতইনা ভাল হত যদি এসব কথাবার্তা শুনে আমাদের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের জোশ উথলে উঠত।

৯৯. খানকায় যাওয়া ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন লাভ করা সম্ভব নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সমালোচনাকারীর সমালোচনার ভয় ছাড়াই আরয করছি যে, চাই মাদরাসায় থেকে পূর্ণ দ্বীন হাসিল করা হোক অথবা আমেরিকা লন্ডন পৌঁছে যাক, অথবা ঘুরাফেরা করে জীবন কাটিয়ে দিক, যতক্ষণ পর্যন্ত খানকায় নিজ যিন্দেগী না কাটাবে পরিপূর্ণ দ্বীন আসবে না।

১০০. ইলমের উসীলা দিয়ে দু'আ করা চাই

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ, বলেন : তালিবে ইলম যদি নিজে নিজেকে চিনতে পারে তাহলে তার দু'আর জন্য কোন বুযুর্গের উসীলার প্রয়োজন নেই। বরং ইখলাসের সাথে তাঁর ইলম হাসিল করা এটা এমনই এক মাকবূল আমল যে, এর উসীলা দিয়ে দু'আ করলে ঐ দু'আ মাকবূল হয়। অবশ্য অহংকার খুব অন্যায় জিনিস। এটা ইখলাসের বিপরীত কাজ।

এর উপর সাক্ষী হল ঐ হাদীস যেখানে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আলোচনা আছে। পরবর্তীতে নিজ মাকবূল আমলের উসীলা দিয়ে দু'আ করার দ্বারা পাথর সরে গিয়েছিল। এতে প্রত্যেকই নিজ খাঁটি আমলের মাধ্যম পেশ করে দু'আ করেছিল এবং পাথর সম্পূর্ণ রূপে সরে গিয়েছিল। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১০১. আত্মশুদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট একজন শাইখ জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমাদের মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একবার বলেছিলেন : জনৈক গাইরে মুকাল্লিদ ব্যক্তি যিনি অন্য এক শাইখের মুরীদ ছিলেন, তিনি আমার নিকট বাইআত হওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। আমি বললাম : এক স্থানে বিশেষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার পর অন্য স্থানে খাস সম্পর্ক স্থাপন করা সমীচীন নয়। তিনি বললেন : তাহলে কি অন্যত্র সম্পর্ক স্থাপন করা নাজায়িয? আমি (হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.) বললাম : হাদীস পরিপন্থী। তখন ঐ গাইরে মুকাল্লিদ বললেন : এর সাথে হাদীসের কী সম্পর্ক? আমি বললাম : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : আল্লাহর জন্য মহব্বত আকাংখিত, আর এ ক্ষেত্রে যে জিনিসটি প্রতিবন্ধক হবে সেটা খারাপ। তখন তিনি বললেন : জ্বী হ্যাঁ।

আমি বললাম : কিছু কিছু তবিয়ত এমনও আছে যে, যখন তিনি জানতে পারেন যে, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কধারী ব্যক্তি অন্য স্থানে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে তখন তার অন্তরে সংকোচভাব এসে যায়। আর এটা মনের কষ্ট এবং আল্লাহর জন্য মহব্বতের দুর্বলতারও উপলক্ষ হয়ে যায়। সুতরাং অন্যত্র সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হল।

এ বক্তব্য শুনে ঐ গাইরে মুকাল্লিদ মেনে নিলেন।

১০২. শাইখ ইসলাহের জন্য মৌখিক ধরপাকড়ও করেন

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যখন মানুষের ভিতর হতে আত্মমর্যাদা, আদব ও ভদ্রতা ইত্যাদি নেক স্বভাবগুলো বের হয়ে যায়। যেমনটি শয়তানের ভিতর হতে বের হয়ে গিয়েছিল তখন ঐ মানুষের পক্ষে যা ইচ্ছা তাই বলা বা করা সবই সম্ভব।

আরবীতে মনীষীদের বচন আছে :

إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

"যদি তোমার লজ্জা চলে যায় তবে তোমার যা মনে চায় তা-ই কর।"

একবার হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী (রহ.) জনৈক ব্যক্তির ভুলের উপর তাকে পাকড়াও করলেন। সে নিজ এলাকায় গিয়ে চিঠি লিখল : যদি এভাবেই মৌখিক ধরপাকড় চলতে থাকে, তাহলে কোন কাজই হবে না।

এই হল বর্তমান যুগের সংশোধনপ্রত্যাশী মুরীদের অবস্থা। এরাই তরীকত কে বিগড়ে দিয়েছে। এই সব হয়েছে রসমী পীর ও আলেমদের বিগড়ে যাওয়ার দরুন। তাদের এখানে কোন ধরপাকড় হয় না। অথচ মৌখিক ধরপাকড় ছাড়া সংশোধন হতেই পারে না।

আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন সামান্য বিষয়েও সতর্ক করেছেন। এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন শাকারগঞ্জ রহ. এর মজলিসে আলোচনা হল যে, فصوص الحكم গ্রন্থের যে কপিটি আমাদের কাছে আছে, তার অক্ষরসমূহ বিভিন্ন স্থানে বিবর্ণ হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে সুলতান নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. যিনি বাবা ছাহেবের খেদমতে সুলূক অতিক্রম করছিলেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন : হযরত! অমুক আলেমের নিকট فصوص الحكم গ্রন্থের খুব স্বচ্ছ কপি আছে। বাবা ছাহেব বললেন : হ্যাঁ এমন কিতাব খুব কমই পড়া যায়। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হল।

মজলিস শেষ হওয়ার পর বাবা ছাহেবের ছেলে বললেন "নিযামুদ্দীন! আব্বা আপনার উপর গোস্বা করেছেন"। আরয করলেন : গোস্বার কারণ? ছেলে বললেন : আপনি বাবা ছাহেবের যোগ্যতার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। সেটা এভাবে যে বাবা ছাহেবের ইলমী যোগ্যতা এত কম যে, বিবর্ণ হরফগুলো উদ্ধারে তিনি সক্ষম নন।

সুলতানজী বললেন : তাওবা। তাওবা। আমি তো এটা কল্পনাও করিনি। ছেলে বললেন : আপনার মন সেদিকে না গেলেও আপনার কথা দ্বারা সেরকমই প্রতীয়মান হয়।

সুলতানজী বললেন : আপনি আমাদের শাইখের ছাহেবযাদাহ। মেহেরবানী করে মাফ করিয়ে দিন। ফলশ্রুতিতে ছাহেবযাদা ভিতরে গেলেন আর বাবা ছাহেবের খেদমতে আরয করলেন : আব্বা! নিযামুদ্দীন স্বীয় ভুলের উপর ক্ষমাপ্রার্থী। বাবা ছাহেব বললেন : "এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।"

ছেলে বাইরে এসে এভাবেই আরয করে দিলেন। এখন তো পীর ছাহেবের মাধ্যমেও সত্যায়ন হয়ে গেল।

সুতলতানজীর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। ছাহেবযাদার পা ধরে বললেন : আল্লাহর ওয়াস্তে যেভাবে পারেন ক্ষমার ব্যবস্থা করুন। নতুবা আমি বাঁচব না।

ফলশ্রুতিতে ছাহেবযাদা পুনরায় ঘরে গিয়ে ক্ষমার দরখাস্ত করল। সুলতানজীর করুণ অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন বাবা ছাহেব বললেন : "ঠিক আছে মাফ করা হল, তাকে ভিতরে ডাক।" ফলে ছেলে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলেন। আসার পর বাবা বললেন : এটা কোন ব্যাপার নয়, মুখ ফস্‌কে বের হয়ে গেছে। এমনটি হতেই পারে। অতঃপর হুজরা শরীফে গিয়ে একটি টুপি ও মুসল্লা বের করে নিয়ে আসলেন আর সুলতানজীকে দিয়ে বললেন : তুমি এই টুপি পরিধান করবে, আর এই মুসল্লার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

তাহলে দেখুন! বাবা ছাহেব রহ. কিভাবে হযরত সুলতানজী নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর কথা সংশোধন করেছেন।

এর মধ্যে রহস্য হচ্ছে এই যে, যখন তুমি শাইখের সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন কর না, তাহলে সাধারণ মানুষের সামনে নাজানি কিভাবে বলবে। তাদেরকে কত কষ্ট দিবে।

আসলে তাঁর উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানো এবং আরাম পৌঁছানো।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : "সকাল বেলা মানুষের সমস্ত অঙ্গ যবানের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে যায় যে, ভাই তুমি ঠিক থেক, আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বিগড়ে গেলে আমরাও বিগড়ে যাব।" (তিরমিযী ২ : ৬৩) তো যবানের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাবা ছাহেব তো মাফ করেই দিয়েছিলেন। তাহলে টুপি ও মুসল্লা দেয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

এর উত্তর হল : যদি মুরীদের অন্তরে একথার সামান্য কুমন্ত্রণাও অবশিষ্ট থাকে যে, সম্ভবতঃ আমার শাইখ আমার উপর নারায, তাহলে ফয়েযের মধ্যে কমতি হয়ে যায়। মুরীদের অন্তর যত বেশি প্রসন্ন ও প্রশস্ত হবে, তত বেশি ফয়েয আসবে।

তো বাবা ফরীদুদ্দীন শাকারগঞ্জী রহ. ক্ষমার পরোয়ানা দেয়ার পর এসব জিনিস এ জন্যই দান করেছেন যাতে পূর্বের মত অন্তর প্রসন্ন থাকে। অসন্তুষ্টির সামান্য সন্দেহও না থাকে।

১০৩. বড় মুসীবত দূর করার জন্য প্রয়োজনে ছোট মুসীবত অবলম্বন করবে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اِذَا ابْتُلِيْتَ بِبَلْيَتَيْنِ فَأَخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا

অর্থাৎ "যখন তোমার সামনে দুটি মুসীবত চলে আসে তখন তুমি তুলনামুলকভাবে যেটা সহজ সেটা অবলম্বন কর।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৯৬)

এটা একটি মূলনীতিসুলভ কথা। এটারই একটি অংশ বিশেষ হল, মনে করুন কোন প্রতিষ্ঠানে একটি ছেলে খুব দুষ্ট। সে দুষ্টদেরকে নিয়ে দল ভারী করছে। তো এর দুষ্টুমিকে প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থাপকগণ যদি খোশামোদ তোষামোদের আশ্রয় নেন, তাহলে এটা কোন অবমাননা নয় বরং এটা হল বড় বিপদ দূর করার জন্য ছোট বিপদ অবলম্বন করা। যা উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী সরাসরি সুন্নাহ। এটাকে হেকমতে আমলী বা কর্মপদ্ধতিগত সুকৌশল বলে।

দুনিয়াতেও এসব মানুষের প্রশংসা করা হয়। লোকেরা বলে : ইনি দারুণ বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্ক পেয়েছেন। অকল্যাণ কে কী চমৎকার কৌশলে প্রতিহত করলেন।

বিভিন্ন দ্বীনী মাদরাসার মুহতামিমদের এ ব্যাপারটা বুঝা উচিত। চুপচাপ বসে থাকবে না। প্রথমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন দুষ্টুমি একদমই না হয়। এটা সম্ভব না হলে হাল্কা মুসীবত মেনে নিবে।

যেমন হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. 'ফিতনায়ে ইরতিদাদ' তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগের ফিতনার সময় এক স্থানে তাবলীগের জন্য এবং ইরতিদাদের ফিত্না থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য নিজেই তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

সে এলাকার চৌধুরী ছাহেব কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : আমরা শুনেছি আপনারা নাকি হিন্দু হয়ে যেতে চান। উত্তরে ঐ চৌধুরী ছাহেব বললেন :"আমরা কিছুতেই হিন্দু হব না" হযরত থানভী রহ. জিজ্ঞেস করলেন : "কোন্ সে কারণে তোমরা হিন্দু হবে না"? চৌধুরী বললেন : আমরা তাযিয়া (আশূরার মিছিলে হযরত হুসাইন রাযি. এর নকল কবর) বানাই অথচ এদের ধর্মে তাযিয়া নেই। তাহলে আমরা কোন্ দুঃখে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করব? এই প্রেক্ষিতে হযরত থানভী রহ. বললেন : হ্যাঁ তাযিয়া বানানো বাদ দিয়ো না। অবশ্যই বানাবে।

এটার উপর কোন কোন মৌলভী ছাহেব আপত্তি উত্থাপন করে বলেছে : আপনি তাদের কে তাযিয়া বানানোর অনুমতি দিলেন? এটা তো গুনাহ। হযরত থানভী রহ. বললেন : দুটো বিষয় সামনে ছিল। একটি হল কুফর। আর অপরটি হল গুনাহ। আমি গুনাহের অনুমতি দিয়ে তাঁদেরকে কুফর থেকে ফিরিয়েছি। গুনাহকে কুফরের জন্য ঢাল বানিয়েছি। কেননা গুনাহ কুফর ও ধর্মত্যাগী হওয়ার তুলনায় হাল্কা।

১০৪. আকল হিসেবে মানুষ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা থানভী রহ. বলতেন : মানুষ কয়েক প্রকারের। ১. ঐসব মানুষ যাদের নিয়্যত ভাল কিন্তু আকল ভাল নয়। ২. আকল ভাল কিন্তু নিয়্যত ভাল নয়। ৩. নিয়্যতও ভাল নয় আকলও ভাল নয়। ৪. নিয়্যতও ভাল আকলও ভাল।

যেমনটি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ঘটনা আছে। একবার তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. তাঁর বাসায় মেহমান হলেন। তো খুব খানা খেলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মেয়ে আপত্তি তুলে বললেন : আপনি তো বলতেন : আহমাদ বিন হাম্বাল অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ কিন্তু খানা তো খেলেন প্রচুর। আর শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়লেন না। এদিকে উযূ না করেই ফজরের নামায আদায় করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এসব অভিযোগ শুনে বললেন : বেটি! অভিযোগ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো কর না। আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি। তাই তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. কে বললেন : আহমাদ! তোমার ব্যাপারে তো আমার মেয়ে এইসব কথা বলছে। এটা শুনে আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. বললেন : অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। কারণ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : হালাল ও পবিত্র খানা খাওয়ার দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। আমি চিন্তা করলাম আপনার থেকে অধিক হালাল ও পবিত্র খাদ্য আর কার হতে পারে? এজন্য শুরু রাত্রে খুব খেয়েছি। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই যে শোয়ামাত্রই আমার মনে একটি হাদীস এসে গেছে। আর ঐ হাদীস থেকে মাসআলা বের করা আরম্ভ করি। ১০০টি মাসআলা বের করার পর ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আর যেহেতু মাসায়িল বের করা نفع متعدى তথা এমন উপকারী কাজ যা দ্বারা অন্য মানুষদের উপকার হয় অথচ তাহাজ্জুদের নামায হল نفع لازم তথা শুধু নিজের উপকার। এদিকে نفع لازم থেকে نفع متعدى বেশি উপকারী তাই আমি তাহাজ্জুদের নামায ছেড়ে দিয়েছি। আর যেহেতু সারা রাত জেগেছিলাম তাই উযূ করিনি। ইশার উযূ দিয়েই ফজরের নামায পড়েছি।

তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. মেয়েকে বললেন : মেয়ে! তাঁকে ছেড়ে দাও। তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করবে না। তিনি অন্য দুনিয়ার মানুষ।

তাহলে দেখুন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ এর নিয়্যতও ভাল ছিল। যেহেতু তিনি অন্তরে নূর সৃষ্টি হওয়ার নিয়্যতে খানা খেয়েছেন। এবং তাঁর আকলও ভাল ছিল। তাইতো মাত্র ১টি হাদীস হতে ১০০ মাসআলা বের করেছেন। তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা আকলের তাকাযাই হল نفع متعدى এর বিপরীতে نفع لازم কে বর্জন করা।

আর ‘নিয়্যত ভাল কিন্তু আকল ভাল নয়’ এর উদাহরণ মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ. দিয়েছেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়্যদ আহমাদ খানের দ্বারা। যখন আলীগড় কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে যাচ্ছিল। তখন স্যার সৈয়্যদ আহমাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ. এর নিকটেও শরীক হওয়ার জন্য এ বলে পয়গাম পাঠান যে, আমি এমন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাই যেখানে মুসলমানদেরকে দ্বীনী তালীমের পাশাপাশি দুনিয়াবী শিক্ষাও দেয়া হবে।

যখন মাওলানা নানূতভী রহ. এর নিকট এ পয়গাম পৌঁছল, তখন তিনি বললেন যে, “স্যার সৈয়্যদ আহমাদ সাহেবের নিয়্যত তো ভাল, কোন মুসলমানের নিয়্যতের উপর হামলা করা ঠিক নয়। অবশ্য তার আকল পুরোপুরি ঠিক নেই। কেননা নিয়ম হল প্রতিষ্ঠাতা যে জিনিসের উপর কোন কিছুর ভিত্তি রাখে সেটাই প্রাধান্য বিস্তার করে। যেহেতু এ মাদরাসার ভিত্তি দুনিয়ার উপর রাখা হচ্ছে সেহেতু এতে দুনিয়ার প্রাধান্য হবে।”

ফলশ্রুতিতে এমনটিই হয়েছিল।

১০৫. কুধারণা আসা ও আনার পার্থক্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কারো ব্যাপারে কুধারণা আসাটা কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়। এটা তো প্রকৃতিগত জিনিস। দোষ তখনই হবে যখন সে এ কুধারণার উপর ভিত্তি করে কিছু করবে। আর যদি বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা কিছু না করে কিন্তু দিল দ্বারা আমল আরম্ভ করে দেয় অর্থাৎ ঐ মন্দ ধারণা অন্তরে নিয়ে বসে থাকে তাহলে এটাও গুনাহ।

১০৬. শিক্ষা ও সুলূকের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কড়াকড়ি করা তো জরুরী। এটা আখলাকের বিপরীত কিছু নয়। যদি এটা আখলাকের খেলাফ বা বিপরীতই হয় তাহলে কুরআনে পাকের অনেক স্থানে মহান আল্লাহর

কাহহারিয়্যত ও জাব্বারিয়্যতের বর্ণনা আছে। তবে এটাও কি আখলাকের বিপরীত হতে পারে? বরং এটা তো সরাসরি স্নেহ। কেননা অন্যায় কাজের উপর কড়াকড়ি না হলে মানুষ খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কোন ছোট্ট শিশু ভীমরুল ধরতে চায় তাহলে তার পিতা তাকে নিষেধ করবে কি করবে না? অবশ্যই করবে। বরং একটি থাপ্পড়ও দিবে। পরে বুঝাবে।

বুঝা গেল যে অন্যায় কাজের উপর কড়াকড়ি করাও জরুরী। অবশ্য কড়াকড়ির পদ্ধতি ভিন্নভিন্ন-কথাটাও দেখতে হবে কেমন? আর যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তাকেও দেখতে হবে সে কোন্ বংশের? কোন্ মেযাজের? নতুন নাকি পুরাতন?

বর্তমানে আখলাক ও স্নেহের অবস্থা হল যেমন একজন মহিলা। সতীনের সন্তানকে কোলে কোলে রাখে আর নিজের সন্তানের আঙ্গুল ধরে রাখে। পায়ের সাহায্যে হাঁটায়। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে বলল : কত দয়ালু সৎ মা যে, সতীনের সন্তানকে কোলে উঠিয়েছে। আর স্বীয় সন্তানকে পায়ে হাঁটাচ্ছে। মহিলাটি বলল : ব্যাপারটি আসলে এমন নয় বরং আমি চাই যে, আমার সন্তান চলাফেরা করে শক্তিশালী হোক আর সতীনের ছেলে দুর্বল থাকুক ও আমার ছেলের অধীনস্থ থাকুক।

১০৭. ইসলাহের ক্ষেত্রে শাইখের সাথে মুনাসাবাত জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একজন তালিবে ইলম লিখলেন : আপনার সাথে ইসলামী সম্পর্ক করতে চাই।

আমি আমার শাইখ ও মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মাওয়ায়েয ও মালফূযাত মুতালাআ করেছি। সেখানে লেখা আছে যে, ইসলাহী সম্পর্কের পূর্বে শাইখের সাথে মুনাসাবাত তথা মনের মিল জরুরী। এ জন্য প্রথমে শাইখের তবিয়ত ও মন মানসিকতা বুঝবে।

তো আমি ঐ তালিবে ইলম কে লিখলাম : আমার তবিয়তে কোমলতা প্রবল। দ্বিতীয় কথা হল আমি কৃত্রিমতা বা লৌকিকতায় ঘাবড়ে যাই। তৃতীয় কথা হল গোস্বা যেন কাছে না আসে।

১০৮. আন্তরিক খুশী ছাড়া কারো সম্পদ গ্রহণ করা জায়িয নেই

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِاءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

অর্থাৎ "কোন মুসলমানের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা জায়িয নেই।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৬৯৫)

সুতরাং বশীকরণের মাধ্যমে বা জোরজবরদস্তী অথবা মনের খুশীর বিপরীতে কারো সম্পদ নেয়া নাজায়িয।

ভূপাল শহরে দরবেশ মত দেখতে এক লোক আসল। সে বশীকরণের আমল জানত। এ জন্য লোকজন থেকে প্রচুর সম্পদ হাতিয়ে নিত।

হযরত হাফেয যামেন ছাহেব শহীদ রহ. এর ছাহেবযাদা যিনি হাফেয হওয়ার পাশাপাশি তাহসীলদারও ছিলেন এবং ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর ব্যাপারেও এ দরবেশ জানতে পারল। যে, ইনি তাহসীলদার। ফলে সে তাঁর কাছে আসল। এবং এক কোণায় দাঁড়িয়ে তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগল। হাফেয ছাহেব রহ. টের পেয়ে গেলেন এবং এই কবিতাটি পাঠ করলেন :

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنون

کہ اس نواح میں سودا بر ہنہ پا بھی ہے

হে মজনু! কন্টকাকীর্ণ জমিনে সাবধানে পা ফেল, কেননা এ অঞ্চলে উলঙ্গ পাগলও অনেক আছে।

এই কবিতা পাঠ করা মাত্রই ঐ তথাকথিত দরবেশ ভূলুণ্ঠিত হল। এরপর উঠে হাতজোড় করে বলতে লাগল : "আমি হলাম উচ্ছিষ্টভোজী শকুন।"

হাফেয ছাহেব বললেন : "শাহ ছাহেব! কী সব আজেবাজে কর্মকান্ড করেন। এসব পরিত্যাগ করুন। সুন্নাত ধরুন।" ব্যস এটা শোনামাত্র সেখান থেকে পলায়ন করল।

১০৯. শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া অনুচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একটি প্রবাদ আছে : ছেলে হয়ে সবাই খেয়েছে। বাপ হয়ে কেউ খেতে পারেনি।

এই প্রেক্ষিতে একটি ঘটনা মনে পড়ল। জালালাবাদে হাজী যহুর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। কৃষক ছিলেন। নিজ ক্ষেতে পানি উঠানোর চরকি চালাচ্ছিলেন। এক হিন্দু স্বীয় চেলা কে সাথে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। ঐ চরকির কাছাকাছি এসে ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ আন্দাযে বলল : বাবা! কিছু দাও, নতুবা তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে।

হাজী ছাহেব বললেন : আমার কাছে কিছু নেই। হিন্দুটি বলল : তোমার পকেটে পয়সা নেই? হাজী ছাহেব বললেন : আছে কিন্তু তোমাকে দিব না, তুমি চলে যাও।

ব্যস এটা বলা মাত্রই ঐ হিন্দু দুর্বল হয়ে পড়ল। আর খোশামোদ করে বলতে লাগল : বাবা! আমি ক্ষুধার্ত, পকেটে পয়সা নেই। হাজী ছাহেব বললেন : তা এত ভাব ধরলে কেন? অতঃপর পকেট থেকে টাকা বের করে ঐ হিন্দুকে দিয়ে দিলেন।

ভন্ড পীর ও দরবেশরা প্রচুর ভাব ধরে। এদের থেকে সাবধান থাকা উচিত। এদের চক্করে পড়া যাবে না। আলীগড়ে এক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এসেছিল। কারো পকেটে পয়সার কথা বলত। কারো ঘরের জিনিসপত্রের কথা বলত। এভাবে মানুষদের থেকে পয়সা উঠাতো।

মাওলানা লুতফে আলী ছাহেব যখন এটা জানতে পারলেন তখন লোকদেরকে বললেন যে, একে আমার নিকট আনো। ফলে তাকে আনা হল, মাওলানা বললেন : আপনি ইলমুল গাইব জানেন? মানুষদের পকেটও ঘরের জিনিসপত্রের কথা বলতে পারেন? সে বলল : জ্বী হ্যাঁ। মাওলানা বললেন : আচ্ছা আমার পকেট ও ঘরের জিনিসপত্রের ব্যাপারে বলত দেখি? ফলে সে খুব প্রভাবিত হল। এদিকে মাওলানা এত জোড় দিলেন যে ঐ বেচারার ঘাম ছুটে গেছে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারেনি।

মাওলানা বললেন : "এইসব হল ভন্ডামী। এর থেকে তাওবা করা উচিত। আসল কথা হল আপনি আপনার হামযাদ শয়তানকে আপনার অনুগত বানিয়েছেন। সে অন্যের হামযাদ থেকে জেনে আপনাকে জানায়। আপনি লোকদেরকে বলে দেন। অথচ আমার হামযাদ আমার অনুগত। আপনার হামযাদ খুব পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু আমার হামযাদ কিছুই বলছে না।" ফলে ঐ লোকটি তাওবা করল।

একবার এ ধরনের এক ভন্ড দরবেশ হায়দারাবাদ থেকে আলীগড়ে আসে। অনেক মৌলভী ছাহেবানও তার মুরীদ হয়েছে। অথচ তার মুখে দাড়িও ছিল না।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে মৌলভী ছাহেবরা তার মুরীদ হল কেন? উত্তর হল ঐ দরবেশ থেকে অস্বাভাবিক কথাবার্তা প্রকাশ পেত। আর এইসব মৌলভী ছাহেবরা মনে করেছে যে, এটাই কৃতিত্ব। ঐসব মৌলভীরা কোন এমন হক্কানী আলেম বা শাইখের কাছে বসেনি যাঁর কাছে হাকীকত জানা যায়।

যেমনটি হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দাজ্জালের উপর আলেমগণ ঈমান আনবে কেন? উত্তরে তিনি বলেন : দাজ্জালের অবস্থা হবে মাজযূব সুলভ (প্রেমে আত্মহারা দরবেশের মত) তো যেসব আলেম মাজযূব ও অস্বাভাবিক কথাবার্তার ভক্ত হন। তাঁরা দাজ্জালের উপর ঈমান (?) আনবে।

১১০. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সাদৃশ্যও কাজ বানিয়ে দেয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সাদৃশ্যও এক অদ্ভুত জিনিস। ঐতিহাসিক ঘটনা। যখন ফেরআউনের তলবের ভিত্তিতে যাদুকরগণ মুকাবালার জন্য আসল, তখন যাদুকরদের উসতায শিষ্যদেরকে বলল যে, হযরত মূসা আ. দাবী করছেন যে তিনি নবী এবং তাঁর কাছে মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। যাদু নাই। তো যদি তিনি যাদুকর হন আর তাঁর কাজ যাদু হয় তাহলে আমরা বুঝে ফেলব ও জয়লাভ করব। আর যদি তিনি

নবী হন আর তাঁর কর্মকাণ্ড মু'জিযা হয় তাহলে আমরা জয়ী হতে পারব না। বরং ধ্বংস হয়ে যাব।

শিষ্যরা বলল : গুরু! তাহলে আমরা কী করব? গুরু বললেন : তোমরা দেখে আসো হযরত মূসা আ. কোন্ পোষাক পরিধান করেছেন? একজন শিষ্য গিয়ে দেখে আসল। গুরু বললেন : এমন একটি পোষাকই তোমরা সেলাই করে নাও। যখন হযরত মূসার সাথে মুকাবালা হবে তখন পরিধান করবে। শিষ্যরা বলল : এতে কী হবে? গুরু বললেন : এতে লাভ হবে এই যে হযরত মূসা আ. এর মু'জিযার প্রতিক্রিয়া থেকে তোমরা বেঁচে যাবে।

ফলশ্রুতিতে এ পরামর্শের উপর আমল করা হয়। এদিকে অজগর সাপ যখন গিলা আরম্ভ করল তখন বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে এইসব যাদুকরদেরকে ছেড়ে দিল। এবং ফেরআউনের দিকে চলল তাকে গিলার জন্য।

ফেরআউন বলল : মূসা! তোমার অজগর কে সামলাও। হযরত মূসা আ. তো অত্যন্ত জালালী তরীয়তের মানুষ ছিলেন। তিনি বললেন : না, এটাই তোমার শাস্তি।

ওয়াহী এসে গেল, হে মূসা! আমি সাড়ে চারশত বৎসর একে সুযোগ দিয়ে রেখেছি। সে যখন অবকাশ চাচ্ছে তাকে অবকাশ দিয়ে দাও।

দেখুন মহান আল্লাহর কী দয়া আর মায়া! তাঁর বিদ্রোহীর ব্যাপারে সুপারিশ করছেন।

যাইহোক হযরত মূসা অজগর সাপটিকে ধরলেন। ফলে লাঠি নিজ আকৃতিতে এসে গেল। এ দৃশ্য দেখে যাদুকরগণ ঈমান নিয়ে আসল।

হযরত মূসা আঃ আরয করলেন : যে ফেরআউনের হেদায়েতের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল সে ঈমান আনল না অথচ যাদুকরগণ যারা মুকাবালার জন্য এসেছিল তারা ঈমান নিয়ে আসল। এর মধ্যে কী রহস্য? বলা হল : ঐ যাদুকরগণ যেহেতু তোমার মত পোষাক পরিধান করে এসেছিল, তাই আমার লজ্জা লাগল যে, আমার প্রিয় মানুষের আকৃতি ধারণের পরও তারা বঞ্চিত হবে? এ জন্য ঈমানের তাওফীক দিয়ে দেয়া হয়েছে।

দেখলেন তো! এ তাউফীক কিভাবে হয়েছে? এটা হয়েছে বাহ্যিক সাদৃশ্যের দরূন। তো যদি আমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আকৃতি, পোষাক পানাহার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর তরীকা অবলম্বন করি, তবে কি আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না? অবশ্যই হবে।

অনুরূপভাবে যদি এর বিপরীতে আমরা কাফের ও পাপীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করি, তাহলে তাদের সাথে জাহান্নামে যেতে হবে। এটা ভিন্ন কথা যে, মূল ঈমান অবশিষ্ট থাকলে এক পর্যায়ে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। কিন্তু এটার কী নিশ্চয়তা আছে যে, গুনাহে ডুবে থাকলে ঈমানও অবশিষ্ট থাকবে?

এজন্য হিপ্পীকাটিং এর চুল, কোট পাতলূন এবং দাড়ি মুন্ডন করা থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

১১১. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন একজন কবি বলেছেন :

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کرّوبیان

দিলের ব্যথার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, নতুবা আনুগত্যের জন্য মর্যাদাবান ফেরেশতার কোন কমতি ছিল না।

বাস্তবেই কবি খুব সুন্দর কথা বলেছেন। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মূর তাওয়াফ করেন। আর ফেরেশতাদের পরিমাণ এত বেশি যে একবার যাঁদের বাইতুল মা'মূরে ইবাদতের সুযোগ হয় কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আর সিরিয়াল আসবে না।

আপনারা জানেন : দিলের ব্যথা কাকে বলে? দিলের ব্যথা বলা হয় 'মহব্বত'কে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ “যারা ঈমানদার তাঁরা আল্লাহকে খুব বেশি মহব্বত করে।”

(সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৬৫)।

মহব্বত এসে গেলে মাল খরচ করাও সহজ। ক্ষুধার্ত থাকাও সহজ। প্রেমাস্পদের ঘরে উপস্থিতিও সহজ। এবং বিশেষ ঘরের চক্কর লাগানোও সহজ। সবকিছুকে সহজ করে দেয় মহব্বত।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। মনে পড়ল। রামপুর এলাকার একজন ক্বারী ছাহেব ছিলেন। হজ্জের আগ্রহ জাগল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। আগ্রহের আতিশয্যে বাসা থেকে বের হয়ে বোম্বাই পৌঁছে গেলেন। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললেন : জাহাজে কোন কাজ থাকলে আমাকে কর্মচারী হিসেবে রাখতে পারেন। ক্যাপ্টেন বললেন : জায়গা আছে কিন্তু আপনার উপযোগী নয়। কেননা মেথরের জায়গা খালী আছে। তিনি বললেন : আমি এই চাকরীই করব। ঠিক ঐ সময়েই আরেকজন আসলেন। উনিও চাকুরী কামনা করলেন। ইংরেজ বললেন : কাজ তো আছে কিন্তু খুব শক্ত। এই যে ওজনদার যথেষ্ট বড় বস্তা, এটাকে উঠিয়ে রাখতে হবে। বস্তাটা এত ভারী ছিল যে, এ লোকটি হকচকিয়ে গেল। কিন্তু ক্বারী ছাহেব রহ. তাকে বললেন : তুমি দায়িত্ব নিয় নাও। তোমার কাজও আমিই করে দিব। ফলশ্রুতিতে ক্বারী ছাহেব ইংরেজকে বললেন : উভয় কাজই আমরা মিলেমিশে করব। পরবর্তী সময়ে ক্বারী ছাহেব রহ. দারুণ জোশের সাথেই ঐ বস্তা উঠালেন।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেখুন! দুর্বল মানুষও যখন গোস্বায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন ভীষণ শক্তিশালী হয়ে যায়।

মোটকথা ক্বারী ছাহেব রহ. কাজ করতে থাকলেন।

একবার ক্বারী ছাহেব রহ, তাহাজ্জুদে কুরআন শরীফ পড়ছিলেন। তিনি চমৎকার কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মাখরাজ ও সিফাত সহীহভাবে আদায়ের পাশাপাশি আরবী লাহজাও কাম্য। কেননা কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে আরবী লাহজায়।

বিষয়টা আমার জানা আছে। কারণ আমি ৪ স্থানে তাজভীদ শিখেছি। ১. আলীগড়ে স্কুলে পড়া অবস্থায়, ২. অতঃপর দেশে এক স্থানে পড়াতে গিয়ে একজন ক্বারী ছাহেবের নিকট মশক করেছি। ৩. অতঃপর লাখনৌ গিয়ে ক্বারী আব্দুল মাবূদ ছাহেব রহ. যিনি ক্বারী আব্দুল মালেক ছাহেব রহ এর শাগরিদ, তাঁর কাছে মশ্‌ক করেছি। তিনি বলেছিলেন : আপনার তো মশ্‌কের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনাকে লাহজায়ে মায়িয়্যার মশ্‌ক করাচ্ছি। ৪. অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দে এসে ক্বারী আব্দুল ওয়াহীদ ছাহেব রহ. এর কাছে শিখেছি। জাযরী ইত্যাদিও পড়েছি।

যাই হোক ঐ ক্বারী ছাহেব আরবী লাহজায় সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। সেই ইংরেজ ক্যাপ্টেন সেখানে চলে আসল। ক্বারী ছাহেব রহ.কে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখে খুব পছন্দ হল। শুনতে থাকল। যখন ক্বারী ছাহেব রহ. ফারেগ হলেন তখন ঐ ইংরেজ বলল : আপনি কী পাঠ করছিলেন? খুব সুন্দর কথা তো, আমাকেও শিখিয়ে দিন। ক্বারী ছাহেব রহ. বললেন : এভাবে শেখানো যাবে না। বরং এর পূর্বে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ এই কালিমা পড়তে হয়। ফলে ঐ ইংরেজ কালিমা পড়ে নিল। চলতে ফিরতে এর যিকির করতে লাগল।

ক্যাপ্টেনের এক ইংরেজ বন্ধু যখন তাঁকে এই কালিমা পড়তে শুনলেন, তখন তাঁকে বললেন যে, তুমি এটা কী পড়ছ? তিনি বললেন : আমার উসতায ক্বারী ছাহেব রহ. আমাকে শিখিয়েছেন। আমার কাছে খুব ভাল লাগছে।

ইংরেজ বন্ধু বললেন : তুমি কি জান এটা পড়লে মানুষ মুসলমান হয়ে যায়? তিনি বললেন : ব্যাপারটি এমন হলে আমিও মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। ফলে তিনি ক্বারী ছাহেব রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! এই কালিমা পড়লে নাকি মানুষ মুসলমান হয়ে যায়?

ক্বারী ছাহেব রহ. বললেন : আপনি যেদিন কালিমা পাঠ করেছেন ঐদিন থেকেই মুসলমান। ফলশ্রুতিতে তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন “আমি মুসলমান”।

এই পবিত্র কালিমা তাঁর উপর এমন প্রভাব ফেলল যে, তিনি জাহাজের চাকুরী থেকে ইস্তফা দিলেন।

তাহলে দেখুন ইশ্‌কের প্রভাব। নিজেও রঙীন হয়েছে, অন্যকেও রঙীন করেছে।

আর এই হল ইশকের সর্বশেষ মাকাম। মানুষ থেকে মানুষহীন হয়ে যায়। নখ কাটতে পারে না। সুগন্ধী লাগাতে পারে না। সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করতে পারে না। চামড়ার মুজা পরিধান করতে পারে না। ঘরের মানুষের কাছেও হয়ে যায় অপরিচিত। তো এইসব তবিয়ত পরিপন্থী বিষয়গুলোকে কখন সহ্য করে? তখনই করতে পারে যখন কেউ ইশকের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়।

এই পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই জনৈক বুযুর্গ বলছেন :

اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید

معشوق دریں جاست بیائید، بیائید

অর্থাৎ হজ্বে যাওয়ার পূর্বে আমাদের নিকটে থেকে ইশকের শান পয়দা কর। যাতে এই ইশক সেখানে পৌঁছে কাজে দেয়। কষ্ট না হয়।

১১২. শাইখের সম্মানের প্রভাব

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : বাবা ফরীদুদ্দীন শাকারগঞ্জী রহ. এর ব্যাপারে হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. দেহলভী মন্তব্য করেছিলেন: যে ব্যক্তি তোমার কবর যিয়ারত করবে সে জান্নাতী। এর কারণ হল কুতুব ছাহেব রহ. এর যমানায় একজন বুযুর্গ দিল্লীতে এসেছিলেন আর ইলান করেছিলেন : যে আমার সাক্ষাত করবে সে জান্নাতী। কুতুব ছাহেবও রহ. এ ঘোষণা শুনতে পেলেন। বাবা ছাহেবকে বললেন : ফরীদুদ্দীন! তুমি কিছু শুনেছ? বাবা ছাহেব আরয করলেন : জ্বী হযরত শুনেছি। তখন কুতুব ছাহেব রহ. বললেন : তাহলে তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য যাচ্ছ না কেন? বাবা ছাহেব রহ. বললেন : হযরত! আমি যাব না। কারণ আপনি আমার শাইখ। আর আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটাই যে, আপনি জান্নাতী মানুষ। এজন্য আমি ঐ বুযুর্গের কাছে যাব না। কেননা আমি ঐ জান্নাতে গিয়ে কী করব যেখানে আমি আছি অথচ আপনি নেই!

এটা শুনে হযরত কুতুব ছাহেব রহ. এর জোশ এসে গেল। তিনি বললেন : ঐ বুযুর্গ তো এ কথা বলছে যে, যে আমার সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতী। আমি বলছি: যে তোমার কবর যিয়ারত করবে সে জান্নাতী।

এ জন্যই বাবা ছাহেব রহ. এর মাজারে এক দরওয়াযার নাম হল বাবুল জান্নাহ।

এখানে বাহ্যতঃ একটি সন্দেহ হতে পারে যে, কবর যিয়ারতকারী তো ফাসেকও হতে পারে। তাহলে জান্নাতী হওয়ার সংবাদ কিভাবে সঠিক হবে?

উত্তর হল : এতে এ কথার সুসংবাদ আছে যে, তাঁর কবর যিয়ারতকারী শেষ সময় পর্যন্ত মুমিন থাকবে। তার ইন্তিকাল ঈমানের উপর হবে এবং ঐ ব্যক্তি জান্নাতী হবে।

এর উপর হয়ত কারো মনে এ খেয়াল আসতে পারে যে, হায় কতই না ভাল হত যদি আমরা বাবা ছাহেবের রহ. কবর যিয়ারত করতে পারতাম। তাহলে তো আমরাও জান্নাতী হতাম।

তো আমি আপনাদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছি যে, বাবা ছাহেবের রহ. মাজারে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন নেই। কেননা আমরা যে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সিলসিলায়ে ইমদাদিয়্যাহ। তার শীর্ষ ব্যক্তি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এরও একটি ওয়ারিদ (অন্তরে উদ্রেক হওয়া কথা) আছে। আর সেটা হল এই যে, হযরত হাজী ছাহেব দু'আ করেছিলেন: ইয়া আল্লাহ! যে আমার সিলসিলায় প্রবেশ করবে, তাঁকে জান্নাত দান করুন।

তাঁর এ দু'আ কবূল হয়ে গেছে। ব্যস এটা সুসংবাদ যে যে এ সিলসিলায় দাখেল হবে সে জান্নাতী। অতএব অন্য কোথাও যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন নেই। বরং এই সিলসিলায়ে ইমদাদিয়্যার কদর করুন। এটা অনেক বড় নেয়ামত। যা কষ্ট ছাড়া আমরা পেয়ে গেছি।

আর হযরত হাজী ছাহেব রহ. যে স্বীয় যুগের কত বড় বুযুর্গ ছিলেন সে ব্যাপারে আমি আর কী বলব? মোটকথা এ সিলসিলার খুব কদর করা চাই।

১১৩. মৃত্যুকে ভয় পাওয়া মুমিনের শান নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মৃত্যু ভয় পাওয়ার মত কোন বস্তু নয়। মৃত্যু তো হল মুমিন ব্যক্তির পরম আকাঙ্ক্ষিত জিনিস। কোন একজন বুযুর্গ বলেছেন :

خرم آنروز کزیں منزل ویراں بروم
راحت جاں طلبم وازپئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے
تا در میکدہ شادان و غزل خواں بروم

অর্থাৎ আমি সেদিন হব আনন্দিত যেদিন আমি এই বিরাণ ঘর (দুনিয়া) থেকে বিদায় নেব। রূহের শান্তি তালাশ করব আর মাহবূবের পিছনে পিছনে যাব।

আমি মান্নত মেনেছি যেদিন এ দুঃখ (দুনিয়াবী যিন্দেগী) শেষ হবে, ঘর (জান্নাত) এর দরওয়াজা পর্যন্ত উৎফুল্লতার সাথে গজল গাইতে গাইতে চলে যাব। (গজল গাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহর প্রশংসা করা)। এ জন্য মৃত্যুকে ভয় পাওয়া অনুচিত। পবিত্র রূহ তো মৃত্যুর দিনের আকাংখায় থাকে। যাতে করে মাহবূবে হাকীকী মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাত হয়।

এখানে দুনিয়াতেও ঐ পবিত্র রূপ মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এখানের মুশাহাদা হল শত প্রতিবন্ধকতার সাথে। আর সেখানে পৌঁছে দুনিয়াবী এইসব পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। যদিও ওয়াজিবুল উজূদের বড়ত্বের পর্দা সেখানেও বাকী থাকবে। কিন্তু কোন আফসোস হবে না। স্ব-স্ব যোগ্যতা উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ যোগ্যতার উপর রাজি-খুশী থাকবে। আর ঐ যোগ্যতা অনুসারেই মহান আল্লাহর পবিত্র দর্শন লাভ হবে। এজন্য এই দেখার উপরই তারা সন্তুষ্ট থাকবে।

এই রূহ হল আখেরাতের সওদাগর। আর আখেরাত হল তার ইশকের বাজার। এই রূহ আখেরাতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস ঐ ইশকের বাজার

থেকে ক্রয় করবে। কেউ হুরদের খরিদদার। কেউ গিলমানের খরিদদার। কেউ স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্যের তৈরি প্রাসাদসমূহের খরিদদার।

এখন থাকল প্রশ্ন যে, এইসব কিছুর মূলপুঁজি কী হবে? কেননা পুঁজি ছাড়া কিছু কেনা যায় না। আখেরাতের বাজারের পুঁজি হল নেক আমলসমূহ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ অর্থাৎ “সব ধরনের লোকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুসারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে”।
(সূরা আনআম-১৩২)।

আর ঐ মূলধন বা টাকা পয়সা খাঁটি হতে হবে। জাল নোট কাজে আসবে না। খাঁটি মূলধন হল ঐ নেক আমল যেটা সুন্নাহ অনুযায়ী ইখলাসের সাথে আদায় করা হয়।

১১৪. আমাদের দুটি ঘর, বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ছাত্ররা ছুটির সময় বাড়ী চলে যায়। অথচ তাদের এখানেই থাকা উচিত। যাতে মজলিসে শরীক হয়ে প্রকৃত ঘরের উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু অন্তরে ঐ ঘরের তলবের উপস্থিতি নাই। এজন্য যখনই ছুটি তখনই ঘরে দৌড়।

এখান থেকে আরেকটি কাজের কথা জানা গেল যে, যাওয়ার আনন্দ হল প্রকৃতগত আনন্দ।

আর ঘর দু ধরনের হয়। একটি হল ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ দুনিয়াবী ঘর। আর অপরটি হল চিরস্থায়ী অর্থাৎ আখেরাতের ঘর। তো যেমনিভাবে দুনিয়ার ঘরে গেলে মানুষের মনে আনন্দ লাগে। আখেরাতের ঘরের জন্যও সেরকম আকুলতা ও ব্যাকুলতা থাকতে হবে।

এখান থেকে আরেকটি মাসআলা বের হয়ে আসে। এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, মানুষ যতই ঘর বা বাসার নিকটবর্তী হয়। তার খুশী ও প্রফুল্লতা ততই বাড়তে থাকে। দিল লাফাতে থাকে। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থাও অনুরূপ। যতই তারা বৃদ্ধ হতে থাকেন মৃত্যু তাঁদের কাছে প্রিয় হতে থাকে। কারণ মৃত্যুই হল আখেরাতের পুল। যে আখেরাত তার প্রকৃত গন্তব্যস্থল।

এটাকেই একজন আরেফ এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

وقت آں آمد کہ من عریاں شوم

جسم بگذارم سراسر جاں شوم

অর্থাৎ এখন ঐ সময় এসে গেছে যে, আমি কাপড়শূন্য হয়ে যাব। শরীর দুনিয়াতেই ছেড়ে দিব। একেবারে জানই জান হয়ে যাব।

কিন্তু মৃত্যুর এ আকাংখা ও আনন্দ একমাত্র তাঁরই হতে পারে যিনি ঐ ঘর হাসিল করার জন্য চেষ্টাও করেছেন। নতুবা ঐ ব্যক্তি যে আখেরাতের জন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ করেনি, সে আখেরাতের নেয়ামতসমূহের আকাংখা কস্মিনকালেও করতে পারে না।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ۝

অর্থাৎ "(হে রাসূল!) বল হে ইহুদীগণ! যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়। তবে মৃত্যু কামনা কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা নিজ হাতে যা সামনে পাঠিয়েছে, তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এই জালেমদেরকে ভালোভাবেই জানেন।" (সূরা জুমুআহ : ৬-৭)।

আয়াতদ্বয়ের দ্বারা বুঝে আসল যে, মৃত্যুর আকাংখা কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিই করতে পারে মহান আল্লাহর সাথে যার মহব্বত আছে। আর মহব্বত সৃষ্টি হয় তাকওয়া ও যিকির দ্বারা।

সাথে সাথে এটাও বুঝে আসল যে, নেক আমল ছাড়া কেউ মৃত্যুর আকাংখা করতে পারবে না। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল ঈমান আছে, তিনিই এই পবিত্র আকাংখা লালন করতে পারেন।

সারকথা এটাই যে, এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যিকির ও তাকওয়ার চাদরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখবে। যাতে মৃত্যুর পর আখেরাতের ঘর লাভ করতে পারে। যেটা আমাদের প্রকৃত ঘর।

১১৫. সম্পর্ক উন্নত করার পদ্ধতি

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ কর"। (সূরা নিসা : ১৯) এটা হল মহান আল্লাহর নির্দেশ। চিন্তা ভাবনার পর বুঝে আসে যে, এর কারণ হল পরস্পরের সম্পর্ক ও আচার-আচরণ উন্নত হওয়া। কারণ আচার ব্যবহার ভাল হলেই পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে।

এই সুন্দর সামাজিকতার জন্য হযরতওয়ালা মুজাদ্দিদে মিল্লাত থানভী রহ. "আদাবুল মুআশারাত" নামক একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। এর উপর আমল করার দ্বারা সামাজিকতা সুন্দর হবে এবং সম্পর্ক ভাল থাকবে।

১১৬. মশ্কের দ্বারা সবকিছু সহজ হয়ে যায়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ নেই। দেখুন! খেলাসমূহের মধ্যে একটা খেলা হল 'মৃত্যুকূপ'। এতে কাঠের গোল তক্তা গেড়ে তার উপর মোটরসাইকেল চালানো হয়। কিন্তু চালাক ভয় পায় না। কেননা সে এর উপর মোটর সাইকেল চালানোর মশক বা অনুশীলন করেছে। মশকের কারণে সে নিশ্চিত যে, আমি পড়ব না। আমি মরব না।

তো যখন এই ব্যক্তি মশ্কের কারণে মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহলে মুমিন যিনি আমলে সালিহার মশক করেছেন, তাঁর মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ থাকতে পারে কি? যেমনটি গতকালের মজলিসে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। অবশ্য নেক আমলের মশ্ক জরুরী।

১১৭. মানা কাকে বলে?

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : প্রকৃত পক্ষে মানার অর্থ হল, বড় কারো কথা বুঝে আসে না তারপরও সে তা মেনে নেয়। বুঝে আসার পর মানা এটা তো কোন কৃতিত্ব নয়। এটা তো স্বীয় কথার উপর আস্থা

রেখে মানা হল। বড়র উপর প্রকৃত নির্ভরতা হল তার কথা অম্লান বদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়া। চাই বুঝে আসুক বা না আসুক।

যেমন- আপনারা সবাই মাশাআল্লাহ শিক্ষিত মানুষ। আপনারা জানেন ঈমান শুধুমাত্র জানার নাম নয় বরং মানার নাম হল ঈমান। যেমন গোস্বা বা রাগ একটা মন্দ রোগ, সবাই জানি। কিন্তু এটা কি শুধু জানাই যথেষ্ট নাকি গোস্বার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণেও রাখতে হয়? শুধু জেনে লাভ নেই বরং মানতেও হবে।

এজন্য কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাপার হল কেউ আপনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিল কিন্তু আপনি গোস্বা করলেন না। এতে হতবাক হওয়ার কিছু নেই। মশ্‌ক ও ইসলাহের দ্বারা সব কিছু সংশোধিত হয়ে যায়।

১১৮. কাশফ ও কারামাত ভ্রুক্ষেপযোগ্য বিষয় নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হযরত হাসান বসরী রহ. ওয়ায করতেন। তো যদি ঐ মজলিসে রাবেয়া বসরী থাকতেন, তাহলে মন খুব প্রফুল্ল থাকত। এবং আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ বিষয়বস্তু বয়ান করতেন। কিন্তু হযরত রাবেয়া বসরী না থাকলে মন অতটা প্রসন্ন থাকত না। বয়ানও সেরকম হত না।

একদিন একজন অকৃত্রিম খাদেম জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! এটা কী ব্যাপার যে হযরত রাবেয়া থাকলে আপনি খুব খুলে খুলে বয়ান করেন আর তিনি না থাকলে অতটা খুলে বয়ান করেন না?

হযরত হাসান বসরী রহ. উত্তর দিলেন : তিনি দেখতে তো একজন নারী। কিন্তু বাস্তবে পুরুষদের মধ্যে একজন পুরুষ। এজন্য তাঁর সামনে দিল খুব খুলে। খুব সুন্দর বিষয়বস্তু অন্তরে আসতে থাকে।

তাঁদেরই ঘটনা। একবার উভয় হযরত নদীর কিনারে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন : রাবেয়া! কোথায় যাচ্ছ? আস পানির উপর মুসল্লা বিছিয়ে নামায পড়ি। এ কথা বলে তিনি পানির উপর মুসল্লা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত রাবেয়া রহ. বললেন : হযরত! এটা কী হল? আসুন

বাতাসের উপর মুসল্লা বিছিয়ে নামায পড়ি। এটা বলে উড়াল দিলেন এবং বাতাসে মুসল্লা বিছিয়ে দিলেন।

হযরত হাসান রহ. এ দৃশ্য দেখে বললেন : রাবেয়া! আমি তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। এটা শুনে রাবেয়া বসরী রহ. উসতাযের সম্মান ঠিক রেখে এসব কারামত যে উদ্দেশ্য নয় সেটাকে অদ্ভুত শিরোনামে আদবের সাথে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন : হযরত! আপনি যেটা করে দেখালেন সেটা তো মাছ করে দেখায়। আর যেটা আমি করলাম সেটা মাছি করে দেখায়।

দেখুন নিজেকে উসতায থেকে নিচু করেছেন। কেননা মাছি থেকে মাছ ভাল। নিজেকে মাছির সাথে আর শাইখকে মাছের সাথে তুলনা করেছেন। পবিত্র মাছ বড় সুস্বাদু ও উন্নত জিনিস। তাইতো জান্নাতীদেরকে জান্নাতে সর্বপ্রথম মাছের কাবাব খাওয়ানো হবে। তাহলে মাছ কত মর্যাদাপূর্ণ বস্তু। নিজ উসতায ও শাইখকে মাছের সাথে তুলনা করে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন আর নিজেকে মাছির সাথে তুলনা দিয়েছেন। যা কোন কাজের নয়। খাওয়াও যায় না। ভূনাও করা যায় না। যদি খানার মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে যদিও নাপাক হয় না কিন্তু অন্তর সেটা খেতে চায় না।

এটা উসতাযের আদবের কারণে ছিল। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হল এমন জিনিস। যা নিজে নিজেই আদব শিখিয়ে দেয়। অন্য কারো শেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী।

এ ব্যাপারে একটি ঘটনা মনে পড়ল। এক বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন যে, তার সমস্ত দাঁত পড়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারদেরকে ডাকলেন এবং একজন ব্যাখ্যাকারীর নিকট এই স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : রাজার সমস্ত আত্মীয় রাজার সামনে মারা যাবে।

এই তা'বীর শুনে রাজা অসন্তুষ্ট হলেন, আর বললেন যে একে শূলীতে চড়াও। আমার সমস্ত আত্মীয়কে মেরে ফেলতে চায়।

অন্য আরেকজন ব্যাখ্যাকারের নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন: হুযূর! খুব সুন্দর স্বপ্ন, হুযূরের আয়ু সমস্ত আত্মীয়স্বজনের থেকে দীর্ঘ হবে।

রাজা খুশী হয়ে গেলেন এবং তাকে পুরস্কারে ভূষিত করলেন! তাহলে দেখুন! কথা তো ঐ একই, স্রেফ শিরোনাম ভিন্ন ভিন্ন। যদ্দরুন একজনকে শূলীতে দেয়া হল, আর অপরজনকে পুরস্কৃত করা হল।

তো আমি বলছিলাম যে, হযরত রাবেয়া বসরী রহ. কাশফ ও কারামতের হাকীকত প্রকাশ করে দিয়েছেন। যে, এটা লক্ষ্য করার মত কোন বস্তুই না। অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাসাওউফে কদম রাখা মাত্রই কাশফ ও কারামত তালাশ করতে থাকি। অনেকে সুন্দর স্বপ্নের অনুসন্ধানী হয়ে যান। অথচ প্রবাদ প্রসিদ্ধ کشف را بر کفش باید زد অর্থাৎ কাশফ কে জুতার কিনারে নিক্ষেপ করা উচিত।

সুলূকে এসে কখনোই এসব জিনিসের তালিব হওয়া উচিত নয়। ব্যস মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির তলব থাকা চাই।

১১৯. শাইখের মুজাতাহিদ হওয়া উচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : তারবিয়্যাতের পথ অত্যন্ত নাযুক ও সংবেদনশীল পথ। এতে অনেক সময় শাইখ তারবিয়্যাত সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করেন। এমন পন্থায় তারবিয়্যাত করেন যে, সেটা কিতাবে বর্ণিত থাকে না।

এ প্রসঙ্গেই হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. এর ঘটনা। তাঁর খেদমতে একজন মুরীদ থাকত। এই মুরীদের অবস্থা ছিল এই যে, হযরতের খেদমতে শরয়ী দাসী যখন খানা নিয়ে আসত। তখন ঐ মুরীদ সেই দাসীকে আগ্রহ ভরে দেখত।

একবার হযরত আত্তারও রহ. মুরীদটাকে বদনেগাহী করা অবস্থায় দেখে ফেললেন। প্রথমে তো মনে করেছেন এটা কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু যখন বারবার ঐ মুরীদকে সেই দাসীর দিকে তাকাতে দেখলেন তখন হযরত বুঝতে পারলেন যে, এর মধ্যে কুদৃষ্টির স্বভাব আছে।

সুকৌশলে তিনি এর চিকিৎসা করলেন। ঐ দাসীকে ডায়রিয়ার ঔষধ দিলেন। (হযরত কিছুটা ডাক্তারও ছিলেন) আর ঘরে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিলেন যেন তার ডায়রিয়া একটি পাত্রে জমা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে খুব

ডায়রিয়া হল। আর তার সুশ্রী রং ও রূপে ভাঙ্গন দেখা দিল। কেননা ডায়রিয়ার প্রতিক্রিয়াই এটা যে, এর দ্বারা সৌন্দর্য খতম হয়ে যায়।

পরে যখন সে দাসী খানা নিয়ে আসল আর মুরীদ তাকে দেখল, তখন মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ এখন আর সেই নজরকাড়া সৌন্দর্য অবশিষ্ট নেই। দেখতে কুশ্রী হয়ে গেছে। পীর ছাহেবও তার মুখ ফিরিয়ে নেয়া প্রত্যক্ষ করলেন। দাসী চলে যাওয়ার পর শাইখ নির্দেশ দিলেন সেই পায়খানা ভরা পাত্র আনার জন্য। ফলে সেই পাত্র যা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল আনা হল। আর মুরীদকে বলা হয় এর উপর থেকে কাপড় উঠাতে। নির্দেশ অনুযায়ী কাপড় উঠানোর পর নাকে দুর্গন্ধ এসে লাগল। মুরীদ নাক বন্ধ করে নিল। শাইখ বললেন : নাক বন্ধ কর কেন? দেখ ভাল করে দেখ। এটা তো তোমার মাহবূবা। কেননা এই দাসী যাকে তুমি বারবার দেখতে এই পায়খানা ছাড়া তার মধ্যে আর কী আছে? বুঝা গেল যে, এই পায়খানাই তোমার মাহবূবা। যদি দাসীর সত্তা তোমার মাহবূবা হত তাহলে তো ঐ দাসী এখনো বিদ্যমান। যাকে দেখে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। এসব কথা শুনে ঐ মুরীদ খুব লজ্জিত হল। আর বলল : হযরত! আমার ভুল বুঝে এসেছে। আমি তাওবা করছি। আগামীতে আমি এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকব।

তাহলে দেখুন কত সুন্দর কৌশলে হযরত ঐ মুরীদের কুদৃষ্টির চিকিৎসা করলেন।

এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, নিজেকে শাইখের কাছে পুরোপুরি সোপর্দ করে দেয়া উচিত। যাতে তিনি মন মত মুরীদকে কাজে লাগাতে পারেন। এবং তার সংশোধন করে তাকে দরবারে খোদাওন্দীর যোগ্য বানাতে পারেন।

১২০. নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া তারবিয়্যাতের অনিবার্য ফসল

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দান করা ইসলাহ প্রত্যাশীদের জন্য ওয়াজিবতুল্য কাজ। সে খুবই

কাঁচা মুরীদ যার মধ্যে তার মুসলমান ভাইয়ের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি। এটা ভাবা উচিত যে, যদি এই বিপদ আমার উপর আসত তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হত? অতএব স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের কষ্টও সহ্য করা উচিত। এগুলো সুলূকের মাসআলা। খানকাহবাসীদের এ কথাগুলো খুব মনে রাখা উচিত। এবং সময় মত যাচাই বাছাই করা উচিত।

নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দানের এ ব্যাপারটি কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয় মজলিসে অন্যদের জন্য স্থান সংকুলান করে দাও, তখন স্থান সংকুলান করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।" (সূরা মুজাদালাহ : ১১)

এই আয়াতে কারীমার শানে নুযূল বা অবতরণ প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই যে, একবার কয়েকজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে আসহাবে বদর তাশরীফ নিয়ে আসলেন। যেহেতু মজলিসে স্থান সংকীর্ণতা ছিল। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে বললেন যে, তোমরা স্থানকে প্রশস্ত করো, অর্থাৎ পরস্পরে মিলেমিশে বসো। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. মিলেমিশে বসে গেলেন। এতেও যখন স্থান সংকুলান হল না। তখন কয়েকজন সাহাবীকে বললেন : তোমরা মজলিস ছেড়ে উঠে চলে যাও। ফলে মুখলিস সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন উঠে চলেও গেছেন। কিন্তু যারা মুনাফিক ছিল, তারা আপত্তি উত্থাপন করতে লাগল যে, "এটা কোন্ ইনসাফ"? যারা পরে আসল তাদেরকে বসার সুযোগ দেওয়া হল আর যারা পূর্ব থেকেই বসে আছে, তাদেরকে উঠিয়ে দেয়া হল।

এই প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়। যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজকে সম্পূর্ণ সঠিক আখ্যায়িত করা হয়। এবং সব সময়ের জন্যই এই নীতি বানিয়ে দেয়া হয়।

এই হল আয়াতে কারীমার অবতরণ প্রেক্ষাপট ও তার ভাবার্থ।

এর থেকে নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দানের মাসআলা এভাবে বের হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলার উপর ভিত্তি করে নিজ স্থান অন্যদেরকে দিয়ে দিয়েছেন আর নিজে উঠে গিয়েছেন। এটাই হল إيثار বা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাযি. তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশেক ছিলেন। আর আশেক বা প্রেমিক কি কখনো মাশূক বা প্রেমিকার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে? কিন্তু অন্যের খাতিরে এই বিচ্ছেদ সহ্য করে নিয়েছেন।

এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, মহব্বত খুব ইখলাসের সাথে হওয়া চাই। যাতে কারো প্রণোদনা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। নতুবা সামান্য প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। শাইখের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

হযরত উসমান হারূনী রহ. এর ঘটনা। একবার তিনি সফরে ছিলেন। সঙ্গে তাঁর চার মুরীদ। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.। চলতে চলতে হযরত উসমান হারূনী একটি মন্দিরে ঢুকে পড়েন এবং বসে পড়েন। সেখান থেকে বের হওয়ার পর দেখেন যে, তিনজন পালিয়ে গেছেন। শুধুমাত্র হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী বিদ্যমান। হযরত উসমান হারূনী রহ. জিজ্ঞেস করলেন : ঐ তিনজন কোথায়? খাজা ছাহেব রহ. উত্তর দিলেন : তারা তো এটা বলতে বলতে চলে গেল যে, আমরা তো আমাদের ঈমানকে তাজা ও দৃঢ় করার জন্য এসেছিলাম। অথচ এখন দেখছি ঈমান রক্ষা করাই কঠিন।

দেখুন! এই তিনজন নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু খাজা ছাহেব রহ. অটল ছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস সবাই জানি। খাজা ছাহেব রহ. কে মহান আল্লাহ কোন্ মাকামে পৌঁছিয়েছেন।

এমনিভাবে মুরীদের এ অধিকার নাই যে শাইখের মুরীদদের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে অভিযোগ করবে। যেমন রোগীর এ অধিকার নাই যে, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের উপর এ বলে অভিযোগ করা যে, আমারও জ্বর। আর অন্যান্য রোগীদেরও জ্বর ছিল। অথচ ডাক্তার সাহেব আমার জন্য গুল্‌বনাফ্‌শাঁ (ঔষধ বিশেষ) লিখেছেন ১ মাশা। আর অন্য রোগীদের জন্য লিখেছেন এর থেকে কম। এর মধ্যে কী রহস্য?

১২১. হযরত আদম আ. এর ভুলের উপর স্বীয় গুনাহের তুলনা করা অনুচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : বর্তমান যুগে এমন মুসলমানও আছে, যারা বলে : আমাদের দ্বারা গুনাহ্ হলে এমন কী সমস্যা? আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আ. থেকেও তো গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। তাওবা। তাওবা। 'কুফরের নকল কুফর নয়' সে হিসেবে কথাটা উল্লেখ করলাম। এসব মানুষের নিজ ঈমানের ফিকির করা উচিত।

নবী এবং গুনাহ্ এ দুটো বস্তু এক সাথে কিভাবে হতে পারে? উভয়টার মধ্যে পরিষ্কার বৈপরীত্য। যেমনিভাবে দিন ও রাত এক সাথে জমা হতে পারে না। অনুরূপভাবে নবুওয়াত ও গুনাহ্ও এক সাথে জমা হতে পারে না। নবী তো হন মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত বান্দা। আর যুক্তির দাবিও এটাই যে, তাকেই নির্বাচিত করা হয় যে নিজ ইলম অনুযায়ী নির্বাচনকারীর বিরোধিতা না করে।

উপরন্তু এটাও যুক্তির দাবি যে, যেহেতু মহান আল্লাহর ইলম শাশ্বত ও চিরন্তন, সেহেতু মহান আল্লাহ্ এমন কোন ব্যক্তিকে পয়গাম পৌঁছানোর জন্য কিভাবে পাঠাতে পারেন যার দ্বারা কোন এক সময় গিয়ে গুনাহ প্রকাশিত হবে। কারণ গুনাহ তো বলাই হয় জেনে বুঝে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করা।

আর আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. এর দ্বারা যেসব ভুল হয়েছে, সবগুলোই অনিচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত কোন ভুল তাঁরা করতেই পারেন না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

অর্থাৎ "আমি ইতোপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গেল। এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা।"

(সূরা তোয়াহা : ১১৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

অর্থাৎ "আর এভাবে আদম নিজ প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল ও বিভ্রান্ত হল"। (সূরা তোয়াহা : ১২১)।

এখানে عصيان ও غوايه তথা অমান্য করা ও বিভ্রান্ত হওয়ার পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং অন্য অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অন্যায় হয়ে যাওয়া। দেখুন হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর বায়ানুল কুরআন।

মোটকথা হযরত আদম আ. এর অনিচ্ছাকৃত ভুলের উপর আমাদের ইচ্ছাকৃত গুনাহকে তুলনা করা মহা অন্যায় কাজ।

১২২. মুরীদদের পরীক্ষা নেয়ার কারণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : পূর্বের যুগের মাশায়িখ হাযারাত মুরীদদের বড়বড় পরীক্ষা নিতেন। এর মধ্যে হেকমতও ছিল। মুরীদের আস্থা ও ভক্তি যাচাই বাছাই করা হত। আর যাচাইয়ের প্রয়োজন এজন্য ছিল যেহেতু কোন কোন সময় সুলূকের পথে এমন শিক্ষাও দিতে হয় যা কখনো বুঝবুদ্ধির বিপরীত আবার অনেক সময় বাহ্যিক শরীয়ত এর বিপরীত হয়। এজন্য শুরুতেই তার দৃঢ়তা দেখে নিতেন যাতে করে প্রত্যেক শিক্ষার ব্যাপারে তাকে বুঝাতে না হয়। আর ঐ মুরীদের অন্তরেও যেন কোন খট্‌কা না থাকে।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা। দুজন মানুষ তাঁর কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য আসল। তিনি বললেন : আচ্ছা অবস্থান করো। এক রাতে ঐ দুই মুরীদকে বললেন : অমুক মহিলার সাথে আমার সম্পর্ক। তাকে রাত্রে গিয়ে আমার

কাছে ডেকে আনবে। ফলে রাত্রে এদের মধ্যে একজন ঐ মহিলাকে ডেকে আনল। ঐ মহিলাটি সারারাত শাইখের কাছে থেকে সকালে চলে গেল।

শাইখ তাঁর নতুন মুরীদকে বললেন : তুমি কী করছ? আরয করলেন : আপনার গোসলের জন্য পানি গরম করছি। শাইখ বললেন : তোমার ঐ সাথী কোথায় যে তোমার সাথে এসেছিল? মুরীদ বলল : সে তো একথা বলতে বলতে চলে গেছে যে, ইনি আবার কেমন শাইখ যে রাত্রে নারীর সঙ্গে সময় কাটায়?

শাইখ বললেন : তাহলে তুমি গেলে না কেন? মুরীদটি বলল : হযরত! আমি আপনাকে মানুষ মনে করে এসেছি। ফেরেশতা মনে করে আসিনি। ভুল মানুষের হতেই পারে। তাওবার পানি দ্বারা সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

শাইখ খুশী হয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁকে মুরীদ করে নিলেন। অতঃপর বললেন যে, ঐ মহিলাটি ছিল আমার স্ত্রী। আমি তাঁকে বলে দিয়েছিলাম : "রাত্রে তোমাকে আমার অমুক মুরীদ নিতে আসবে। তুমি তার সাথে আমার কাছে চলে আসবে।"

অতঃপর শাইখ মুরীদকে বললেন : আমি এমনটি এ জন্যই করেছি, যাতে তোমার ভক্তি ও দৃঢ়তা সম্পর্কে জানতে পারি। প্রত্যেকবার গুঢ়তত্ত্ব কে বোঝাবে?

তো মুরীদ হয়ে শাইখের ব্যাপারে মন্দধারণা পোষণ করা অথবা অন্তরে মন্দ ধারণা আসার পরও আতংকিত না হওয়া বরং উত্থান পতন হতে থাকা, এটা কম মুনাসাবাত বা মুনাসাবাত না থাকার আলামত।

শাইখ যেহেতু ইসলাহে বাতেনী, আখলাকের পরিশুদ্ধি, বলা-বসা ইত্যাদিও শেখান। এজন্য অসমীচীন কথার উপর সতর্ক করেন।

জনৈক মুরীদ শাইখের ছাহেবযাদাকে আওয়ায করে ডাকলেন। ভদ্র ভাষা ব্যবহার করেননি। ফলে শাইখ তাকে সতর্ক করলেন, এবং বললেন : তুমি এখনো পর্যন্ত কথাও শিখলে না যে, কার সাথে কিভাবে আওয়ায করতে হয়। কাকে আওয়ায দিতে হয় কিভাবে দিতে হয় ইত্যাদি।

তাহলে দেখুন নিজ ছেলের সাথেও কথাবার্তার আদব শিখিয়েছেন। এখানে নিজ ছেলেকে সম্মান করা বড় কথা নয় বরং ঐ মুরীদ যে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য এসেছে। তাকে কথাবার্তার আদব শেখানোই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

আর বারবার সতর্ক করার পরও যদি কেউ না মানে, তাহলে শাইখ তাকে বের করে দেন। এই বের করে দেওয়াটাও তার সংশোধনের জন্য হয়। তাকে অপমান করার জন্য নয়। যেমন- সেনাবাহিনীতে প্যারেড করানো হয়। সম্ভবত আপনারা সেটা দেখেছেন। এখানে এক সাথে পা উঠানো হয় এক সাথে পা রাখা হয়। সবার বন্দুক এক নিয়মে রাখা থাকে। সামান্য বাঁকা হলে প্রশিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করে ও সোজা করে দেয়। আর যদি বারবার শেখানোর পরও না মানে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাতার থেকে বের করে দেয়া হয়। এরপর কিছুক্ষণ পরে দাঁড় করায়।

তো যেমনিভাবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কাতার সোজা করার জন্য সতর্ক করা ও বের করার অধিকার আছে। তেমনিভাবে শাইখ অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য সতর্কও করেন। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী বেরও করে দেন।

কাতার সোজা করার উপর একটি কথা মনে পড়ল। হাযারাতে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. জিহাদ এর জন্য কাতার সোজা করার ব্যাপারে স্বতন্ত্র কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। বরং এটাকে নামাযের কাতার সোজা করা থেকে শিখেছিলেন। অনুরূপভাবে আমীর ছাহেবকে মান্য করা জিহাদের মধ্যে অত্যন্ত জরুরী। সেটাও তাঁরা নামায থেকেই শিখেছেন। কেননা নামাযের মধ্যেও ইমাম ছাহেবের অনুসরণ জরুরী। প্রতিটি রুকন ইমামের সাথে সাথে আদায় করা অপরিহার্য। আগেও না, পরেও না। এমনকি শেষ বৈঠকে যদি মুক্তাদী দুরূদ শরীফ পড়ার পূর্বে ইমাম ছাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেলেন, তাহলে ইমামের অনুসরণকল্পে মুক্তাদীকেও সালাম ফিরাতে হবে। তো জিহাদে কিতালে ইমাম ও আমীরের অনুসরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

এখান থেকেই আরেকটি কথা বুঝে আসল যে, ছোটর জন্য বড়র অনুসরণ জরুরী। চাই তিনি ঘরের মধ্যে বড় হন অথবা প্রতিষ্ঠানের বড়। তাইতো প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম ঐ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথা মানা জরুরী। কোন ইন্তিযামী কাজ তাঁর নির্দেশনা ছাড়া হতে পারে না।

সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) মধ্যে এই সমস্ত আখলাক নামাযের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এসে গেছে। তাঁদের অন্য কোন স্থানে স্বতন্ত্র শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন পড়েনি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে যেসব বিধিবিধান শিখিয়েছেন, পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে সেগুলোর আলোচনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিসে হতে থাকত। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. চুপচাপ সেগুলো শুনতে থাকতেন। ব্যস এটাই তাঁদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে।

১২৩. যুদ্ধের দুটি কৌশল কুরআনে পাক শিখিয়েছে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : তলোয়ার এর দুটি কৌশল কুরআনে পাক শিখিয়েছে। তাইতো ইরশাদ হয়েছে :

فَاضۡرِبُوۡا فَوۡقَ الۡاَعۡنَاقِ وَ اضۡرِبُوۡا مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٍ ﴿۱۲﴾

“সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত করো এবং তাদের আঙ্গুলের জোড়াসমূহেও আঘাত করো।” (সূরা আনফাল : ১২)

কারণ ঘাড় ভেঙ্গে গেলে আর কী থাকল? এজন্য ঘাড়ে আঘাত করতে হবে। আর আঙ্গুলের জোড়াসমূহেও আঘাত করতে হবে। কারণ যখন সেটা কেটে যাবে তখন হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাবে। ফলে তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

বর্তমানে যেসব লড়াই হচ্ছে সেটা হল নারীসুলভ যুদ্ধ। অর্থাৎ চোরাগোপ্তা হামলা। পুরুষালী লড়াই হল তলোয়ারের লড়াই। এজন্য মহান আল্লাহ এরই কৌশল শিখিয়েছেন। মুরব্বীর কাজ হল শুধু মূলনীতি বাতলে দেয়া। অন্যান্য শাখাপ্রশাখাগত ব্যাপারগুলো সেটারই অনুগামী হয়। এজন্যই এ দুটি কৌশল যা মূলনীতিও বটে বাতলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইসলাহে বাতেনের ক্ষেত্রে মূল হল দুনিয়ার মহব্বত। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে : حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ “দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত অনিষ্টের মূল”। (শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ১০০১৯)

অবশিষ্ট অন্যান্য জিনিস যেমন সম্পদের মোহ, পদের মোহ, গোস্বা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ ইত্যাদি হল শাখা। যখন দুনিয়ার মহব্বত বের হয়ে যাবে তখন ঐসব ব্যাধিগুলোই বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বুঝা গেল যে, মুহাক্কিক ও মুরব্বী মূলনীতি শিক্ষা দেন। তাই এটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

১২৪. দুনিয়ার মহব্বতের মূল হল অহংকার

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মূল রোগ হল দুনিয়ার মহব্বত। অবশ্য এর অনেক শাখা প্রশাখা আছে। এর মধ্যে বড় শাখা যাকে “কান্ড” বলা হয় সেটা হল অহংকার। অন্যান্য ব্যাধি যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, গোস্বা ইত্যাদি হল অহংকারের শাখা। যদি কান্ড কেটে দেয়া হয় তো যেমনিভাবে শাখাপ্রশাখাসমূহ কেটে যায়, তেমনিভাবে গোড়াও দুর্বল হয়ে পড়ে।

তো সংশোধনযোগ্য ব্যাধি মূলত অহংকার। এটা বের হয়ে গেলে ইসলাহ বা আত্মশুদ্ধি খুব সহজ। এজন্যই পীর মাশায়িখ তালিবের ভেতর হতে অহংকার বের করার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে ফিকির করেন। কখনো কৃত্রিম গোস্বার ভাব করেন। উদ্দেশ্য একটাই যেন সালিক বা আল্লাহর পথের পথিকের অন্তর থেকে অহংকার বের হয়ে যায়।

১২৫. কথা কম বলা সুলূকের অপরিহার্য বিষয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সুলূকের এটাও একটা মাসআলা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলার খুব বেশি প্রয়োজন না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কথা না বলা। যেটাকে ‘তাকলীলে কালাম’ বলে।

এটা কুরআনে কারীমের ঐ আয়াত দ্বারা বুঝে আসে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ﴿۷۰﴾

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।” (সূরা আহযাব-৭০)

আর এই অবস্থা খামুশ থাকা ছাড়া হাসিল হয় না। কারণ যে ব্যক্তির সবসময় কথা বলার অভ্যাস, সে বলার ক্ষেত্রে কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবে?

বলার মধ্যে সতর্কতা ও 'কাওলে সাদীদ' তথা সঠিক কথা ঐ সময়েই হতে পারে, যখন সে বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। এটাকেই হাদীসে পাকে বলা হয়েছে : مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَالَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা।"

(তিরমিযী শরীফ ২ : ৫৫)

অনর্থক কথা বলতে বুঝায় যার মধ্যে দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন ফায়েদা নেই। তো এই অবস্থা কথা কমানো ব্যতীত হাসিল হতে পারে না।

অতএব কুরআন ও হাদীস হতে কথা কম বলার মাসআলা প্রমাণিত হল। বুঝা গেল যে, তাসাওউফের মাসায়িল কুরআন ও হাদীস থেকেই বের করা হয়েছে।

এই আয়াতে পাকে আমল সংশোধনের পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে একটি কলব বা দিলের সাথে সম্পৃক্ত। আর অপরটি যবান বা মুখের সাথে সম্পৃক্ত। দিলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হল তাকওয়া। কেননা 'তাকওয়া' দিলে বা অন্তরে থাকে।

তাকওয়ার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلتَّقْوٰى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلٰى صَدْرِه

অর্থাৎ "তাকওয়া হল এ স্থানে"। এটা বলার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সীনা মুবারকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(তিরমিযী শরীফ ২ : ১৫)

যবানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হল বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। চিন্তাভাবনা করে কথা বলবে। পরিণতিতে মহান আল্লাহ তোমার আমল সুন্দর করে দিবেন আর কোন গুনাহ হয়ে গেলে মাফ করে দিবেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ মূলনীতি বয়ান করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে বিশাল সফলতা অর্জন করবে। আল্লাহ বলবেন : হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার আনুগত্যস্বরূপ তাকওয়া অবলম্বন করেছ। যবানের হেফাযত করেছ। অতএব আযীমুশ শান কামিয়াবী তোমরা দুনিয়াতেও হাসিল করবে এবং আখেরাতেও হাসিল করবে।

দুনিয়াতে কারো সাথে কোন লড়াই ঝগড়া হবে না। আর আখেরাতে সামান্য অপদস্থতারও সম্মুখীন হবে না। এজন্যই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. মাঝে মধ্যে যবানকে ধরে বলতেন :

هٰذِه اَوْرَدَتْنِى الْمَوَارِدَ

অর্থাৎ "এই যবান আমাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছে।"

দেখুন! হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি সিদ্দীকিয়্যাতের মাকামে পৌঁছে গেছেন, ইসলামের প্রথম খলীফা অথচ তিনি তাঁর যবানকে ধরে রেখেছেন। অনুমতি থাকলে হয়ত চোখে পট্টি বেঁধে বের হতেন। পা কে ল্যাংড়া আর হাত কে লুলা বানিয়ে ফেলতেন। কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দিতেন। যাতে করে গুনাহ প্রকাশ না পায়। কেননা এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাই গুনাহ প্রকাশ পায়। কিন্তু যেহেতু ইসলামী শরীয়তে কোন অঙ্গ কর্তন করার অনুমতি নেই, তাই হাত পা ইত্যাদি কর্তন করেননি বটে কিন্তু যবানকে হাত দ্বারা পাকাড়ও করেছেন। কেননা যবান ধরতে কোন অসুবিধা নেই।

আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনও অনর্থক কথা ও কাজ বর্জনের ব্যাপারে খুব যত্নশীল ছিলেন। এক বুযুর্গের ঘটনা। তাঁর ফোড়া উঠেছিল। আরেকজন বুযুর্গ তাঁর খোঁজখবর নিতে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন: কী ব্যাপার আপনাকে বাইরে দেখি না কেন? বললেন : ফোড়া উঠেছে। ঐ বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় উঠেছে? দ্বিতীয় বুযুর্গ খামুশ হয়ে গেছেন। কেননা অনেক সময় এমন স্থানে ফোড়া উঠে যেটা অন্যকে বলতে লজ্জা লাগে। এই বুযুর্গ বুঝতে সক্ষম হলেন যে, আমার প্রশ্নটি অনর্থক ছিল। ফলে বাসায় এসে ইসতিগফার করতে থাকলেন।

জনাব! যদি অনর্থক কাজের উপর ইসতিগফার করা না হয়, তাহলে গুনাহের উপর ইস্‌তিগফার কঠিন।

একটি কথা মনে পড়ল। যদিও শরীয়ত অনুমতি দেয়নি কিন্তু বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ পট্টির অনুমতি দিয়েছে। কেননা ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط

"আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।" (সূরা নূর : ৩০)

তো বেগানা মহিলা দেখা থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখা কেমন যেন চোখে পট্টি বাঁধা। এটাকেই আমি 'বাতেনী পট্টি' বলেছি।

১২৬. ইনসাফ ও অনুগ্রহের মধ্যে পার্থক্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আদলও ফযল তথা ইনসাফ ও অনুগ্রহের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'ইনসাফ' বলা হয় স্বীয় পাওনা তলব করা। কথার কথায় ঋণদাতা ব্যক্তি ঋণগ্রহীতাকে বলল : আমার ঋণ পরিশোধ কর, যেখান থেকে পার টাকা সংগ্রহ করে আমার ঋণ পরিশোধ কর।

আর আরেকটা হল 'অনুগ্রহ'। যেমন ঋণগ্রহীতা বলল : ভাই! আপনার টাকা আমি এ মুহূর্তে পরিশোধ করতে পারব না। যখন ব্যবস্থা হবে দিয়ে দিব। ঋণদাতাও তাকে অবকাশ দিয়ে দিল।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط

অর্থাৎ "আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়।" (সূরা বাকারাহ : ২৮০)

আমাদের হযরত থানবী রহ. বলতেন : এই অনুগ্রহের উপর স্রেফ ঐ ব্যক্তিই আমল করতে পারে, যার মধ্যে ভদ্রতা আছে। এ পর্যায়ে এসে একটি মাসআলা বলছি। ঋণ দুপ্রকার : একটা হল ঐ ঋণ যা কোন জিনিসের পরিবর্তে ঋণ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ : দোকানদার থেকে কোন সদাই

নিল আর বলল যে, আমি একমাস পর পয়সা দিব। এই করয বা ঋণের বিধান হল সময়ের পূর্বে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে চাইতে পারবে না।

আর দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ হল ঐ ঋণ যেটা নিজের প্রয়োজনে কারো থেকে নেয়া হয়েছে। এর বিধান হল : এখানে কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। যদি ১ মাসের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে, তাহলে ঋণদাতা ঐ সময়ের পাবন্দ নন। তিনি চাইলে দ্বিতীয় দিনেই চাইতে পারেন।

এটা ছিল মাসআলার ব্যাপার। যা আরয করে দেয়া হল।

আমি যে কথা বলছিলাম : ঈমানের চাহিদা কি? ইনসাফ নাকি অনুগ্রহ?

এবার দ্বিতীয় কথাটি বুঝুন। মহান আল্লাহর নিকট সবসময় ফযল বা অনুগ্রহের দরখাস্ত করা উচিত। আদলের দরখাস্ত করা অনুচিত। কেননা আদলের সাথে আমরা পৃথিবীতে থাকতে পারব না। এক কদমও এদিক সেদিক হাঁটতে পারব না, বরং ধ্বংস করে দেয়া হবে। এজন্য আমাদের সাথে মহান আল্লাহর যে মুআমালা বা আচরণ হচ্ছে সেটা 'ফযল' তথা অনুগ্রহের সাথেই হচ্ছে। তো যখন মহান আল্লাহ আমাদের সাথে ফযলের মুআমালা করছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হল অন্যদের সাথেও অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা।

এ প্রসঙ্গেই এখানে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, পরকালে মহান আল্লাহ কাফেরদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন আর মুমিনদের সাথে করবেন অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ। কেননা কাফেরগণ অনুগ্রহের পাত্র নয়।

কোন কোন মুসলমানের মনে এমন সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, কাফেরদেরকে তো দুনিয়াতে অনেক কিছু দেয়া হয়। সম্পদও দেয়া হয়। সাম্রাজ্যও দেয়া হয়। দৌলত ও ইযযতও দেয়া হয়। এমনটি কেন? এটার উত্তর স্বয়ং কুরআনে পাকে এভাবে দেয়া হয়েছে:

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ

অর্থাৎ "যারা কুফর অবলম্বন করেছে। দেশে দেশে তাদের (সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন আপনাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। (এটা) সামান্য ভোগ (যা তারা লুটছে) অতঃপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর তা নিকৃষ্টতম বিছানা।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৬-১৯৭)

এ আয়াতে কারীমায় দুটি উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রথমত দুনিয়ার প্রাচুর্য আখেরাতের মোকাবেলায় কিছুই নয়। বাহ্যত: যত কিছুই হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত দুনিয়াদারীর কাজে মুসলমানকে মাল না দেয়া এটা মহান আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) আর কাফেরকে সম্পদ দেয়া হল আদল (ইনসাফ) কেননা রায্যাক তো একমাত্র তিনিই। তিনি নিজ শানে রাযযাকিয়্যাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। এছাড়া আখেরাতে তো কাফেরদের কোন অংশ নাই। তাই যা দেয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে করে ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ হয়।

এখন থাকল এ প্রশ্ন যে, মুসলমানের জন্য ফযল বা অনুগ্রহ কেন? এর কারণ হল পার্থিব সম্পদের বিশেষত্ব হল মানুষ এর কারণে ফেতনায় পতিত হয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি থেকে পিছিয়ে পড়ে। সে হিসেবে মুসলমানকে সম্পদ না দেয়া অথবা কাফেরের তুলনায় কম দেয়া এটা মুসলমানের প্রতি "ফযল" তথা অনুগ্রহ। যার প্রমাণ হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ. এর ঘটনার ঐ অংশ যেখানে আছে, এক সঙ্গে থাকার শর্তসমূহের পর যখন হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির এক সঙ্গে চললেন, তখন শিশুদের মধ্যে একটি শিশু খেলছিল। হযরত খাযির আ. ঐ শিশুটিকে ধরে গলা টিপে মেরে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা আ. বললেন :

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ

"আপনি কি একটা নির্দোষ জীবননাশ করলেন, যে কিনা কারও জীবননাশ করেনি"? (সূরা কাহ্ফ : ৭৪)

এই প্রেক্ষিতে হযরত খাযির আ. বললেন : আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না?

পরবর্তীতে হযরত মূসা আ. এর নিকট এর হেকমত বয়ান করে হযরত খাযির আ. বলেন :

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ﴿۸۰﴾

অর্থাৎ "আর বালকটির ব্যাপার এই যে, তার মাতাপিতা ছিল মুমিন। আমার আশংকা হল, সে কিনা তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফুরীতে ফাঁসিয়ে দেয়"। (সূরা কাহ্ফ : ৮০)

এজন্য আমি তার সাথে এ আচরণ করেছি।

তাহলে দেখুন! বাহ্যিকভাবে তো শিশুটিকে হত্যা করা অত্যন্ত দুঃখজনক। ক্ষতিকর একটি ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে পিতামাতার ঈমান হেফাযতের ব্যাপার ছিল। এজন্য এটাকে পিতা মাতার ক্ষেত্রে কল্যাণকর বলা হয়েছে। আর এটাই "ফযল" বা অনুগ্রহ।

অতএব প্রমাণ হল যে, দুনিয়াবী ক্ষতি মুমিনের জন্য অনুগ্রহের বস্তু।

এটা কথাপ্রসঙ্গে এসে গেল। মূল আলোচনা চলছিল যখন আমরা মহান আল্লাহর নিকট ফযল চাই, আদল চাই না। সে ক্ষেত্রে আমাদের পৌরুষ ও বীরত্ব তখনিই প্রমাণিত হবে যখন আমরা মাখলূকাতের সাথে ফযল বা অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করব। এটা ভীরুতা ও কাপুরুষতা যে, সবসময় আদল (ইনসাফ) আর আদলের উপরই থাকব। তবে হ্যাঁ যদি কারো দায়িত্বে ব্যবস্থাপনাগত কোন ব্যাপার সোপর্দ করা থাকে, তাহলে তাহকীকের পর অপরাধীর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। নতুবা ইনতিযাম ঠিক থাকবে না। যদি চোর চুরি করে আর সেটা প্রমাণিতও হয় এদিকে চোর বলছে : মাফ করে দিন। আগামীতে চুরি করব না। এখন ব্যবস্থাপক ছাহেব বলছেন : ভাই মাফ করে দাও। তো এমন ব্যবস্থাপনা টিকবে না।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. এর যুগে একজন অভিযোগ করল যে দিল্লীর ব্যবস্থাপনা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হযরত বললেন : "ছাহেবে খেদমত নরম মেযাজের, এটা সেটারই প্রতিক্রিয়া।" জিজ্ঞাসা করা হল : কে? বললেন : অমুক তরমুজওয়ালা। জামে মসজিদে তরমুজ বিক্রি করে। এই লোকটি ঐ তরমুজওয়ালার কাছে গেল। তরমুজ কিনল। কেটে কেটে চেখে চেখে দেখল। চেখে বলতে লাগল : এটা তো পান্‌সে। তরমুজওয়ালা বুযুর্গ বললেন : ঠিক আছে ভাই রেখে যাও। সে চলে গেল।

শাহ ছাহেব রহ. এর নিকট পুরো ঘটনা শোনালেন। এবং আরয করলেন : হযরত! বাস্তবিক পক্ষেই তিনি খুব নরম মেযাজের মানুষ।

কিছুদিন পর এই ব্যক্তিই দেখলেন যে, দিল্লীর ব্যবস্থাপনা অনেক ভাল হয়ে গেছে। উনি পুনরায় শাহ ছাহেবকে বললেন ; এখন দিল্লীর ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর হয়ে গেছে। হযরত শাহ ছাহেব রহ. বললেন : জ্বী হ্যাঁ ছাহেবে

খেদমত পরিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমানে যিনি ছাহেবে খেদমত তিনি অত্যন্ত কড়া মেযাজের মানুষ। ইনি ভিস্তিওয়ালা। কাঁধে মশক নিয়ে পানি বিক্রি করেন। এই ব্যক্তি সেখানে পৌঁছলেন। এক গ্লাস পানি চাইলেন। বললেন : "প্রতি গ্লাস এক টাকা। প্রথমে টাকা দাও। এরপর পানি দিব"। ইনি পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন। তিনি পানি দিয়ে দিলেন। সেটাতে তৃণলতা বা ঘাসের একটা টুকরা ছিল। তিনি পানি ফেলে দিয়ে বললেন : এতে তৃণলতা আছে। দ্বিতীয় গ্লাস দিন। ভিস্তিওয়ালা কোমরে একটি থাপ্পড় মেরে বললেন : দ্বিতীয় টাকা দাও। তবেই দ্বিতীয় গ্লাস পাবে। আমাকেও কি তরমুজওয়ালা ভেবেছ নাকি?

তো ব্যাপার হল দুটো। একটা হল ব্যক্তিগত আর আরেকটা হল ব্যবস্থাপনাগত। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অধিকাংশ সময় ফযল বা অনুগ্রহের আচরণ করতে হবে। আর ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপারে অধিকাংশ সময় আদল তথা ইনসাফ বা ন্যায়ের উপর থাকতে হবে। যেমন পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর সাথে আদলের মু'আমালা করাই উচিত নয়। বরং ফযলের মু'আমালা করা উচিত। স্ত্রী তোমার পকেট থেকে চারটা টাকা বের করলে সেটার আর আলোচনা করো না। বরং চিন্তা কর, সে চার টাকা কেন বের করল? মনে হয় তুমি তাকে অভাবের মধ্যে রেখেছ। তার জন্য মাসিক হাতখরচ নির্ধারণ করনি। আর যদি নির্ধারণ করেও থাক, তাহলে নিশ্চয়ই তার থেকে ঐ বিশেষ অর্থের হিসাব কিতাব নিয়ে থাক। যদ্দরুন স্ত্রী বিরক্ত হয়ে এখন তোমার পকেট থেকে টাকা বের করা আরম্ভ করেছে।

নতুবা সামাজিকতার মাসআলা হল : স্ত্রীকে প্রতি মাসে তাঁর হাতখরচ বাবদ কিছু টাকা পৃথকভাবে দেয়া উচিত। সেটার হিসাবও নেয়া উচিত নয় যে, কোথায় খরচ করেছে?

তো ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপারে আদলের প্রয়োজন হয়। আমি আপনাদের সাথে ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপারে কথা বলছি না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথাবার্তা বলছি। যেখানে ফযলের আচরণ কাম্য।

এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এটা আদল। এর থেকে বেশি নফল আদায় করা হল ফযল। এই কামরাতেই কয়েকজন থাকেন। কেউ আপনাকে বেকুব বলল! তো আদল হচ্ছে এটাই যে, আপনিও তাকে এ

শব্দই শুনিয়ে দিবেন। কিন্তু ফযল হচ্ছে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ

"আর মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে, তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায়।" (সূরা শূরা : ৪০)

দেখুন যদিও এ আয়াতে কারীমায় সমান সমান প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু প্রতিশোধ নেয়াকে ওয়াজিব বলা হয়নি। বরং ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রথমত সমান সমান প্রতিশোধ নেয়া এটাই তো অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেননা সমান সমানের অর্থ হচ্ছে : কেউ তোমাকে ঘুষি মারলে তুমিও ঐ পরিমাণ জোরে তাকে ঘুষি মারবে। কিন্তু কেউ কি একটি ঘুষির উপর ক্ষান্ত থাকতে পারে? বরং প্রথমে তো তাকে মাটিতে ফেলবে। এরপর ঘুষির উপর ঘুষি মারবে। তবেই না গোস্বা একটু ঠান্ডা হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ অন্যকে "উল্লু" (বোকা) বলে গালী দেয়। আর অপরজন বলে "উল্লু কা পাঠ্‌ঠা" (নেহাৎ বেকুব) তাহলে এটা সমান সমান হবে না। বরং যুলুম হয়ে গেল।

খানকাহে আসার উদ্দেশ্য এটাই। যেন আমাদের যিন্দেগী আদল থেকে বের হয়ে ফযলের হয়ে যায়। ঈছার (নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান) এর জীবন হয়ে যায়। অন্যের সুখের জন্য নিজে কষ্ট সহ্য করার মন মানসিতা পয়দা হয়ে যায়।

ব্যস সালিক তথা আল্লাহর পথের পথিক অবস্থার ভাষায় এটাই বলছে যে, আমাকে এমন বানিয়ে দিন যেন আমি কারো উপর যুলুম তো দূরের ব্যাপার স্রেফ আদলই করব না বরং ফযল করব। ঈছার ও ভদ্রতা শিখব।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা আছে। তিনি গুড় খেতে পছন্দ করতেন। একদিন একজন মহিলা নিজ বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে আসল আর বলল যে হযরত! এ গুড় খুব বেশি খায়। আপনি দু'আ করুন যেন সে গুড় খাওয়া ছেড়ে দেয়। বুযুর্গ বললেন : আচ্ছা বেটি! কালকে এস, দু'আ করে দিব। ঐ

মহিলা দ্বিতীয় দিন আসল। তিনি দু'আ করে দিলেন। এবং নসীহত করে দিলেন : "বেটা! কখনো গুড় খাবে না। ক্ষতি করে।"

মহিলাটি চলে গেল।

ঐ সময় হযরতের অন্তরঙ্গ এক খাদেম জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! এ দু'আ তো আপনি গতকালও করতে পারতেন, আজকের জন্য স্থগিত করলেন কেন?

বুযুর্গ বললেন : যখন ঐ মহিলা দু'আ করাতে এসেছিল তখন আমিও গুড় খেতাম। দ্বিতীয় দিন আমি গুড় খাওয়া থেকে তাওবা করেছি। অতঃপর নসীহত করেছি। যাতে করে নসীহতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বলা বাহুল্য যে, এই বুযুর্গের গুড় খাওয়া নাজায়িয ছিল না। আবার নিশ্চয়ই তিনি এত বেশিও খেতেন না যা তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তো এত পুরনো একটি অভ্যাসকে শুধুমাত্র মহিলার সন্তানের জন্য দু'আর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা ঈছার إِيثَار নয় তো আর কি? এটাকে مروّت তথা সভ্যতা ভদ্রতা ও অভিজ্ঞতাও বলে।

তো আমি এ কথা বলছিলাম যে, মানুষ খানকাহে শুধু 'ছাহেবে আদল' বা ইনসাফওয়ালা হওয়ার জন্য আসে না বরং ঈছার ও মুরুওয়াত তথা সভ্যতাও ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আভিজাত্য শেখার জন্যও আসে।

শুধু মাদরাসায় থাকলে এটা হাসিল হয় না। বরং খানকায় থেকে এসব গুণাবলি অর্জন করতে হয়। আর এটার অনেক প্রয়োজনও আছে। এটা ছাড়া জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. এর নিকট কেউ একজন জিজ্ঞেস করল : হযরত! বুযুর্গদের অবস্থা কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় দেখতে চাই।

হযরত বললেন : অমুক মসজিদে তিনজন বুযুর্গ বসে আল্লাহ পাকের যিকির করছেন। তাঁদেরকে এক একটা থাপ্পড় মেরে দেখ। অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া বুঝতে পারবে।

ফলশ্রুতিতে এ ব্যক্তি ঐ মসজিদে পৌঁছল। আর একজন বুযুর্গকে মৃদু চপেটাঘাত করল। ফলে বুযুর্গ বসা থেকে উঠে ঐ পরিমাণ জোরেই তাকে

চপেটাঘাত করলেন এবং নিজ কাজে লেগে গেলেন। আর কিছুই বললেন না। এরপর দ্বিতীয় বুযুর্গকে চপেটাঘাত করলেন। তিনি এর দিকে চোখ উঠিয়েও দেখেননি। নিজ কাজে মাশগুল থাকলেন। অতঃপর তৃতীয় বুযুর্গকে চপেটাঘাত করলেন। তিনি এর হাত ধরে বললেন : আহারে! আমাকে মারতে গিয়ে তুমি হাতে ব্যথা পাওনি তো?

এসব দৃশ্য দেখে শাহ ছাহেব রহ. এর খেদমতে পৌঁছলেন এবং পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন। শাহ ছাহেব রহ. বললেন : প্রথম বুযুর্গ শরীয়তের উপর আমল করেছেন وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا "আর মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ।" (সূরা শূরা-৪০)

আর দ্বিতীয় বুযুর্গ তরীকতের উপর আমলকারী। মাকামে তরীকতে নিজের উপর নজর থাকে। অন্যের উপর নজর থাকে না। আর তৃতীয় বুযুর্গ হাকীকত বা বাস্তববাদী মানুষ। তিনি এটাই বুঝেছেন যে, এই চপেটাঘাত আল্লাহ তা'আলাই দিচ্ছেন। এজন্য স্বীয় দুঃখ ব্যথা ভুলে গেছেন। বরং উল্টো চপেটাঘাতকারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তাসাওউফের পরিভাষায় এটাকে فتوت ফুতুওয়াত বা মমত্ববোধ ও দানশীলতা বলে।

মোটকথা সালিককে একথা বুঝতে হবে যে, শরীয়ত-তরীকত ও হাকীকত এই সবগুলো তাকে অর্জন করতে হবে। হক্কানী পীর ছাহেবরা তাঁদের মুরীদদেরকে এমনটি বানানোরই ফিকির করেন। কিন্তু এর জন্য জরুরী হল শাইখকে বকাঝকার অনুমতি দিয়ে দেয়া যাতে করে তিনি স্বাধীনভাবে মুরীদদেরকে গড়তে পারেন। এজন্য আগেই বুঝে নিবেন আপনার মন মানসিকতা ও সহ্যক্ষমতা ইত্যাদি কেমন? সেই অনুযায়ী হক্কানী মাশায়িখ মুরীদদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন।

১২৭. মানুষ চার প্রকারের হয়। অদ্ভুত বিশ্লেষণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমার পীর ও মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেন : নেচারিয়্যতের বীজ বপন করেছেন স্যার সৈয়দ আহমাদ খান। স্যার সৈয়দ আহমাদ একবার নিজ বন্ধু পীরজী মুহাম্মাদ আরেফ আম্বীঠাবী কে এ পয়গাম দিয়ে গাঙ্গুহ পাঠালেন যে,

বর্তমানে মুসলিম জাতি দিন দিন অধঃপতনের পথে ধাবিত হচ্ছে। অন্যান্য জাতি উন্নতি করছে। আমি মুসলমানদের সফলতার জন্য একটি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। আপনিও যদি এতে শরীক হন, তাহলে সফলতা আরো দ্রুত আসবে।

ইনি স্যার সৈয়দের পয়গাম নিয়ে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং এ পয়গাম পৌঁছে দিলেন যে, স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ছাহেব বলেছেন : তিনি মুসলমানদের সফলতার জন্য একটি কলেজ খুলেছেন। যদি আপনিও এতে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন তাহলে কতই না ভাল হবে।

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. উত্তর দিলেন : আমার এসব বিষয়ে অতটা জানা শোনা নেই। আপনি মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানূতভীর রহ. সাথে কথা বলুন। তিনি রাযী হলে আমিও সঙ্গী হয়ে যাব।

মাওলানা নানূতভী রহ. এর সাথে কথাবার্তা হল। তখন তিনি বললেন : মানুষ মোট ৪ প্রকারের হয়।

১. আকলও পরিপূর্ণ, দ্বীনও পরিপূর্ণ।

২. দ্বীন পরিপূর্ণ কিন্তু আকল অসম্পূর্ণ।

৩. আকল পরিপূর্ণ কিন্তু দ্বীন অসম্পূর্ণ।

৪. আকলও অসম্পূর্ণ, দ্বীনও অসম্পূর্ণ।

তো আমি স্যার সৈয়দের দ্বীনের ব্যাপারে হামলা করতে চাই না। বরং তিনি যা কিছু করছেন মুসলমানদের উন্নতি ও সফলতার জন্য করছেন। কিন্তু তাঁর আকল পরিপূর্ণ নয়।

কেননা বিবেকের নীতি এটাই যে, মানুষ যে জিনিসের ভিত্তি রাখে শেষ পর্যন্ত সেটাই প্রবল হয়। আর স্যার সৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গি হল মুসলিম জাতির দুনিয়াবী উন্নতি। তো এই কলেজ দ্বারা দুনিয়াবী উন্নতি তো হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বীন বরবাদ হয়ে যাবে। যা বিশাল ক্ষতি। এরপরও আমি এ আন্দোলনে কিভাবে শরীক হতে পারি?

ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে সবাই দেখেছে এই কলেজের দ্বারা দুনিয়াবী উন্নতি তো অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের দ্বীনদারীর সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে নেচারিয়্যত বা প্রকৃতিবাদ এসে গেছে। অনেকে তো আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেছে।

১২৮. তালিবে ইলমদের চুল বড় রাখার ক্ষতি

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : বর্তমানে মাদরাসার অনেক তালিবে ইলমও বড়বড় চুল রাখছে। সুশ্রী বালকদের জন্য তো এটা বিলকুল জায়েযই নেই। যেসব শিক্ষকগণ একথা বলেন যে, এটা সৌন্দর্য। আর শরীয়ত সৌন্দর্যের অনুমতি দিয়েছে! সম্পূর্ণ ভুলকথা। অভিজ্ঞতার বিপরীত কথা। বর্তমানে ছেলেরা শুধুমাত্র অন্যকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই রাখে। যা সম্পূর্ণ হারাম।

হযরত থানভী রহ. এর ওখানে মাদরাসায় নিয়ম ছিল : প্রতি সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহ পরপর চুল মুন্ডন করতে হত।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই। যাতে ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

১২৯. প্রকৃত আদব ও বাহ্যিক আদবের পার্থক্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : অনেকে “আপনি” বলে সম্বোধন করলেও এমন লাগে যেন তীর মেরে দিয়েছে। আবার অনেকের “তুমি” বা “তুই” সম্বোধনও ভাল লাগে।

আমাদের হযরত থানভী রহ. একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। পানিপথের একজন বাসিন্দা একবার আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কোথা থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? বললেন : পানিপথ থেকে এসেছি। মৌলভী আশরাফ আলীর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আমি বললাম : আমিই আশরাফ আলী। তখন ঐ আগন্তুক বললেন : না তুমি নও। সে তো সাদা ছিল। আমি বললাম : তাহলে ইনি হবেন। মৌলভী হাবীবুর রহমান ছাহেব কীরানভী রহ. কুতুবখানায় বসে

লেখালেখির কাজ করছিলেন। আমি তাঁর দিকে ইশারা করলাম। বলতে লাগলেন : ইনিও নন। ইনি তো অনেক বেশি সাদা। (উল্লেখিত মৌলভী ছাহেবের গায়ের রং অনেক বেশি ফর্সা ছিল)। তখন আমি বললাম : আচ্ছা ইনিও না। আমিও না। তাহলে দেখুন ঐ যে রাজমিস্ত্রি কাজ করছে তাকেই জিজ্ঞেস করুন। তিনি গেলেন এবং রাজমিস্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। মিস্ত্রী বলল : উনিই তো আশরাফ আলী। যার সাথে আপনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন। এরপর ফিরে এসে বলতে লাগলেন : তুমি ত্রিশ বছর পূর্বে পানিপথ গিয়েছিলে। সেখানে ওয়ায করেছিলে। বড় সুন্দর ওয়ায করেছিলে। আমি বললাম : সেটা তো ছিল আমার যৌবনকাল। লালসাদা ছিলাম। এখন আর সেই দিন আছে?

ঘটনা বয়ান করার পর হযরতওয়ালা রহ. বলেন : উনি তুমি তুমি করে কথা বলছিলেন। আমারও মজা লাগছিল। কেননা মহব্বত করে বলছিলেন।

এই যে এই গ্রাম্য মানুষটার শুধুমাত্র একজন আল্লাহওয়ালা মানুষকে মহব্বত করে দেখতে আসাটা কী পরিমাণ মাকবূল হবে?

কোন কোন সময়ের আমল এমন হয় যা গুনাহের কাফফারা হয়।

তাইতো হাদীসে পাকে একটি ঘটনার কথা আছে। একবার একজন সাহাবী জনৈকা অপরিচিতা মহিলা কে চুমু দিয়ে বসলেন। পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন এবং আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। আমার দ্বারা এই ঘটনা ঘটেছে। সাহাবায়ে কিরামের রাযি. কৃতিত্ব তো এখানেই যে, মনুষ্য চাহিদায় কোন গুনাহ হয়ে গেলে তাঁরা দ্রুত সতর্ক হয়ে তাওবা করে নিতেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : তুমি আমার সাথে নামায পড়েছ? আরয করলেন : জ্বী হ্যাঁ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঐ নামায এই গুনাহের কাফফারা হয়ে গেছে।

দেখুন ঐ সাহাবী কী পরিমাণ পেরেশান হয়েছেন? এজন্য নামাযের আমল তাঁর গুনাহের কাফফারা হয়ে গেছে।

কোন ছাত্র হয়ত এভাবে দলীল দেয়ার চেষ্টা করতে পারে যে, ঐ সাহাবীর মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দ্বারা এমনটি ঘটলে কী অসুবিধা? ঐ গুনাহের পর আমরা যে নামায পড়েছি। সেটার দ্বারা কাফফারা হয়ে যাবে!

ঐ ছাত্রের এমন চিন্তাধারা ভুল। কেননা সে তো আর ঐ সাহাবীর অবস্থা দেখেনি যে, তিনি কী পরিমাণ পেরেশান হয়েছেন? কতটুকু লজ্জিত হয়েছেন যে, এই গুনাহের কারণে তাঁর মনের অনুভূতি হয়েছে এমন যে, তিনি ধ্বংস হয়ে গেছেন।

এটাই ঐ আয়াতে কারীমার মর্ম :

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

“নিঃসন্দেহে ভাল কাজগুলো গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।”

(সূরা হুদ-১১৪)

১৩০. মজলিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এটাও মজলিসের একটি আদব যে হাসির কথায় হাসা, ও মুচকি হাসির কথায় মুচকি হাসি দেয়া। দুঃখের কথায় চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ সৃষ্টি হওয়া। মুচকি হাসি বা বিষণ্ণতা না আসলে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে হলেও চেহারাকে অনুরূপ বানানোর চেষ্টা করবে।

অনুরূপভাবে কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের একটি আদব হল, যে মর্মের আয়াত আসবে নিজ চেহারায় সেটার ছাপ থাকবে। রহমতের আয়াত আসলে দিলের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশা সৃষ্টি হবে। আর আযাবের আয়াত আসলে দিলের মধ্যে আযাব থেকে আশ্রয় কামনা করা জরুরী। চাই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েই হোক না কেন।

১৩১. রিয়ার হাকীকত : অত্যাশ্চর্য উদাহরণের মাধ্যমে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমাদের নিকট মসজিদের চাটাইগুলো প্রাণহীন কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট সব কিছুরই প্রাণ আছে।

যদি প্রাণওয়ালা নাই হয় তবে মুআযযিনের আওয়াযের সাক্ষ্য পাথর ও মাটি কিভাবে দিবে? যেমনটি হাদীসে পাকের মধ্যে এসেছে।

তো নামাযী ব্যক্তির যদি চাটাই দেখে রিয়া না আসে। তাহলে মানুষ দেখে রিয়া আসে কেন? যেমন চাটাই নামাযীকে দেখছে। অথচ এর দ্বারা রিয়া আসছে না। তো মানুষের সাথেও রিয়া না হওয়া উচিত। অথচ হচ্ছে। কিন্তু কেন?

ریاء রিয়ার শেষে حا বাড়িয়ে দাও তো ریاح গ্যাসের অর্থে হয়ে যাবে। আর গ্যাস ক্ষতিকর বস্তু, যখন সেটা পেটের মধ্যে আটকে যায়। আর যদি হার্টের দিকে চড়তে থাকে তাহলে তো আর রক্ষা নাই। মনে হতে থাকে যে, এই বুঝি মারা গেলাম। আর যদি মস্তিষ্কের দিকে যেতে থাকে, তাহলে তো আরো করুণ দশা।

গ্যাসের দ্বারা শরীরের কষ্ট হয়। কিন্তু বের হয়ে গেলে আর কষ্ট নেই। অনুরূপভাবে রিয়ার দ্বারা রূহের কষ্ট হয়। অযথা পেরেশান হতে হয় যদি রিয়ার হাকীকত বা প্রকৃত মর্ম জানা না থাকে। কিন্তু হাকীকত জানা থাকলে আর কোন কষ্ট নেই। পেরেশানী নেই।

রিয়া বলা হয় গাইরুল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কোন নেক আমল করা। যদি কেউ আপনাকে নেক আমল করতে দেখে আর এতে আপনি খুশী হন, তো এটা রিয়া নয়। বরং রিয়ার কুমন্ত্রণা।

প্রকৃত রিয়া আখেরাতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন : তুমি তো আমাকে খুশী করার জন্য ইবাদত করনি। বরং মানুষকে খুশী করার জন্য ইবাদত করেছিলে। আর সেটার বদলা তো তুমি দুনিয়াতে পেয়েছ। আজকে আমার কাছে তোমার কোন প্রতিদান নেই।

এরপর রিয়াকারীকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তবে যেহেতু রিয়ার হাকীকত জানা গেল, অতএব রিয়ার কুমন্ত্রণা বা খেয়ালের কারণে পেরেশানীর কোন কারণ নেই। এর থেকে বেপরোয়া থাকবেন। আর যখন রিয়া চলে গেল। তখন ইখলাস এসে গেল। রিয়া বর্জনের যোগ্যতা অর্জিত হলে ইখলাস সৃষ্টি হবে।

১৩২. আশা না করার মধ্যে শান্তি

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যথাসম্ভব স্বীয় মস্তিস্ক ও মেধাকে খালী ও চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করবে। বর্তমানে কিছু অপারগতাও সামনে আসছে। উদাহরণস্বরূপ সন্তানের পক্ষ থেকে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু কথাবার্তা এমন আসে যা মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। তো এর চিকিৎসা হল : তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা একদম বন্ধ করে দিন।

ব্যস এটাই হল এ সমস্যার সমাধান। কেননা تجويز এর স্থলে تفويض হওয়া চাই। আর توقع এর স্থলে توكل হওয়া চাই। (এসবের ব্যাখ্যা এখনই আসছে –অনুবাদক) কারণ যখন توقع উঠে যাবে অর্থাৎ কারো কাছে কোন কিছুর আশা করবে না, তখন আর মনে কোন কষ্ট থাকবে না। যদি কেউ ভালো ব্যবহার না করে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু আপনি তার নিকট ভালো ব্যবহার আশাই করেননি। আর যদি ভালো ব্যবহার করে তবেও আলহামদুলিল্লাহ। সেক্ষেত্রে এটা হবে অপ্রত্যাশিত নেয়ামত তথা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

অতএব কারো কাছেই কিছু আশা করবেন না। না স্ত্রীর কাছে, না সন্তানের কাছে। না বন্ধুদের কাছে। না ছাত্রদের কাছে। এদের কাছ থেকেই যদি কোন কিছু পাওয়ার আশা বাদ দিতে পারেন তাহলে অন্যদের থেকে আরো সহজেই পারবেন ইনশাআল্লাহ।

অনুরূপভাবে تجويز দ্বারাও পেরেশানী হয়। অর্থাৎ নিজে নিজে এমন সিদ্ধান্ত করা যে, আমার বিবাহ অমুক স্থানে হোক। আমার ক্ষেতে এ পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হোক। আমার অমুক পদ পাওয়া উচিত। এগুলোকেই تجويز বলে। এগুলো বাদ দিতে হবে। এটাকেই تفويض বা সমর্পণ বলে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَاُفَوِّضُ اَمۡرِیۡۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ

অর্থাৎ, "আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করছি।"

(সূরা মু'মিন : ৪৪)

এটা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. কথা। تفويض এর অর্থ এটা নয় যে, উপকরণসমূহকেও বাদ দিয়ে দিবে। বরং বৈধ কোন কিছু অর্জন করার জন্য যা যা উপকরণ দরকার সব অবলম্বন করবে। আর পরিণতি আল্লাহ পাকের উপর সোপর্দ করবে। ব্যস চিন্তামুক্ত থাকবে।

বর্তমানে যত লড়াই ও ঝগড়া সব ঐ تجويز ও توقع এর কারণে। অর্থাৎ নিজে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর বড় বড় আশা এ দুটোই হল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণ। অমুক আমাকে কেন গালী দিল ও কেন আমাকে মন্দ বলল? আশা উঠে গেলে সে প্রশংসা বা দুর্নামের কোন তোয়াক্কা করবে না। বরং স্বাভাবিক থাকবে। নতুবা তো কারো সমালোচনা শুনলে ঘন্টার পর ঘন্টা মন খারাপ করে বসে থাকতে হবে। নামাযেও মন বসবে না। আর যদি কেউ হুমকী দেয় তাহলে রাত্রেও ঘুম আসবে না। বাইরে বের হতেও ভয় পাবে।

এমনিভাবে কাউকে গাউছে যমান কুতুবে দাওরান বলার মানে কি এই যে, সে মাকবূল হয়ে গেছে? জান্নাতী হয়ে গেছে? কক্ষনো নয়। কিন্তু বর্তমানে বিভ্রান্তির ব্যাপকতা এত বেশি যে, এর কোন সীমা পরিসীমা নেই।

আমাদের অবস্থা ঠিক সেরকম যেমনটি একটি ঘটনা মাওলানা রূমী রহ. লিখেছেন মছনবী শরীফে। ঘটনা হল : এক ব্যক্তির ঘোড়া দোষযুক্ত ছিল। সে দালাল কে বলল : ঘোড়াটা বাজারে বিক্রি করে দাও। দালাল ঐ ঘোড়ার বিভিন্ন গুণ বর্ণনা শুরু করল যে, এটা এমনই দ্রুতগতিসম্পন্ন যে, বাতাসের সঙ্গে কথা বলে। দুশমনের উপর হামলে পড়ে। বিপদ থেকে উদ্ধার করে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘোড়ার মালিক এ সমস্ত শুনে দালালকে বলল যে, যদি ঘোড়াটি এতই ভাল হয় তাহলে আমিই রেখে দিচ্ছি। দালাল বলল : আরে বেকুব! এটা তো হল বিক্রির কৌশল। এটা যে দোষযুক্ত সে অভিজ্ঞতা তো তোমার আছেই।

তো যেমনিভাবে ঘোড়ার মালিক দালালের মিথ্যা প্রশংসায় তার বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতা ভুলে গেছে, ঠিক তেমনিভাবে কিছু সহজ সরল ভাল মানুষ মহল্লার কিছু চাপাবাজ শ্রেণির মানুষের প্রশংসায় ফুলে গিয়ে নিজেকে ভুলে যায়। অথচ মানুষ নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবগত। মানুষের মনে করা এক জিনিস। আর বাস্তবতা আরেক জিনিস।

একজন সাধারণ মানুষকে কেউ কোটিপতি বললেই কি সে কোটিপতি হয়ে যায়? কক্ষনো নয়। আর যদি কোন ভাল মানুষ কে কেউ খারাপ বলে, তবে কি এর দ্বারা তার থেকে সৎ গুণাবলি বের হয়ে যায়? মন্দ গুণাবলি চলে আসে? কস্মিনকালেও নয়। যেমন মনে করুন কেউ স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতে দেখল। আর জাগ্রত হওয়ার পর দেখল যে সে গুনাহে লিপ্ত, তাহলে এর দ্বারা কি সে জান্নাতী হয়ে যাবে?

এমনিভাবে যদি কেউ দেখে যে, তার শরীরে জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু লেপ্টে আছে। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর দেখল যে, সে নেক আমলের মধ্যে আছে, তবে কি সে জাহান্নামী হয়ে গেছে? একদমই নয়। হ্যাঁ সাপ-বিচ্ছু দেখিয়ে কোন অসমীচীন অবস্থার উপর সতর্কতা হতে পারে।

অনুরূপভাবে গুনাহগার ব্যক্তিকে ভাল স্বপ্ন দেখিয়ে তাকে সাবধান করা হচ্ছে। যে, তোমাকে এমন সৌভাগ্যবান হতে হবে। আর সৌভাগ্যবান মানুষ মনে করবে যে, আমি এত বড় গুনাহগার অথচ আমার জন্য জান্নাত! এটা আমার জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক একটি ব্যাপার। ফলে সে নেক আমল আরম্ভ করে দিবে।

এমনিভাবে যদি কেউ প্রশংসা করে, তাহলে সেটার প্রতিক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যে, আচ্ছা লোকেরা আমাকে এমন ভালো মনে করে, অথচ আমি তো এমন নই। সুতরাং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ সে অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিবে। এবং ইবাদত বন্দেগীতে আরো মনোযোগী হবে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ঘটনা। একবার তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একজন লোক আরেকজনকে বলছে : "তুমি জান ইনি কে? ইনি হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ. যিনি সারারাত ইবাদত করেন।"

এ কথা শুনে হযরতের এমন লজ্জা লাগল যে, ঐদিন থেকেই রাত জাগা আরম্ভ করে দিলেন। এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু যদি সৌভাগ্য না থাকে, তবিয়তের মধ্যে নীচুতা থাকে, তবে সে এটার উল্টো প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করবে যে, লোকেরা আমাকে এত বড় মনে করে। ফলে যা কিছু ইবাদত করত সেটাও ছেড়ে দিবে আর পড়ে পড়ে ঘুমাবে।

আলোচনার সারকথা এটাই যে, অন্যের مدح বা প্রশংসায় কেউ আগে বাড়ে না। আর অন্যের قدح বা বদনামের দ্বারাও কেউ পিছনে চলে যায় না। বরং নেক আমলের দ্বারা সামনে বাড়ে আর বদ আমলের দ্বারা পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং কারো নিকট হতে কিছু পাওয়ার আশা কে বিলকুল খতম করে দিবে।

এমনকি স্ত্রীর কাছেও কিছু আশা করবে না। উদাহরণস্বরূপ : রাতে সহবাসের জন্য ডাকল। আশা ছিল সে ডাকে সাড়া দিবে। অথচ স্ত্রী এল না। তাহলে মনে কষ্ট হবে। কিন্তু যদি এভাবে চিন্তা করত যে, এই বাঁকা পাজড়ওয়ালী নারীর কাছে আর কীই বা আশা করব যে, সবসময় আমার কথা মানবে। সেক্ষেত্রে কথা না শুনলে মনে আর কষ্ট লাগবে না।

তো আজকের সবক হল تفويض সমর্পণ ও توكل তথা আল্লাহর উপর ভরসা সম্পর্কে। এ দুটো দারুণ প্রশান্তির জিনিস। কিন্তু এটা বুঝা উচিত যে, শান্তি পাওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করবে না বরং মহান আল্লাহর হক মনে করে তাঁর কাছে সমর্পিত হবে। কেননা تفويض হল মহান আল্লাহর সত্তাগত হক। যদি تفويض এর মধ্যে প্রশান্তি নাও থাকত, তবুও মহান আল্লাহর হক মনে করে এটা অবলম্বন করা জরুরী এবং অত্যাবশ্যক ছিল।

১৩৩. ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের জন্য বৈধ উপকরণ একত্রিত করা জায়িয

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কারো কাছে ঋণ করা ব্যতীত, বিনা কষ্টে, কারো অনুগ্রহ গ্রহণ ব্যতীত, চাওয়া ব্যতীত আরামের উপকরণ যদি একত্রিত হয়, তাহলে সে সেটা ব্যবহার করবে না কেন?

কেননা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

অর্থাৎ "আপনি বলে দিন আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনিভাবে) উৎকৃষ্ট

জীবিকার বস্তুসমূহ? বলুন, এসব পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য (এবং) কিয়ামতের দিনে বিশেষভাবে (তাদেরই)। (সূরা আ'রাফ : ৩২)

দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত সামান মুসলমানদের জন্য। কেউ নিজ ইসলাহের জন্য অথবা শাইখের পরামর্শে ছেড়ে দিলে সেটা হল সাময়িক ব্যাপার। নতুবা মহান আল্লাহ যদি সম্মানের সঙ্গে দেন, তাহলে বান্দা কেন ব্যবহার করবে না?

হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব কান্ধলভী রহ. এর ঘটনা। হযরত শোয়া অবস্থায় ছিলেন। কয়েকজন খাদেম হযরতের হাত পা দাবাচ্ছিলেন। (টিপে দিচ্ছিলেন) জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসে বললেন : যাকারিয়া! বহু মানুষ তোমার খেদমত করছে। তোমার নফস নিশ্চয়ই খুব ফুলে যাচ্ছে যে, আমার এত খাদেম!

হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. বললেন : আনন্দ লাগছে এজন্য যে, মহান আল্লাহ কোন ধরনের কষ্ট ও তলব ছাড়াই এত খাদেম দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এতে আমার নফস একটুও ফুলছে না। বরং আল্লাহ পাকের নেয়ামত তাই শোকর আদায় করছি।

এ জাতীয় ঘটনা হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এরও আছে। হযরতের কয়েকজন খাদেম হযরতের শরীর দাবিয়ে দিচ্ছিলেন। কোন একজন অকৃত্রিম বন্ধু এসে বললেন : "মৌলভী জী! নিশ্চয়ই খুব মজা লাগছে"। হযরত বললেন : "মজা লাগছে। কারণ আরাম পাচ্ছি। এজন্য নয় যে আমি বড়। আমার মধ্যে বড়ত্বের ভাব আসছে।"

তাহলে দেখুন মহান আল্লাহ এসব হযরতকে কষ্ট ও তলব ছাড়াই খাদেম দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে তাকাব্বুর বা অহংকারের কোন চিহ্নই ছিল না। এটাই হল সহীহ দাসত্ব ও আত্মবিলোপ।

১৩৪. শাইখের কথা না শুনলে ক্ষতি হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন কোন সালিক শাইখের নিষেধ সত্ত্বেও 'রিয়াযত' শুরু করে দেন। 'রিয়াযত' বলা হয় পানাহার কমিয়ে দেয়া। শারীরিক কষ্ট সহ্য করা। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ঘুম

কমিয়ে দেয়া ইত্যাদি। তো শাইখের অনুমতি ছাড়াই রিয়াযত আরম্ভ করে দেয়। শাইখ নিষেধ করেন, তবুও মানে না।

আমার দুটি ঘটনা মনে পড়ল। একটা হল হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর মুরীদের। আর অপরটা হল হযরত থানভী রহ. এর মুরীদের। প্রথম জনকে তো আমি দেখিনি। দ্বিতীয়জনকে দেখেছি। মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ঐ মুরীদকে বলেছিলেন : রিয়াযত বাদ দিয়ে দাও। নতুবা নামাযও পড়তে পারবে না। কিন্তু ঐ মুরীদ হযরতের এ নসীহত মানেনি। শেষে পাগল হয়ে গেছে। উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করত।

আর আমাদের হযরত থানভী রহ. এর মুরীদের ঘটনা এই যে, তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে হযরত নিজ গরুগুলো তাকে চড়াবার অনুমতি দিয়ে দেন। এদিকে ইনি কী করলেন? গরুগুলো কে মাঠে ছেড়ে দিয়ে নিজে যিকিরে লিপ্ত হয়ে পড়লেন।

হযরত থানভী রহ. তাকে সতর্ক করলেন যে, এটা তো জায়িয নেই। যেই যিকিরের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হয় ঐ যিকির জায়িয নেই। সেই মুরীদ অপারগতার কথা জানালেন। হযরত পুনরায় অনুমতি দিলেন। কিন্তু সে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত হল না।

পরিশেষে হযরত বললেন : যখন আপনি আমার কথাই মানেন না। তখন আমার সাথে আপনার সম্পর্ক রেখে কী লাভ? আজ থেকে সম্পর্কটাই শেষ। এখন থেকে আমার এখানে আর থাকবেন না। এতটুকু বলে দিচ্ছি যে, অন্য কোনখানেও সম্পর্ক করবেন না। নতুবা আরো বেশি বিগড়ে যাওয়ার আশংকা।

১৩৫. শিথিলতার সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শিথিলতার অর্থ এই নয় যে, কোন অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা হবে না। বরং শিথিলতার অর্থ হল স্বীয় দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দ্বীনী বিষয়ের তালীম থেকে বিরত থাকা।

কিন্তু যদি কারো দ্বীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতির আশংকা থাকে। অথবা অন্য কারো দ্বীনী উপকারিতা থাকে। কিন্তু এই সময়ে নয় বরং অন্য কোন সুযোগে

তাকে উপদেশ প্রদান করা হবে। অথবা সেখানে অপরিচিত এমন কেউ থাকে, যার ব্যাপারে জানা নেই যে তার মন মানসিকতা কেমন? হতে পারে সে লজ্জিত হবে আর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করবে না অথবা স্বীয় অবমাননা মনে করবে এবং গালমন্দ করবে। এ জাতীয় অপারগতার ক্ষেত্রে 'আমর বিল মারূফ' বা সৎকাজের আদেশ না করা শিথিলতা নয়।

আমি তাজ্জব বনে গেছি। আমাকে জনৈক ব্যক্তি শুনিয়েছেন একজন মুজায [ইজাযতপ্রাপ্ত, খলীফা] অপর মুজাযের নম্রতার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, তার মধ্যে শিথিলতা আছে! এটা অজ্ঞতাসুলভ কথা।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. একবার ট্রেনে সফর করছিলেন। হযরতের বেতাকাল্লুফ (অকৃত্রিম) খলীফা খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. সঙ্গে ছিলেন। একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ হযরতের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। হযরতও খুব উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলছিলেন।

ইতোমধ্যেই কোন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। ঐ স্টেশনে ট্রেন লম্বা সময় বিলম্ব করত তাই হযরত ট্রেন থেকে নেমে নামায আদায়ের ইচ্ছা করলেন।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. খাজা ছাহেবের সাথে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। কিন্তু ঐ সাহেব নামেননি। খাজা ছাহেব হযরতওয়ালাকে বললেন : হযরত! ইনি আপনার দ্বারা প্রভাবিত। তাকে নামাযের জন্য বলে দিন। ইনিও পড়ে নিবেন। হযরতওয়ালা বললেন : কেন? উনি কি জানেন না যে নামায ফরয? আমি বলতে পারব না। খাজা ছাহেব রহ. পুনরায় পীড়াপীড়ি করলেন। হযরতওয়ালা বললেন : আপনার যখন তাবলীগের এত জোশ তো আপনিই বলে দিন। খাজা ছাহেব রহ. বললেন : হযরত! কোথায় আপনি আর কোথায় আমি? আমার বলা কখনোই আপনার বলার সমান হতে পারে না।

মোটকথা নামায পড়া হল। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত ঐ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির সাথে সেরকম প্রফুল্লতার সাথেই কথাবার্তা বলছিলেন।

সফর শেষ হল। ঐ সাহেব নিজ বাড়ী চলে গেলেন। হযরতওয়ালা থানভীও রহ. নিজ বাড়ীতে পৌঁছে গেলেন।

খাজা ছাহেব রহ. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইনসপেক্টর বা পরিদর্শক ছিলেন। সফর করতে থাকতেন। একবার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সফরে ছিলেন। ইত্যবসরে একজন সাহেব বড় উষ্ণতার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন যে, "সম্ভবত আপনি আমাকে চিনেননি। আমিই ঐ ব্যক্তি যিনি আপনার সাথে সফরে ছিলাম। হযরত মাওলানা থানভীও রহ. ঐ সফরে ছিলেন। আপনারা উভয়ে নামাযের জন্য নেমে গিয়েছিলেন। নামায পড়েছিলেন। কিন্তু আমি পড়িনি। আমি চিন্তা করছিলাম যে, নামায থেকে আসার পর সম্ভবত হযরতওয়ালা আমার সাথে কথাই বলবেন না। যেহেতু আমি নামায পড়িনি। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে আমি শরমে কুঁকড়ে গেছি যে, হযরতওয়ালা ঐ প্রফুল্লতার সাথেই আমার সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করে দিলেন। খাজা ছাহেব! ঐদিন তো আমার নামায ছুটে গেছে। কিন্তু এরপর থেকে আমার কোন নামায ছুটেনি। যদি মাওলানা সেদিন আমাকে নামাযের জন্য বলতেন, তাহলে হযরতের সম্মানে আমি ঐ ওয়াক্তের নামায পড়ে নিতাম। কিন্তু আমার উপর হযরতের আখলাকের এমন প্রভাব পড়েছে যে, আমি পাক্কা নামাযী হয়ে গেছি।"

তাহলে দেখুন! অনেক সময় আমর বিল মারূফ না করার মধ্যেই কল্যাণ থাকে। এটা কখনোই শিথিলতা নয়।

১৩৬. হযরত হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাতের মমত্ববোধের ঘটনা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আমাদের হযরতের বিনয়, আব্দিয়্যাত, 'ঈছার' বা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান, সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ ইত্যাদি গুণাবলির উদাহরণ পেশ করা মুশকিল।

হযরত অত্যন্ত দয়াদ্র ও নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। তাইতো একবার শীতের রাতে হযরত বালাখানায় শোয়া ছিলেন। আচমকা প্রতিবেশীর গোঙানীর শব্দ পেলেন। কর্মচারীকে বললেন : (হযরতের দুই স্ত্রীর ঘরের কাজের জন্য দুইজন কর্মচারী ছিলেন) তুমি দেখ তো, এই গোঙানীর শব্দ কোথা থেকে আসছে? কর্মচারী যেদিক থেকে আওয়ায আসছিল ঐদিকে গেল। দারওয়াজায় পৌঁছে কড়া নাড়লেন।

একজন বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে আসলেন। কর্মচারী গোঙানীর কারণ জিজ্ঞেস করল। মহিলা বললেন: আমার পুত্রবধূর প্রসব বেদনা হচ্ছে। সেটারই আওয়ায। হযরতওয়ালা ঘুম থেকে উঠলেন। ঐসময় গোসলের প্রয়োজন ছিল। তার জন্য গোসল করলেন এবং প্রসব বেদনার তাবীয লিখে কর্মচারীকে দিয়ে বললেন যে, ঐ বয়স্কা মহিলাকে বলবে যেন তার পুত্রবধূর বাম রানে বেঁধে দেয়। আর বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন খুলে ফেলে। কর্মচারী তাবীয নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা হয়ে গেছে।

দেখুন! একজন মুসলিম মহিলার আরামের জন্য নিজে কষ্ট করছেন। ঠান্ডার মধ্যে মধ্যরাতে গোসল করছেন। এটাকেই মমত্ববোধ বলে।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল। তখন কংগ্রেস পার্টিতে শরীক হওয়ার খুব জোড় ছিল। জোর জবরদস্তী এতে শরীক করা হচ্ছিল। হযরতওয়ালা এতে শরীক ছিলেন না। কারণ শরয়ী নীতিমালার আলোকে হযরত এটাকে সঠিক মনে করতেন না।

ঐ সময়েই মুসলিম লীগ পন্থী "আল আমান" পত্রিকার সম্পাদক কে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। এর কিছুদিন পর হযরতের কাছে চিঠি আসল : "হয়ত কংগ্রেসে শরীক হও নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। যেমনটি করা হয়েছে "আল আমানের" সম্পাদকের সাথে।"

হযরতওয়ালা চিঠি পড়ে বললেন : "বাচ্চাদের খেলনা পেয়েছে। বুঝেনা কিছুই। গায়ের জোরে মানাতে চায়। আমার কী করবে? হত্যা করলে করুক। শহীদ হয়ে যাব। কোন দুশ্চিন্তা নাই।" এটাকেই বীরত্ব বলে।

এর কিছুদিন পর হযরতওয়ালা দুপুরবেলা তার বিছানায় শোয়া ছিলেন। কাইলূলা করছিলেন। এক সন্ত্রাসী এসে হযরতের উপর চাদর ফেলে দিল। যে কারণে চেহারা ঢেকে গেল। আর গলায় চাপ দেয়া আরম্ভ করল। হযরতওয়ালা কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। মুরীদদের মধ্যে কেউ একজন এ দৃশ্য দেখে ঐ সন্ত্রাসীটাকে পাকড়াও করলেন। খানকায় অবস্থিত সমস্ত ভক্ত ও

মুরীদবৃন্দ একত্রিত হয়ে গেল। আর আরয করা হল যে, একে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হোক। হযরত বললেন : এতে আমার কী লাভ? মনে হয় লোকটা পাগল। নতুবা দিনের বেলা এমন কর্মকান্ড কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ করতে পারে?

ভক্তবৃন্দ পুনরায় আরয করলেন যে, একে অবশ্যই পুলিশ হেফাজতে দিয়ে দেয়া হোক। হযরত বললেন : প্রথমত পুলিশ একে প্রহার করবে। দ্বিতীয়ত এর জেলের শাস্তি হয়ে যাবে। তখন সে কোথায় থাকবে আর তার স্ত্রী সন্তান কোথায় থাকবে? ব্যস, একে ছেড়ে দেয়া হোক।

তৃতীয়বার পীড়াপীড়ির প্রেক্ষিতে বললেন : আমি নির্দেশ দিয়ে বলছি: একে ছেড়ে দাও। এখন কার সাহস আছে কথা বলার? ফলে ঐ লোকটাকে ছেড়ে দেয়া হল। দেখুন দয়া-মায়া, সহমর্মিতাও মমত্ববোধ কাকে বলে? নিজ জানের দুশমনকেও ছেড়ে দিচ্ছেন।

এ ঘটনার পর হযরতের মুহিব্বীন প্রস্তাব দিলেন একজন দারোয়ান রাখার। হযরতওয়ালা প্রথমে নিষেধ করলেও পরে মেনে নিয়েছেন। কারণ বন্ধুদের কথা মেনে নেয়াও সুন্নাত।

ফলে একজন যুবককে এ কাজের জন্য রাখা হয়। কিছুদিন পর হযরতওয়ালা রহ. বললেন : সাহাবায়ে কিরামও রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দারোয়ান রাখতে চেয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা মেনে নিয়েছিলেন এবং দারোয়ান রাখা হয়েছিল। কিছুদিন পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তোমাদের কথা মেনে নিয়েছি। দারোয়ান রেখেছি। এখন তোমরা আমার কথা মেনে নাও। একে বিদায় করে দাও। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সসম্মানে বিদায় করে দিয়েছেন।

হযরতওয়ালা থানভী বলেন : আমিও একই কথা বলছি। আমি তোমাদের কথা মেনে নিয়েছি। এখন তোমরা আমার কথা মেনে নাও। ফলে সেই দারোয়ানকে বিদায় করা হল।

এই হল মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া। কাউকে পরোয়া করতেন না। অন্তরে একথা বদ্ধমূল ছিল যে, রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।

১৩৭. ছাত্রদের সংগঠন থাকা উচিত নয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ছাত্রদের জন্য আঞ্জুমান বা সংগঠনের অনুমতি দেয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। এর দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে আজাদী এসে পড়ে। তারা লাপরোয়া হয়ে যায়। এটা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ক্ষতির বুনিয়াদই হল এইসব সংগঠনগুলো। জানা কথাই যে, ক্ষতিকর বস্তু প্রথমেই আটকে দিতে হয়। কাজেই কঠোরভাবে এর থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবে। (অবশ্য যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বা কোন সুদক্ষ উসতাযের নেগরানী বা তত্ত্বাবধানে এ জাতীয় সংগঠন-সংস্থা পরিচালিত হয়। তাহলে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এর থেকে আগে বাড়তে দিবে না- বর্ধিত : সংকলক)।

১৩৮. পরামর্শের আদব বা বাস্তবতা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সমস্ত মুদাররিস থেকে পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সবাই নিজ মতলবের কথা বলে। আপন স্বার্থকে সামনে রাখে, বড় করে দেখে। ইখলাসই নাই। ব্যস হাতে গোনা কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করে নেয়াই যথেষ্ট। এমনটি সম্ভব না হলে নিজেই চিন্তা ভাবনা করে ইখলাসের সাথে কাজ করবে। ব্যস এটাই যথেষ্ট।

১৩৯. হযরত থানভী রহ. এর খানকাহের অবস্থা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : জনৈক তাহসীলদার খান সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি বললেন : আপনার শাইখ (হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.)-এর মত খানকা আমি আর দেখিনি। আর আপনার শাইখের মত এমন ব্যক্তিত্বও আমি কারো মধ্যে পাইনি। আমি বড়বড় খানকাহে গিয়েছি। কিন্তু এই খানকাহের অবস্থা দেখে জান্নাতের মজা এসে গেছে।

بہشت آنجاکہ آزارے نباشد
کسے را باکسے کارے نباشد

জান্নাত হল ঐ স্থান যেখানে কষ্টের কোন নাম নিশানাও থাকবে না। কারো সাথে কারো কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না।

আপনার শাইখের খানকাহর একই চিত্র। ব্যস সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। কারো সাথে কারো কোন বাকবিতন্ডা নেই।

আর হযরতের ব্যক্তিত্বের অবস্থা হল এই যে, আমি সাধারণ মানুষের স্থানে বসতে চাচ্ছিলাম। হযরত তাঁর ডানদিকে আসার জন্য আমাকে ইশারা করলেন। আমি হযরতের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হযরত সামান্য নজর উঠিয়ে আমাকে দেখলেন। ব্যস হযরত আমার দিকে তাকানো মাত্রই আমার পা কাঁপতে থাকল। খুব কষ্টে নিজেকে সামলে সেখানে গিয়ে বসেছি।

১৪০. হযরত থানভী রহ. এর খানকাহ সুপ্রিমকোর্ট ছিল

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একবার খানকাসমূহের ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। সেখানের ঐ অবস্থা। ঐখানে ঐ অবস্থা। আর খানকাহে আশরাফিয়ার আজীব হাল। আমি বললাম : অন্য খানকাগুলোর উদাহরণ হল দেওয়ানী কালেক্টরীর মত। আর এখানের উদাহরণ হল জজের মত। কালেক্টরের এখানে তো কথাবার্তাও বলা যায়। অথচ জজের ওখানে কাশিও দেয়া যায় না। এটা তো হল ঐ সময়ের কথা। বর্তমান পরিভাষা হিসেবে বলতে চাই : জজকোর্ট তো কিছুই নয় বরং হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট থেকেও আমাদের হযরতওয়ালার খানকা আরো বেশি রাজকীয় ছিল।

অনেক বড় বড় দাবিদার এসে দাবি করেছে যে, মাত্র ৪ মিনিট কথা বলে হযরতের মুখ বন্ধ করে দিবে। কিন্তু ২ মিনিট কথা বলার পূর্বে নিজেরাই বন্ধ হয়ে যেত। হযরত যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক ছিলেন। সকলের সংশোধন করতেন।

হযরত আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. যিনি পাঞ্জাবী ওয়ায়েয ছিলেন। তাঁর ওয়াযের আজীব হাল ছিল। ইশার পর দাঁড়িয়ে ফজর পর্যন্ত একটানা বয়ান করতে পারতেন। ওয়াযের সময় ছদরিয়া খুলে ফেলতেন। অতঃপর কুর্তা খুলে ফেলতেন। আর ওয়ায করতে করতে এখান থেকে ওখানে পৌঁছে যেতেন। একবার আমাদের হযরত থানভীর রহ. এক খলীফার সাথে হযরতের খানকায় এসেছিলেন। যখন থানাভবন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন বলছিলেন : "আমার অর্ধেক শেষ। আর যখন খানকার

দরওয়াযায় পৌঁছলেন, তখন বললেন: আমার সব শেষ। এখন মনে হচ্ছে যে, আমার মধ্যে কিছুই নাই।"

এই ছিল হযরত থানভী রহ. এর ইলমী প্রভাব ও তাকওয়া।

১৪১. ইলম অর্জনের জন্য নির্জনতা জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হে তালিবে ইলমগণ! তোমরা কি মনে করো নির্জনতা অবলম্বন ব্যতীত ইলম এসে যাবে? কক্ষনো নয়। দেখো! আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন হেরা গুহায়।

হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে :

حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ

"নির্জনতা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রিয় বানিয়ে দেয়া হয়েছিল"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩)

এরপরেই ওহীর ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়। ইরশাদ হয় :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ۝

অর্থাৎ "পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। পড়ুন এবং আপনার প্রভু সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (সূরা আলাক : ১-৫)।

তো যখন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্জনতার প্রয়োজন হয়েছে, তাহলে তোমাদের কেন প্রয়োজন হবে না? নির্জনতা ব্যতীত কখনো ইলম আসে না। আর যদি কেউ বলে যে, আমাদের তো ইলম এসে গেছে। সনদও মিলে গেছে। তাহলে মনে রেখো : তোমাদের কিছু মালূমাত (তথ্যাবলী) অর্জন হয়েছে মাত্র। সনদও পেয়ে গেছ। কিন্তু ইলম তো হল নূরে বাতেনের নাম। সেটা নির্জনতা অবলম্বন ব্যতীত হাসিল হতে পারে না।

১৪২. তালীম ও তারবিয়্যত বা শিক্ষা ও দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মিশকাত শরীফকে শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এক রকম। আর দীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আরেক রকম দেখবে।

আখের কী ব্যাপার যে, নামাযের বয়ান তাদরীসী দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ানোর পরও ঐরকম নামায কেন পড়ে না? কিন্তু যখন তারবিয়্যত বা দীক্ষার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ বা মনোযোগী হয় আর ঐ হাদীসগুলোকেই পুনরায় ভালভাবে দেখে তখন ভিন্ন রং দেখা যায়। এখন সে জীবন্ত সুন্নাতী নামায আদায়ের চেষ্টা করে। কখনো কমতি হলে তাঁর কাছে এমন মনে হয় যেন তাঁর দিলে সাপ ফিরে এসেছে।

১৪৩. হক এবং সুনাম একত্রিত হতে পারে না

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হক এবং সুনাম উভয়টা কিয়ামত পর্যন্ত একত্রিত হতে পারে না। যাঁরা দ্বীনের কাজ করে তাঁদের তো সবসময়ই বদনাম করা হয়। কবি বলেন :

در کوئے نیک نامی مارا گزر نباشد
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضاء را

আমাদের সুনামের অলিগলিতে বিচরণ হয় না। তোমার যদি এটা পছন্দ না হয়, তাহলে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে ফেল!

১৪৪. আমাদের বড়দের অত্যাশ্চর্য বিনয়

ঘটনা নং-১: হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : একবার হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী ছাহেব রহ. দিল্লী গমন করলেন। মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব আমরূহী এবং আমীর শাহ খান ছাহেব মরহুমও সঙ্গে ছিলেন।

মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব রহ. হলেন হযরতওয়ালা নানূতভী রহ. এর সরাসরি শিষ্য। আর আমীর শাহ খান ছাহেব রহ. ছিলেন প্রাণোৎসর্গকারী মুরীদ।

খান ছাহেব মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব রহ. কে বললেন : অমুক মসজিদের ক্বারী ছাহেবের কুরআন তিলাওয়াত খুব সুন্দর। ফজরের নামায আমরা ওখানে গিয়ে পড়ব। মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব বললেন : আরে মূর্খ পাঠান! ঐ ক্বারী ছাহেব তো আমাদের হযরতকে (নানূতভী রহ. উদ্দেশ্য) কাফের বলে। আর আমরা কিনা নামায পড়ব তার পিছনে!

এই কথাবার্তা মাওলানা নানূতভী রহ. শুনে ফেললেন। ফলে তিনি মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব রহ.কে লক্ষ্য করে বললেন : আমি তো মনে করেছিলাম তুমি বিদ্বান হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি জাহেল বা মূর্খই আছ। আমীর শাহ! আমরা ফজরের নামায ঐ ক্বারী ছাহেবের পিছনেই পড়ব ইনশাআল্লাহ। ফলে হযরত নিজ অবস্থানস্থল থেকে ভোরেই রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং ঐ মসজিদে পৌঁছে গেলেন।

ঐ ক্বারী ছাহেব মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ. কে চিনতেন। সালাম ফেরানোর পর কেউ একজন বললেন যে, ভাই! আজ তো মাওলানা কাসেম ছাহেবও উপস্থিত আছেন। ব্যস এটা শোনা মাত্রই ঐ ক্বারী ছাহেবের উপর অদ্ভুত অবস্থা দেখা দিল। তিনি হযরত নানূতভীর রহ. কোলে মাথা রেখে দিলেন। আর বললেন, "মাওলানা! আপনি আমাকে মাফ করে দিবেন। আমার দ্বারা বড় ভুল হয়েছে। আমি আপনাকে কাফের বলতাম।" হযরত নানূতভী রহ. মাথা উঠিয়ে বললেন : ক্বারী ছাহেব! আপনার তো আমাকে কাফেরই বলা উচিত। কেননা আপনার কাছে আমার ব্যাপারে এমন বর্ণনাই পৌঁছেছে।

মোটকথা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বীয় অবস্থানস্থলে ফিরে আসলেন। ইনারাই আমাদের আকাবির। মহান পূর্বসূরী। হাতে সূর্য নিয়ে তালাশ করলেও এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। যিনি এমন ব্যক্তির পিছনে গিয়ে নামায পড়েন যিনি তাঁকে কাফের বলেন।

ঘটনা নং-২ : একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর মজলিসে কোন কোন আলেম বিদআতীদেরকে মন্দ বলছিলেন। হযরত শুনছিলেন। অতঃপর বললেন : মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের ফতওয়া অনুযায়ী আমল হবে না। তোমরা দেখবে এমন অনেক মানুষ যাদেরকে

তোমরা কাফের বলতে, ক্ষমা করে দেয়া হবে। অবশ্য শরীয়তের ব্যবস্থাপনা হিসেবে কারো অবস্থা দেখে কুফর ইত্যাদির ফতওয়া দেয়া জরুরী।

ঘটনা নং-৩ : একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব (শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর আব্বা) রহ. কে বললেন : মাওলানা আহমাদ রেযা খান ছাহেব বেরেলভীর বিভিন্ন পত্র আসে। সেখান থেকে কিছু শোনাও। যদি কোন হক কথা গ্রহণ করার মত থাকে, তাহলে সেটাকে গ্রহণ করব।

মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব রহ. বললেন : হযরত! কী শোনাব? এটা তো গালীতে পূর্ণ। হযরত বললেন : আরে শোনাও। এত দূরের গালী আবার লাগে নাকি? মাওলানা বললেন : হযরত! আমার দ্বারা আপনাকে গালী শোনানো সম্ভব নয়। এটা শুনে হযরত নীরব হয়ে গেলেন।

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. সর্পদংশনের দরূন শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

দেখুন হযরতের আত্মবিলোপের কী অবস্থা? নিজের কঠিনতম সমালোচকদের কথাও শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। শর্ত হল : সেটা হক হতে হবে।

১৪৫. আরেফের পরিচয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আরেফ তো এই কথা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে কী চান? তিনি একথা বলেন না যে, আমি কী চাই? আমি তো সুস্থতা চাই। মহান আল্লাহ রোগ দিয়েছেন, ঝামেলামুক্ত জীবন চাই। আল্লাহ তা'আলা গাইরে ইখতিয়ারী পেরেশানী দিয়ে দিয়েছেন।

ব্যস দেখতে হবে আমার মনের বিপরীতে যে অবস্থা আমার সামনে এসে গেছে সেটা কি ইখতিয়ারী নাকি গাইরে ইখতিয়ারী? যদি গাইরে ইখতিয়ারী হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ এটাই চাচ্ছেন। আর এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। কেননা فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ "জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ কখনো হেকমত (প্রজ্ঞা) শূন্য হয় না।"

দেখুন হযরত ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলে দিচ্ছেন। মেরে ফেলার জন্য। যা বাহ্যত: চরম ক্ষতিকর ব্যাপার। কিন্তু পর্দার অন্তরালে মহান আল্লাহ চাচ্ছেন তাঁকে বাদশাহ বানাবেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾

অর্থ : "আর আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম (একটা সময় আসবে যখন) তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, তুমি কে?) [সূরা ইউসুফ : ১৫]

মহান আল্লাহর মঙ্গলের ইচ্ছা কে বুঝতে পারে? এ কথাটি যদি মনের মধ্যে বসে যায় আর সব সময় মনের মধ্যে হাযির থাকে তাহলে কতইনা শান্তি ও আনন্দ।

মোটকথা কোন মুসলমান অসুস্থ হলে, অপদস্থ হলে অথবা পেরেশানীর সম্মুখীন হলে সেটা কে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করবেন না।

আর সালিক বা আল্লাহর পথের পথিকের খুব স্মরণ রাখা চাই যে, ইখতিয়ার বহির্ভূত মুজাহাদা যতটুকু উপকারী এবং এর দ্বারা যে পরিমাণ ইসলাহ ও সংশোধন হয় ইখতিয়ারভুক্ত মুজাহাদার দ্বারা সেই পরিমাণ হয় না। কেননা গাইরে ইখতিয়ারী বা ইখতিয়ার বহির্ভূত মুজাহাদায় কষ্ট বেশি।

ব্যাপারটির উদাহরণ নিম্নরূপ : একজন স্বেচ্ছায় উঁচু বিল্ডিং থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। তার বেশি একটা পেরেশানী হবে না। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি যাকে উঁচু বিল্ডিং থেকে জোরপূর্বক ধাক্কা দিয়ে ফেলা দেয়া হয়েছে, তার ব্যথা অনেক বেশি লাগবে।

তো আরেফ ও সালেকের এটা দেখা চাই যে, মহান আল্লাহ এ মুহূর্তে আমার কাছে কী চাচ্ছেন?

একবার মক্কা মুকাররামায় জনৈক ব্যক্তি হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। যিনি হারাম শরীফে নামাযের পাবন্দ ছিলেন। পরবর্তীতে অসুস্থতার কারণে হারাম শরীফে উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরতের নিকট খুব ব্যথা ভরা মন নিয়ে দু'আর আবেদন করলেন। হযরত দু'আ করে দিলেন। ঐ লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত বললেন: আরেফ এটা চায়না যে, হারাম শরীফের নামাযই নসীব হোক। উদ্দেশ্য তো হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। চাই সেটা হারাম শরীফে পাঠিয়ে নামায পড়ানোর মাধ্যমে হোক। অথবা বিছানায় ফেলে নামায পড়ানোর মাধ্যমে হোক।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন কারো টাকার দরকার। এর জন্য সে ব্যবসা আরম্ভ করে। কষ্ট করে। ঘটনাক্রমে একজন উদার দানশীল মানুষ পাওয়া গেল। তিনি বললেন : আমি তোমাকে একলক্ষ টাকা দিচ্ছি। তুমি ব্যবসা ছেড়ে দাও। এখন সেই লোক বলছে : না জনাব! আমাকে তো ব্যবসা করেই টাকা উপার্জন করতে হবে।

তাহলে সবাই একে আহমক বলবে। কষ্ট ছাড়াই তার মাকসূদ হাসিল হচ্ছে, অথচ এরপরও কষ্ট অবলম্বন করছে!

অনুরূপভাবে আসল মাকসূদ হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। চাই সেটা যেভাবেই অর্জন হোক না কেন।

১৪৬. ইলম ও সুলূকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে পার্থক্য

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : পূর্ববর্তী মহামনীষীগণের (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনে ইযাম) উদ্দেশ্যমূলক উলূম অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস হাসিল করার জন্য উপলক্ষমূলক উলূম যেমন নাহু-সরফ ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা এসব ইলম ছাড়াই উদ্দেশ্যমূলক ইলমগুলো অর্জন করে ফেলতেন। আরবী তাঁদের মাতৃভাষা হওয়ার কারণে ভাষাগত ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তাঁরা পুরোপুরি অবগত ছিলেন।

অনুরূপভাবে তরীকে বাতেনের মধ্যেও পূর্ববর্তী মনীষীদের প্রচলিত যিকির শোগল মুরাকাবা ইত্যাদি ইহসানের পথসমূহের প্রয়োজন ছিল না। এগুলো ছাড়াই মাকামে ইহসান তাঁদের হাসিল হয়ে যেত।

পরবর্তীতে নবুওয়াতের যুগ যত দূরে সরে গেছে, অন্ধকার তত বেড়ে গেছে। এজন্য প্রচলিত শোগল ব্যতীত মাকামে ইহসান হাসিল হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।

যেমনিভাবে দাওরায়ে হাদীসের জন্য সরফ ও নাহুর প্রয়োজন, তেমনিভাবে মাকামে ইহসান হাসিল হওয়ার জন্য প্রচলিত শোগলের প্রয়োজন।

যেমনটি হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. একবার প্রচলিত শোগল ও মুরাকাবার হাকীকত বয়ান করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে বলেছিলেন : যদি কেউ ফার্সী ভাষা জানে। গুলিস্তাঁ, বোঁস্তার মত কিতাব প্রাথমিক ফার্সী কিতাবের সাহায্য নেয়া ছাড়াই পড়তে পারে। তাহলে এ ব্যক্তির এ সমস্ত প্রাথমিক কিতাব পাঠ করার কী প্রয়োজন?

এমনিভাবে খানকায় চিল্লাকাশী, রিযাযত, মুজাহাদা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্যের সহায়ক মাত্র। উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া উদ্দেশ্য। পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। চাই নকশবন্দিয়া তরীকায় হাসিল হোক অথবা চিশতিয়া তরীকায় অথবা কাদেরিয়া তরীকায় অথবা সোহরোওয়ারদিয়া তরীকায় হাসিল হোক।

কারো নরমভাবে আবার কারো শক্তভাবে। মুরাকাবা ও শোগলের দ্বারা হাসিল হোক অথবা এগুলো ছাড়াই হাসিল হোক। কারণ অনেকের যেহেন সাফ থাকে এবং বিক্ষিপ্ততা থেকেও নিরাপদ থাকে। তাদের মুরাকাবাত ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

জনৈক ফার্সী কবি বলেছেন :

دست بوسی چوں رسید از فضل شاہ
پائے بوسی اندریں عالم گناہ

বাদশাহর অনুগ্রহে যদি হস্তচুম্বনের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়, তাহলে ঐ মুহূর্তে পদচুম্বন করা গুনাহ।

তবে এ জাতীয় মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

সারকথা এই যে, মাকামে ইহসান যা উদ্দেশ্য সেটা হাসিল হওয়ার জন্য কোন মুহাক্কিক শাইখের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অম্লান বদনে স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে চলা জরুরী। যেহেতু শাইখ তাঁর মুরীদদের তবিয়তের ভিন্নতার ব্যাপারে ভালভাবে অবগত থাকেন। সাধারণত এটা ছাড়া মাকামে ইহসান হাসিল হওয়া কঠিন।

১৪৬. সাধারণ মানুষের নিরাপদ পথ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ পন্থা এটাই যে, যদি ইসলামের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করে, তাহলে বলে দেয়া যে, আমাদের আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আমাদের জানা নেই। সাহাবায়ে কিরামের রাযি. এ নীতিই ছিল। তাঁদের কোন কথা জানা না থাকলে বলে দিতেন যে, আমাদের জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করে বলব। এটাই নিরাপদ পথ।

১৪৭. অন্তর ও মস্তিষ্কের শান্তির উপলক্ষ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সামাজিক জীবনে যদি কারো পক্ষ থেকে তবিয়ত পরিপন্থী কোন ব্যাপার সামনে আসে আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে, সেক্ষেত্রে তোমার দিল কবূল না করলেও সেটা মেনে নিও। সমস্যার নিষ্পত্তি করে দাও। এটাই নিরাপদ পথ। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন অন্তরে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ব থাকবে। অথচ মানুষের অন্তরে আছে দুনিয়ার বড়ত্ব। ঝগড়া বাড়াতে চায় কমাতে চায় না। এজন্য অন্তর শীতলই হয় না।

দেখুন মক্কার কাফেররা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'মুহাম্মাদ' বলার পরিবর্তে 'মুযাম্মাম (নিন্দিত) বলত। নাউযুবিল্লাহ। এটা শুনে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ক্রোধে ফেটে পড়তেন। তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের গোস্বা কে এভাবে শীতল করেন أُنْظُرُوْا إِلَى اللهِ كَيْفَ صَرَفَ كَيْدَهُمْ عَنِّى هُمْ يَذُمُّوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ তোমরা মহান আল্লাহর দিকে দেখো। তিনি মক্কার কাফেররা আমার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করেছে সেটাকে আমার থেকে কিভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ওরা আমাকে "মুযাম্মাম" বলে সমালোচনা করে অথচ আমি হলাম "মুহাম্মাদ" (প্রশংসিত)

এ ব্যাপারে যুক্তিবিদ্যাসুলভ সংশয় হতে পারে যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য তো "মুযাম্মাম" বলার দ্বারা প্রিয়নবীই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল। উত্তর হল : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল

সাহাবায়ে কিরামের রাযি. দুঃখ-ব্যথাকে শীতল করা। আর এটা হাসিল হয়ে গেছে। এটাকেই تربيّة "তারবিয়্যত' বা দীক্ষা বলে। দীক্ষার ব্যাপারটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সূক্ষ্ম। অনেক সময় স্রেফ বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা হাকীকতের বিপরীত ইসতিদ্‌লাল করে তারবিয়্যত করা হয়।

অনুরূপভাবে কারো ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা যদি অন্তর প্রশান্ত নাও হয়, শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে কবূল করে নেয়া হয় তবুও কল্যাণকর। কারণ শান্তি এর মধ্যেই নিহিত।

১৪৯. অধিক যিকিরের একটি প্রতিক্রিয়া

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কারো কারো ইখতিয়ারী যিকির এত বেশি হয় যে, অনিচ্ছাকৃতভাবেই যবানে যিকির জারী হয়ে যায়। আর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, বাইতুল খালাতেও যিকির বন্ধ হয় না। শরয়ী নির্দেশের কারণে যে, এ সময় যিকির নিষেধ, দাঁতের মধ্যে যবানকে আটকিয়ে বসে।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ রহ. এর ঘটনা। একবার ক্ষৌরকার তাঁর মোচ বানিয়ে দিচ্ছিল। আর তিনি যিকিরে মাশগূল ছিলেন। ঠোঁট নড়ছিল। তখন ক্ষৌরকার আদবের সাথে বলল : হযরত! একটু যিকির বন্ধ রাখুন। নতুবা ঠোঁট কেটে যাবে। প্রতিউত্তরে হযরত বললেন : ঠোঁট কেটে যাওয়া মঞ্জুর। কিন্তু যিকির বন্ধ করা নামঞ্জুর। এভাবে বানাতে পারলে বানাও।

ঐ যুগের ক্ষৌরকাররাও খুব দক্ষ ছিল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে হযরতের মোচ পরিপাটি করে দিয়েছেন।

১৫০. মুসলমান নিজেকে কাফেরের সাথে তুলনা করবে না

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : শূকরের খাদ্য হল নোংরা জিনিস ও পায়খানা। সে এগুলো খেয়ে মোটা তাজা হয়। আর গরু-মহিষের খাদ্য হল ঘাসদানা। এখন যদি গরু-মহিষ পায়খানা খেতে থাকে তাহলে কি এরা মোটা হয়ে যাবে? অনুরূপভাবে মুমিনের খাদ্য হল হালাল। হারাম নয়।

হারাম দ্বারা সে শক্তি লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে কাফের। তার জন্য হালাল হারাম সমান। নিজেকে কাফেরের সাথে তুলনা করবেন না।

১৫১. ওয়াসওয়াসার দ্বারা দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন ক্ষতি হয় না

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মনে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা আসলে কোন অসুবিধা নাই। দুনিয়ার ক্ষতিও নাই। দ্বীনের ক্ষতিও নাই। তাহলে মনে কুমন্ত্রণা আসলে মন খারাপ করেন কেন? দ্বীনের ক্ষতি তো তখনই হবে যখন ঐ কুমন্ত্রণার চাহিদায় গুনাহ করে বসবে। নতুবা শুধু কুমন্ত্রণা মনে আসার দ্বারা কোন অসুবিধা নাই।

আর দুনিয়ার ক্ষতি ৩ প্রকার। জানের, মালের, আর ইযযতের। কুমন্ত্রণার দ্বারা জান বা প্রাণের কোন ক্ষতি হয় না। এটা তো একদম স্পষ্ট। আর মাল বা সম্পদেরও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এর দ্বারা সম্পদ চলে যায় না। ইযযত বা সম্মানেরও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এর দ্বারা ইযযত আব্রুর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। যখন কোন ক্ষতি নাই, তাহলে দুঃখ-ব্যথা কেন হবে? আফসোস-অনুশোচনাই বা কেন আসবে? ব্যস এর চিকিৎসা হল ভ্রুক্ষেপ না করা। আর ভ্রুক্ষেপহীনতার আলামত হল কোন দুঃখও হবে না।

কেউ কেউ লিখেন :

কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি। তারপরও উপকার হয়নি। আমি উত্তরে লিখি : ভ্রুক্ষেপহীনতার অর্থ হল : কুমন্ত্রণার অভিযোগও হবে না। কথাটা মনে রাখবেন। এটা কুমন্ত্রণার সারা জীবনের চিকিৎসা।

১৫২. একটি ফিক্‌হী মূলনীতি

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যদি কোন কাজ বৈধ হয় কিন্তু সেটা করার দ্বারা অসম্মান বা অপদস্থতার আশংকা থাকে, তাহলে ঐ বৈধ কাজও পরিত্যাগ করা উচিত।

অনুরূপভাবে যদি কোন কাজ মুসতাহাব হয় আর তার মধ্যে মাকরূহাত ও মুনকারাত শামিল হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে ঐ মুসতাহাবটাকেই বাদ দেয়া

উচিত। কিন্তু যদি অবশ্য পালনীয় কোন বিধানের ক্ষেত্রে মাকরূহাত ও মুনকারাত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে ঐ মুনকারাত বা অন্যায় কর্মকান্ডসমূহের সংশোধন করা হবে। ওয়াজিব কাজকে পরিত্যাগ করা হবে না।

এগুলো হল ফিক্‌হী মূলনীতি। এগুলো মনে রাখতে হবে। সময়মত কাজে লাগাতে হবে। এগুলোর উপর আমল করলে গাড়ী কোথাও আটকাবে না ইনশাআল্লাহ।

১৫৩. কল্পনাশক্তির নড়াচড়ার দ্বারা পেরেশানী হয়

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কোন কষ্ট তখনই কষ্ট হয় যখন তার দ্বারা পেরেশানী হয়। আর পেরেশানী তখনই আসে যখন ঐ কষ্টের সাথে স্বীয় অভ্যন্তরীণ খেয়ালাতকেও শামিল করা হয়। কথাটা সারা জীবন মনে রাখার মত।

এক ব্যক্তি আসল। আর কোন কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। এখন আপনি দুঃশ্চিন্তা করছেন যে, লোকটি তো বিগড়ে গেল। না জানি আমার কোন্ ক্ষতি করে? না জানি আমার পেছনে কাউকে লেলিয়ে দেয়? অথবা না জানি রাত্রে আমার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসে কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তো যতক্ষণ পর্যন্ত এসব খেয়ালকে শামিল না করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কষ্টের কোন কারণ নেই।

মনে রাখবেন। এ জাতীয় মুহূর্তে এ সমস্ত খেয়ালাত থেকে নিজেকে খুব সাবধানে রাখবেন। আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কিছুই হয় না।

কেউ হয়ত ভয়ংকর কোন স্বপ্ন দেখল যে, কেউ এসে তার সম্পদ নিয়ে গেছে। এখন চিন্তা করছে যে, কেউ রাত্রে এসে আমাকে হত্যা করে ফেলে কি না ইত্যাদি।

এসব হল উদ্ভট স্বপ্ন। হাদীসে পাকে এর চিকিৎসা বলা হয়েছে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পুরোটা পড়ে তিনবার থুথু ফেলবে এবং পার্শ্বপরিবর্তন করে শোবে। আর চিন্তামুক্ত থাকবে।

১৫৪. ইলমী ও আমলী শক্তির কৃতিত্ব

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : মানুষের মধ্যে দুটো শক্তিই আসল। একটা হল ইলমী শক্তি আর অপরটা হল আমলী শক্তি।

ইলমী শক্তির পরিপূর্ণতা হল সহীহ ইলম দলীল প্রমাণসহ মজবুত তরীকায় অর্জন করবে। আর আমলী শক্তির পরিপূর্ণতা হল অর্জিত ইলমের উপর পাবন্দীর সাথে মযবূতির সঙ্গে আমল করবে। কখনো করল কখনো করল না এটা আমলী শক্তির দুর্বলতা। কেউ দেখলে নামায পড়ে আর সফরে গেলে নামায ছেড়ে দেয়।

আপনার যদি নির্ধারিত কোন মামূল থাকে, উদাহরণস্বরূপ: কারো তাসবীহ এর মামূল নির্ধারণ করেছেন। তাহলে সেটাকে পাবন্দীর সাথে আদায় করবেন। স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা বা শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাদ দিবেন না। কোন অনিবার্য কারণে বাদ পড়লে কখনো সময় বের করে অন্য সময়ে আদায় করবেন।

সময়ের পাবন্দী অনেক বড় দৌলত। স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা দ্বারা জ্বর ইত্যাদি উদ্দেশ্য। অথবা অত্যাধিক কর্মব্যস্ততার দরূন প্রচণ্ড ক্লান্তি উদ্দেশ্য। আর শরয়ী প্রয়োজনের উদাহরণ হল : মনে করুন আপনি যিকির করছেন বা নামায পড়ছেন, এমতাবস্থায় একজন অন্ধ আসল। সামনে কূপ। আশংকা হচ্ছে যে, অন্ধ মানুষটি কূপের মধ্যে পড়ে যাবে। এমতাবস্থায় আপনার কর্তব্য হলো মা'মূল বর্জন করে তাকে রক্ষা করা। কবি বলেন :

اگر بینم کہ نا بینا وچاہ ست
اگر خاموش بنشینم گناہ ست

যদি আমি দেখতে পাই যে, অন্ধ ব্যক্তি আসছে আর সামনে কূপ আছে। সেক্ষেত্রে যদি আমি চুপচাপ থাকি তাহলে গুনাহ হবে।

১৫৫. মানুষ হওয়া অনেক কঠিন

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মানুষ বানিয়েছেন। আবেদ হয়েছে পরে। অতএব প্রথমে মানুষ হওয়া চাই। পরে আবেদ হবে। নতুবা কেউ আবেদ হল কিন্তু মানুষ হল না। তাহলে পরবর্তী সময়ে তার দ্বারা মানুষের কষ্ট হবে।

আমাদের হযরত থানভী রহ. বলতেন : মৌলভী হওয়া সহজ। আলেম হওয়া সহজ। মুহাদ্দিস হওয়া সহজ। সূফী হওয়া সহজ। গাউস ও কুতুব হওয়া সহজ। জান্নাতী হওয়া সহজ। কিন্তু মানুষ হওয়া খুব কঠিন।

তখন আমার ছেলেবেলা ছিল। জিজ্ঞেস করার সাহস হত না। এটা বুঝে আসত না যখন জান্নাতী হয়ে গেল, তাহলে তার মনুষ্যত্বের মধ্যে আর কোন্ ত্রুটি অবশিষ্ট থাকল? কিন্তু হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর বরকতে এখন বুঝে এসে গেছে।

হযরত মির্যা মাযহার জানেজাঁনা রহ, অত্যন্ত নাযুক মেযাজের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর খাস খাদেম হযরত গোলাম আলী শাহ রহ. একবার হযরত মির্যা ছাহেব রহ. এর খেদমতে ছিলেন। হযরত মির্যা ছাহেব রহ. এর খেদমতে বাদামযুক্ত বরফী হাদিয়া হিসেবে এসেছিল। এটা অত্যন্ত অভিজাত একটি মিষ্টি ছিল। মির্যা ছাহেব রহ. বললেন : গোলাম আলী! বাদামযুক্ত বরফী নিবে? আরয করলেন : জ্বী হ্যাঁ। এবং হাত পাতলেন। হযরত বললেন : আরে বোকা! এই জিনিস কি কেউ হাতে নেয়? কাগজ আন। ফলশ্রুতিতে কাগজ আনা হল। তার মধ্যে হযরত মির্যা ছাহেব রহ, কয়েকটি বরফী রাখলেন। হযরত গোলাম আলী শাহ রহ. কাগজ মোড়ানো আরম্ভ করলেন। যেমনটি সাধারণ অভ্যাস।

হযরত মির্যা ছাহেব রহ, বললেন : তুমি তো আমাকে মেরেই ফেলবে। আর বললেন : আমার কাছে আন। অতঃপর হযরত কাগজ নিয়ে সুন্দরভাবে চতুর্দিক হতে সমান করে গোল পুড়িয়া মোড়ালেন। দ্বিতীয় দিন জিজ্ঞেস করলেন : গোলাম আলী! বরফী খেয়েছিলে? আরয করলেন : জ্বী হ্যাঁ। হযরত বললেন : কী পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? বললেন : হযরত! সব একবারেই খেয়ে ফেলেছি! হযরত বললেন : আরে জংলী! এই বরফী কি কেউ একসাথে এভাবে খায়? এটা তো শুধুমাত্র খাওয়ার পর স্বাদযুক্ত বস্তু হিসেবে সামান্য চেখে নেয়া হয়।

তাহলে দেখুন বাদামযুক্ত বরফী একই মুহূর্তে খাওয়াটা জান্নাতী হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। অবশ্য মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ।

অনুরূপভাবে মির্যা ছাহেব রহ. এর খেদমতে একজন কাযী ছাহেব আসতেন। তিনি প্রচুর খানা খেতেন। হয়ত তার খোরাকীই এমন ছিল। কিন্তু মির্যা ছাহেবের তার খানা খাওয়া দেখে পেট কষা হয়ে যেত। পেট নরমকারী ঔষধ নেয়ার প্রয়োজন হত। একবার ঐ কাযী ছাহেব বললেন : হযরত! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। হযরত বললেন : বছরে দুই বারের স্থলে এখন থেকে একবার আসবেন। বললেন : হযরত! এটা কেমন কথা হল? আমি তো আপনার মহব্বতে আসি। হযরত বললেন : ঠিক আছে। কিন্তু আপনার খানা দেখে আমার ইস্তিঞ্জা বন্ধ হয়ে যায়। আর বছরে একবার পেট নরমকারী ঔষধ গ্রহণ করা সহজ। দুইবার গ্রহণ করা কঠিন।

১৫৬. রাজনীতির প্রকৃত মর্ম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : রাজনীতি শুধুমাত্র ধোঁকাবাজী, চালবাজী আর প্রতারণার নাম নয় যে, স্রেফ নিজের স্বার্থ উদ্ধার করবে। চাই অপরের যত ক্ষতিই হোক না কেন। বরং রাজনীতির অর্থ হল সুন্দর কৌশল অবলম্বন অর্থাৎ যতটুকু ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে অতটুকুর মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। উদাহরণস্বরূপ : কেউ চুরি করল। প্রমাণিত হলে তার হাত কাটা হবে। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, এই বিধান তো ঐ লোকটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। কিন্তু বাস্তবতা হল : পুরো জগতের শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য জগতের একটা অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। যেমন কারো শরীরে ফোঁড়া হল। আর এর বিষ অন্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ছে, সেক্ষেত্রে ডা. ছাহেব ঐ অংশটি ফেটে ফেলেন।

তো বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় এটা শরীরের ক্ষতি করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হল শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক রাখার জন্য সেই অংশটিকে কেটে ফেলতে হয়।

এমনিভাবে চোর জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ নষ্ট করতে চায়। এজন্য তার হাত কেটে দেয়া হয় যাতে করে জগতে শান্তি বিরাজমান থাকে।

এমনিভাবে ডাকাত যে আরো বড় অপরাধী। প্রকাশ্যে ডাকাতি করে। মানুষের শোয়া জাগরণ সব কিছু হারাম করে দেয়। নিরাপত্তা ধ্বংস করে

দেয়। তার শাস্তি হল শূলীতে চড়ানো হবে আর পেট ফেড়ে দিতে হবে। যাতে করে দর্শকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। এবার কার সাহস হবে চুরি ও ডাকাতি করার? এটাই “রাজনীতি”। যাকে সুন্দর কৌশল অবলম্বনও বলে।

তদানীন্তন সৌদী বাদশাহ মরহুম ফয়সালকে একবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বললেন : আপনাদের দেশের শাস্তিগুলো নিবর্তনমূলক। হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস, চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন, ডাকাতির ক্ষেত্রে শূলীতে চড়ানো ইত্যাদি বিধানগুলো অত্যন্ত বর্বর।

বাদশাহ ফয়সাল পাল্টা প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা আপনিই বলুন : শাস্তির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই এটাই যে, অপরাধ বন্ধ হয়ে যাক। কমে যাক। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বললেন : জ্বী হ্যাঁ শাস্তি সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল অপরাধ কমিয়ে আনা।

বাদশাহ ফয়সাল পুনরায় প্রশ্ন করলেন : গত বছর আপনাদের আমেরিকায় কী পরিমাণ অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট বললেন : হাজারের উপর। বাদশাহ ফয়সাল বললেন ; অথচ আমাদের দেশে মাত্র কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তাহলে আপনিই বলুন : এই সব নীতি আপনাদের অপরাধকে বন্ধ করতে পেরেছে নাকি আমাদের?

এটা শুনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

এমনিভাবে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলে শাফেয়ী মাযহাব মতে প্রমাণিত হলে প্রথমবারেই হত্যা করে ফেলবে। আর হানাফীগণ বলেন : তিনবার জেলে পাঠানোর উপর ক্ষান্ত কর। চতুর্থবার যদি ছেড়ে দেয় সেটা কুফরী কাজ। সেক্ষেত্রে তাকে দুনিয়াতে রাখা উচিত নয়। কারণ ইসলামবিরোধী মুশরিক ও কাফেরগণ বে-নামাযী ব্যক্তিকে দেখে কী মন্তব্য করবে!!

এখান থেকেই বিদআত নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ বুঝে নিন। আমরা মানলাম আহলে বিদআতের নিয়্যত পাক। তারা খালেস নিয়্যতে কবরপূজা করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মুশরিকদের আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ থাকবে। তারা মনে করবে যে, যেভাবে আমরা আমাদের অবতার বা দেবদেবীকে সামনে রেখে পূজা করি, মুসলমানরাও কবরে শায়িত ঐ মৃত ব্যক্তির পূজা করে। এই সন্দেহ ও বৈসাদৃশ্যের দরূনও বিদআত নিষিদ্ধ।

বিদআতের আরেকটি খারাবী এই যে, অন্যান্য গুনাহগারদের তো তাওবার তাউফীক হয়। যেহেতু তারা নিজেদের খারাপ কাজকে গুনাহ মনে করে, অথচ বিদআতী ব্যক্তি স্বীয় খারাপ কাজকে খারাপ মনে করেনা। যদ্দরূন তাওবাও করে না। তার তাওবার তাওফীক হয় না। এটা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থা।

১৫৭. ইসলামী রাজনীতির কিছু সুপ্রভাব

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এই রাজনীতি ও সুকৌশলের মধ্যে এটাও আছে যে, মুসলিম ও গাইরে মুসলিমের পোষাকের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বসবাসের এলাকাও পৃথক পৃথক হবে। এটার জন্যও মূলনীতি আছে। যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি ব্যবসা ইত্যাদির জন্য আসতে চায় তাহলে সে দারুল ইসলামে কতদিন থাকতে পারবে? অমুসলিম ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারবে কি পারবে না? গদি ব্যবহার করতে পারবে কি? ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলো রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এরপর একথা বলা যে, শরীয়তে রাজনীতি কোথায়? এটা সম্পূর্ণ ভুল। হ্যাঁ বর্তমান যুগের রাজনীতি ইসলামে নেই। যেখানে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ দেখা হয়।

এটাও রাজনীতির একটা অংশ যে, বাচ্চার বয়স সাত হয়ে গেলে তাকে নামাযের কথা বলতে হবে। আর দশ বছর হয়ে গেলে মারপিট করে হলেও নামায পড়াতে হবে।

এটা রাজনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হল, যদিও সে এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মাত্রই সে নামায কিভাবে আদায় করবে? এজন্য এখন থেকেই অভ্যাস করতে হবে। বাবা অভ্যাস না করালে এর গুনাহ বাবার হবে।

১৫৮. স্ত্রীর সাথে সুগভীর ভালোবাসা আল্লাহর ওলী হওয়ার আলামত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে খুব বেশি ভালোবাসে। এটা বিলায়েতের আলামত। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. এর সাথে ইশ্‌ক পর্যায়ের ভালোবাসা ছিল।

১৫৯. মাদরাসার ছাত্রদের আভিজাত্য বজায় রাখা উচিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : বর্তমানে আমাদের আরবী মাদরাসার ছাত্ররাও উর্দূ শব্দের পরিবর্তে ইংরেজি শব্দ বলতে পছন্দ করে। 'ওয়াক্ত' এর পরিবর্তে 'টাইম' বলে! 'নিযামুল আওকাত' বা সময়সূচির স্থানে 'প্রোগ্রাম' বলে। বর্তমানে তারা এটাকে আভিজাত্য মনে করে। ভবিষ্যতে অবস্থা কেমন হবে তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ পাক খাইর করুন।

ঢোলা পায়ার পাজামাও এসে গেছে। কুর্তাও হাঁটুর উপর উঠে গেছে। এখন মাদরাসা না বলে ইউনিভার্সিটি বলে! জলসার পরিবর্তে ইজলাস, কনফারেন্স ইত্যাদি নাম হচ্ছে।

১৬০. খানকাহে অবস্থানের উপকারিতা

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : তাবলীগে সময় দেয়ার দ্বারা ঐ ফায়েদা হাসিল হবে না যা আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে বসার দ্বারা হাসিল হবে। আমি আমার কথা মানতে কাউকে বাধ্য করছি না। আমার হযরত থানভী রহ. এর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছি, সেটাই নকল করছি।

এমনিভাবে দূরে থেকেও অবগতি প্রদান ও শাইখের ব্যবস্থাপত্রের অনুসরণের দ্বারা ইসলাহ হয়ে যায়। কিন্তু কাছে থাকার দ্বারা যেরকম দ্রুত সংশোধন হয় সেটা দূরে থেকে হয় না।

আমার কথাবার্তা 'চিন্তা ভাবনার সাথে সত্যসন্ধানী' ব্যক্তির ব্যাপারে। সে এক মজলিসে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়।

দেখুন ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ. একাকী থাকলেও খালী মাথায় থাকতেন না। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন : নির্জনে কেউ না থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তো আছেন। তাঁর সম্মানে খালী মাথায় থাকি না।

১৬১. কাইফিয়্যাত যদিও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু আমাদের জন্য কাংখিত

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : কাইফিয়্যাত যদিও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। কেননা যার উপর যে পরিমাণ কাইফিয়্যাত আসে ঐ পরিমাণই উদ্দেশ্য আদায় করা সহজ হয়ে যায়। ঐ কাইফিয়্যাত বা বিশেষ হালাত তাকে টেনে টেনে উদ্দেশ্যপূর্ণ আমলের দিকে নিয়ে যায়। তার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হবে। অন্যের তিক্ততা সহ্য করবে। তার যবানে মিষ্টতা চলে আসবে। কারণ তার মন সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াতে কারীমার দিকে যাবে :

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝

“আর ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।” (সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৪)

দেখুন একথাগুলো আমার কথা নয় স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথা। কেউ যদি এ আয়াতে কারীমা অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার নিজের ইলমের উপর বিশ্বাস নেই। নতুবা সে আমল করে না কেন? যদি কেউ আপত্তি করে যে, এমনটি তো করেছিল কিন্তু শত্রু বন্ধু হয়নি। উত্তর হল : দুই একবারে কী হবে?

আয়াতের মর্ম হল বারবার এমনটি করতে থাকবে। যদি কেউ অভিশপ্ত শয়তানই হয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে নম্রতা আসবে না। নতুবা অবশ্যই বন্ধু হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা ঠিক এমনই যেমন আমাদের হযরত থানভী রহ. এর নিকট জনৈক যুবক এসে বলেছিল : হযরত! আমার মধ্যে কামরিপুর প্রাবল্য। এদিকে এ মুহূর্তে বিবাহের সামর্থ্য নেই। সুতরাং কী করব? ঐ সময় হযরতওয়ালার নিকট একজন গাইরে মুকাল্লিদ আলেম বসা ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। এর চিকিৎসা তো হাদীসে পাকে আছে: অর্থাৎ

রোযা রাখবে। এর দ্বারা যৌন উত্তেজনা কমে যাবে। তখন ঐ যুবক বলল : রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু উত্তেজনা আরো বেড়ে গেছে।

এটা শুনে ঐ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম একেবারে চুপসে গেলেন। কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। হযরতওয়ালা থানভী রহ. বলেন : আমি ঐ যুবককে বললাম : সম্ভবত আপনি রোযা অল্প রেখেছেন। তিনি বললেন : জ্বী হ্যাঁ। হযরত বললেন : এর দ্বারা তো যৌন উত্তেজনা আরো বাড়বে। আপনার উচিত ছিল টানা রোযা রাখা। তাহলেই শক্তি কমে যেত। হাদীসে পাকের শব্দ দ্বারা এমনটিই বুঝে আসে। কেননা হাদীসে পাকের শব্দ হল–

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

অর্থাৎ “যার বিবাহের সামর্থ নেই সে যেন ধারাবাহিক রোযা রাখে।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৫)

ধারাবাহিক রোযা রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হল সবসময় রোযা রাখা। অল্প কয়েক দিন রোযা রাখাকে ধারাবাহিক রোযা রাখা বলে না। কারণ এর দ্বারা যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হয় না।

অতঃপর হযরতওয়ালা ঐ গাইরে মুকাল্লিদ আলেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন : “হাদীস মানা এক জিনিস। আর হাদীস বুঝা আরেক জিনিস”।

তো কেউ যদি এমনিভাবে ধারাবাহিকতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তাহলে ঐ শত্রু অবশ্যই বন্ধু হয়ে যাবে। আর যদি ধারাবাহিক নরম আচরণ সত্ত্বেও বৈরিতা বা শত্রুতা বন্ধ না করে তাহলে সেটার চিকিৎসা ভিন্ন।

যেমনটা একজন তালিব হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর নিকট লিখলেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার বিরোধী। হযরত বললেন : তার সাথে নরম ব্যবহার কর। আর মাঝে মাঝে হাদিয়া পাঠাও। কিছুদিন পর চিঠি আসল যে, হযরত! তার বিরোধিতা তো আরো বেড়ে গেছে, এখন তো মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। হযরত লিখলেন : আচ্ছা এখন থেকে সালাম কালাম সম্পূর্ণ বন্ধ। তুমিও কঠোর আচরণ কর। কয়েক দিন পর চিঠি আসল যে, যখন থেকে কঠোরতা অবলম্বন করেছি বিরোধিতা কমে গেছে। তো অনেকে এমনও হয়। তবে এদের সংখ্যা কম।

বাস্তবতা এটাই যে, নরম ব্যবহারের দ্বারা মানুষের অন্তর বিগলিত হয়। আয়াতে কারীমার পরবর্তী অংশ :

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

অর্থাৎ "আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবর করে এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয় যারা মহাভাগ্যবান"।

(সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৫)

যারা গিরগিটির মত ঘনঘন রং পরিবর্তন করে এটা তাদের কাজ নয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত দেখুন। তায়েফে কী হল? পবিত্র রক্তে জুতা মুবারক পর্যন্ত ভিজে গেছে। মহান আল্লাহ পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি বললে তায়েফবাসীদেরকে দুই পাহাড়ের মাঝে পিষে ফেলব। উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। কেননা তারা তো জানে না"।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ঘটনা আছে। একবার দুপুরে তিনি বাসায় আরাম করছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে আওয়াজ দিল যে, হযরত! আমার একটা মাসআলা জানার ছিল। হযরত জিজ্ঞেস করলেন : কী মাসআলা? বলল যে, হযরত! এই মাত্র মনে ছিল কিন্তু ভুলে গেছি। হযরত ইমামে আযম বাসার ভিতরে চলে গেলেন। শোয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঐ লোকটি পুনরায় আওয়াজ দিয়ে বলল : হযরত! মনে পড়েছে। হযরত পুনরায় সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে আসলেন। কয়েকটা সিঁড়ি মাত্র অবশিষ্ট। তখন বলল: একটু পূর্বেও মনে ছিল কিন্তু এইমাত্র ভুলে গেছি। ইমাম ছাহেব রহ বললেন. আচ্ছা, যখন মনে পড়বে তখন জিজ্ঞেস করে নিবে।

এভাবে আল্লাহর ঐ বান্দা ছয় সাত চক্করের পর বলল : হযরত! এখন পাকাপাকি মনে পড়েছে। শেষ বয়সে ইমাম ছাহেব রহ. এর শরীরও ভারী হয়ে গিয়েছিল। কষ্ট করে নিচে নেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা বল : তোমার কী মাসআলা? প্রশ্নকারী বলল : হযরত! আমি একথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে, পায়খানার স্বাদ মিষ্টি হয় নাকি তিক্ত?

চিন্তা করুন। এটাও কোন মাসআলা হল? কিন্তু ইমাম ছাহেব অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বললেন : যদি পায়খানা তাজা হয় তাহলে তার স্বাদ হবে মিষ্টি। আর যদি বাসী হয় তাহলে সেটা হবে তিক্ত।

প্রশ্নকারী বলল : আপনি খেয়ে দেখেছেন কি? দেখুন এখন তো গোস্বা এসেই যাওয়ার কথা ছিল। গোস্তাখীর পর গোস্তাখী হচ্ছে কিন্তু ইনারা তো হলেন সেই মানুষ যাঁরা নিজেদেরকে মিটিয়ে দিয়েছেন।

হযরত বললেন : স্বাদ শুধু আস্বাদনের দ্বারা বুঝে আসে না বরং আকল দ্বারাও বুঝা যায়। আমি দেখেছি, তাজা পায়খানায় মাছি বসে আর মাছি মিষ্টি জিনিসের উপরই বসে। পক্ষান্তরে শুকনো পায়খানার উপর মাছি বসে না। কেননা তিক্ত জিনিসে মাছি বসে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাজা পায়খানার স্বাদ মিষ্টি হয়। আর বাসী পায়খানার স্বাদ তিক্ত হয়।

এটা শুনে ঐ লোক হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর পদতলে লুটিয়ে পড়ল। আর বলল যে, বাস্তবেই লোকেরা সঠিক কথা বলছিল। লোকেরা পরস্পরে এ কথার আলোচনা করছিল যে, বর্তমানে সব থেকে বেশি ধৈর্যশীল মানুষ কে? তখন সকলে বলল : ইমাম আবূ হানীফা রহ.। তাই আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম।

এই হল ধৈর্য। ইনারাই হলেন মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যে চরম বেআদবী সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট হননি।

১৬২. সুলূক হল পূর্ণ আদবের নাম

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সুলূক হল পরিপূর্ণ আদবের নাম। মানুষ যখন আদবওয়ালা হয়ে যায়, তখন কুকুর, মাছি বরং পিপড়াঁর আদবের প্রতিও লক্ষ্য রাখে।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা : সফর থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। এক দোকানদার থেকে চিনি ক্রয় করলেন। কারণ সফর থেকে ফেরার সময় সামর্থ্য অনুসারে কিছু নিয়ে আসতে হয়। যাই হোক তিনি চিনি কিনে বাড়ী আসলেন। স্ত্রীকে চিনির ঠোঙ্গা দিলেন। খোলার পর দেখা গেল যে, এর মধ্যে পিপড়াঁ আছে। সঙ্গে সঙ্গে বললেন : এটাকে বেঁধে দাও। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন : কেন?

বললেন : পিঁপড়া কে ঐ দোকানে রেখে আসব যেখান থেকে চিনি ক্রয় করেছিলাম। স্ত্রী বললেন : এটা আবার কেমন কথা? বুযুর্গ বললেন : যদি পিপড়াঁটি ছেলে হয় তাহলে মেয়ে পিপড়াঁটি খুব পেরেশান হবে। আর যদি পিপড়াঁটি মেয়ে হয় তাহলে ছেলে পিপড়াঁটি পেরেশান হবে।

অতঃপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন : দেখ সফরে যদি আমরা দুজন একসাথে থাকি আর ঘটনাক্রমে একজন আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তাহলে তোমার আর আমার অবস্থা কেমন হবে? ফলশ্রুতিতে চিনির ঠোঙ্গা নিয়ে ঐ দোকানে গেলেন এবং পিপড়াঁটিকে সেখানে রেখে আসলেন।

আমি এটা বলছি না যে আপনিও এমনটি করুন বরং একথা বলতে চাচ্ছি যে, যে ব্যক্তি তাকওয়া ও যিকিরের পাবন্দীর সাথে সুলূক পাড়ি দিবে তাঁকে অবশ্যই কমবেশি এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

কম বেশি প্রত্যেকের ইলহাম ও কাশফ হয়। কমবেশি তাসাররুফের শক্তিও সবার থাকে। কমবেশি দূরদর্শিতা বা বিচক্ষণতাও সকলের আছে। যেহেতু তিনি ইখলাসের সাথে কাজে লেগে আছেন। তো এসব কাইফিয়্যাত বা বিশেষ অবস্থা প্রশংসনীয়। যেহেতু অন্তরের কোমলতা কাম্য, ধৈর্যশীল হওয়া আকাংখিত, ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ বা মহা সৌভাগ্যবান হওয়া কাম্য।

এটা শুধু নামায পড়ার দ্বারা আসবে না বরং ঐসব কাইফিয়্যাতে নামায পড়ার সুযোগ হবে। আর ঐসব গুণগুলোও কাইফিয়্যাত দ্বারা হাসিল হয়। শুধু বাহ্যিক আমল দ্বারা অন্তরের এ দহন পীড়ন হাসিল হয় না

এ আলোচনার দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, শাইখের প্রয়োজনীয়তা কত বেশি। কেননা এ কাইফিয়্যাত শাইখের তালীম দ্বারাই হাসিল হয়।

১৬৩. আল্লাহর পথের পথিককে পোক্ত হতে হবে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যখন কেউ সুলূক অতিক্রম করে তখন তাকে উপহাস করে বলা হয় শুষ্ক সূফী। স্বল্পবাক ইত্যাদি। শুষ্ক এজন্য বলা হয় যেহেতু কারো গীবত করে না। হাসেনা। এদিক সেদিকের অনর্থক কিচ্ছা কাহিনী বলে না। কেউ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মজলুম বলছে আর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক রহ. কে জালিম বলছে। অথচ এইসব সমালোচকদের কোন পড়ালেখাও নাই।

এজন্য এসব আজেবাজে বেহুদা কথাবার্তায় জড়াবে না। এ জাতীয় মানুষকে বন্ধু বা সাথী বানাবে না। মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিবে না।

১৬৪. অলসতার কারণে ঢিলেমী আসে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : বর্তমানে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ঢিলেমী দেখা যাচ্ছে।এর কারণ হল অলসতা। এদেরকেই যখন শিক্ষক বানিয়ে দেয়া হবে তখন কী হবে? দরসগাহে নিজের কিতাবও নিজে নিতে পারবে না বরং ছাত্রদেরকে দিয়ে নেয়াবে। এই ঢিলেমীর মূল কারণ হল অলসতা।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক হযরত মাওলানা ইযায আলী ছাহেব রহ. নিজের কিতাব দরসগাহে নিজেই আনতেন। লাগাতার দুই ঘন্টা সবক হলে দুটো কিতাবই সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। দ্রুত হাঁটতেন। রাস্তায় তালিবে ইলম দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম বলতেন। তাঁর আগে সালাম দেয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কেউ তাঁকে আগে সালাম দিতে পারত না। এটাই হল সুন্নাতের অনুসরণ।

১৬৫. সন্দেহযুক্ত লোকমা ও হালাল লোকমার প্রভাব

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : সন্দেহযুক্ত খানা খেলে বাতেনের উপর যে প্রভাব পড়ে সেটা দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানূতভী রহ. এর ঘটনা দ্বারা জানা যায়। হ্যাঁ যদি কারো অনুভূতিই নষ্ট হয়ে যায় অথবা তার অনুভূতি আছে কিন্তু সে কোন অপকৌশল অবলম্বন করে সেটা কে প্রতিহত করে তাহলে এ জাতীয় ব্যক্তি আমার সম্বোধনের পাত্র নন।

ঘটনা হল যেটা হাকীমুল উম্মাত মাওলানা থানভী রহ. বয়ান করেছেন। একবার হযরত মাওলানা ইয়াকূব ছাহেব বাসায় ছিলেন। কোন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসা থেকে হাদিয়াস্বরূপ লাড্ডু এসেছিল। সেখান থেকে একটি লাড্ডু মাওলানা খেয়ে ফেলেন। এর প্রভাবে এক মাস পর্যন্ত কোন

কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচারের চাহিদা হচ্ছিল। এক মাস পর এ আশংকা দূর হল। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শয়তানের পক্ষ থেকে যে কুমন্ত্রণা আসে সেটা প্রতিহত করার জন্য لَا حَوْلَ বলাই যথেষ্ট। এটা শয়তানের জন্য চাবুকস্বরূপ। পক্ষান্তরে যে কুমন্ত্রণা নফসের পক্ষ থেকে আসে তার জন্য لَا حَوْلَ পড়া যথেষ্ট নয়। বরং নফসের সাথে লড়াই করা জরুরী। এটা ছাড়া নফসানী কুমন্ত্রণা বন্ধ হয় না। কেননা শরীয়ত لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ কে শয়তানী কুমন্ত্রণা প্রতিহত করার জন্য নির্ধারণ করেছে। নফসানী কুমন্ত্রণা প্রতিহত করার জন্য لَا حَوْلَ কে নির্ধারণ করেনি। বরং এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কুদরতী ইচ্ছাশক্তি রেখেছে।

দেখুন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানূতভী রহ. এর নফসানী কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য এক মাস পর্যন্ত নফসের সাথে লড়তে হয়েছে।

এর বিপরীতে হালাল ও পবিত্র লোকমার প্রভাবও আজীব হয়ে থাকে।

এই মাওলানা ইয়াকূব নানূতভী রহ. এরই ঘটনা। দেওবন্দে একজন বুযুর্গ ছিলেন। যিনি ঘাস বিক্রি করতেন। তিনি স্বীয় উপার্জন থেকে কিছু অর্থ মাওলানাকে দিলেন আর বললেন যে এর দ্বারা চাউল রান্না করে অমুক অমুক বুযুর্গকে খাইয়ে দিবেন। মাওলানা বলেন : আমি খুব গুরুত্বের সাথে খানা রান্না করলাম। আমার ভাগেও কয়েকটি লোকমা এসেছিল। সেই খানার প্রভাবে এক মাস পর্যন্ত আমার মন চাচ্ছিল সব কিছু ছেড়ে কোন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ইবাদতে মাশগুল হয়ে যাব।

১৬৬. রিয়াযত জরুরী নয় বরং মুজাহাদা জরুরী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : পানাহার বর্জন আর ঘুমানো ছেড়ে দেওয়ার নাম রিয়াযত বা সাধনা নয়। এগুলো তো হক্কানী শাইখের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে জায়িয নেই। অনুরূপভাবে যিকির ও খাস শোগলে লিপ্ততাও শাইখের অনুমতি ব্যতীত জায়িয নেই। অবশ্য মুজাহাদা জরুরী। যার মর্ম হল নফসকে শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা।

১৬৭. ফতওয়ার আলোকে যেটা বৈধ তাকে হালাল মনে করতে হবে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ফতওয়ার আলোকে যেটা হালাল, সেটাকে হালালই মনে করতে হবে। বেশি তত্ত্ব তালাশে পড়া অনুচিৎ। নতুবা পানাহার মুশকিল হয়ে যাবে এবং মানুষ সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

১৬৮. সফর খরচের ব্যাপারে তাহকীক

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যদি কাউকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয় আর সফর খরচ পাঠিয়ে দেয়া হয়। তো সেক্ষেত্রে সফর খরচের উদ্বৃত্ত টাকা ফিরিয়ে দেয়া জরুরী। কেননা সাক্ষ্য দেয়া ইবাদত। তার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়িয। এমনিভাবে যদি কাউকে ওয়াযের জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে তার জন্যও সফর খরচের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা জায়িয নেই।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর পদ্ধতি ছিল এই যে, সফর খরচ নিজ খাতায় লিখতেন আর যা কিছু উদ্বৃত্ত হত সেটা কে মানি অর্ডারের মাধ্যমে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন।

এর দলীল হল হযরত উমর রাযি. এর ঐ ঘটনা যে, রোম সম্রাট হেরাকলের স্ত্রী হযরত উমর রাযি. এর স্ত্রীকে একটি মুক্তা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেটাকে 'বাইতুল মাল' তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে দিলেন। আর বললেন যে, আমি যদি আমীরুল মুমিনীন না হতাম, তাহলে এ মুক্তা পাওয়া যেত না। সুতরাং যেহেতু এটা এই সম্পর্কের ভিত্তিতে পাওয়া গেছে, সেহেতু এটাকে বাইতুল মালে জমা করা হোক।

১৬৯. কোষাধ্যক্ষেরও কিছু ক্ষমতা থাকে

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : দপ্তরের মুন্শী এবং ক্যাশিয়ার বা কোষাধ্যক্ষেরও কিছু অধিকার থাকে। যদি তিনি নিজ এখতিয়ারে কিছু লিখে দেন এবং বলেন তাহলে শিক্ষকদের সেটাকে খারাপ মনে করা উচিত নয়।

এর উপর প্রমাণ হল হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ এর ঘটনা। ঈদের দিন ঘনিয়ে আসল। স্ত্রী আরয করলেন : বাচ্চাদের কাপড় নেই। বানিয়ে দিন। বললেন : কিভাবে বানিয়ে দিব? আমার কাছে তো কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন : বাইতুল মাল থেকে করয নিন। স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য খাজাঞ্চির কাছে চিরকুট লিখে পাঠালেন যে, আমাকে আগামী মাসের বেতন অগ্রীম দেয়া হোক। খাজাঞ্চী ঐ চিরকুটের উল্টোপার্শ্বে লিখলেন : আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি আমাকে লিখে দিন যে, আপনি আগামী মাস পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ, এতে মনক্ষুণ্ন হননি এবং স্ত্রীকে উত্তর দেখালেন।

দেখুন খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষের এখতিয়ার ছিল। সেটা দ্বারা কাজ নিয়েছেন। আর হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযও রহ. সেটাকে খারাপ মনে করেননি।

১৭০. আর্যরা পাক্কা মুশরিক

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : এই যে একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, "আর্যসমাজ একত্ববাদী" সম্পূর্ণ ভুল। এরা তো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের থেকেও বেশি মুশরিক। কেননা এরা তিন খোদায় বিশ্বাসী। এক. আল্লাহ, দুই. মূলধাতু, তিন. রূহ। পক্ষান্তরে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীগণ একজনকেই "কাদীম বিযযাত" মনে করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে। আর অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলোতে তারা আল্লাহ পাকের অনুপ্রবেশের প্রবক্তা। তো এরাও মুশরিক। কিন্তু আর্যদের থেকে তারপরও কম।

১৭১. হুকূক কয়েক প্রকার

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : হক কয়েক প্রকার। ১. جِنْسِيْ জিন্‌সী, ২. صِنْفِى সিন্‌ফী, ৩. نَصَبِىْ নসবী, ৪. نِسْبَتِيْ নিসবতী, [এগুলোর ব্যাখ্যা সরাসরি কোন আলেম থেকে বুঝে নিন-অনুবাদক]

এইসব হুকূক আদায় করা জরুরী। যার সারকথা হলো মানবসেবা।

طریقت بجز خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجّادہ و دلق نیست

তরীকত মানবসেবা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাসবীহ, জায়নামায আর তালি দেয়া পোষাকের নাম তরীকত নয়।

এইমাত্র যে হিন্দু আমার কাছে এসেছিল তার একটা জরুরী কাজ ছিল। যে কারণে আমার মজলিসে আসতে বিলম্ব হল। আমি তার কাজকে মজলিসের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। কেননা মজলিস বিলম্বিত হলে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে ঐ হিন্দু কে আটকে রাখলে তার অসুবিধা হত। এজন্য আমি এমনটি করেছি। কেননা নিয়ম হল দুটো কাজ একত্রিত হয়ে গেলে দেখতে হবে কোন্‌টা আগে করবে আর কোন্‌টা পরে করবে। যেটার কাযা হয়না সেটা কে আগে করতে হবে। আর যেটার কাযা হয় সেটা কে পরে করবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾

অর্থাৎ "সেদিন সকল মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে। আর কী পেছনে রেখে গিয়েছে।" (সূরা কিয়ামাহ : ১৩)

যদি কাউকে তার মা বাবা উভয়ে বলেন যে, আমার পা টিপে দাও। তাহলে মায়ের পা প্রথমে টিপে দিতে হবে। পরে বাবার পা। কেননা মায়ের খেদমতের হক বেশি। আর বাবার সম্মানের হক বেশি। কিন্তু কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পড়ে এটা বুঝা সাধারণ কাজ নয়। এর জন্য অনেক ইলম, দূরদর্শিতা ও মুহাক্কিকের সাহচর্য জরুরী।

এইমাত্র যে কথাটা বললাম সেটা হল সামাজিকতা বিষয়ক।

১৭২. প্রকৃত ইলম হল নূরে বাতেনী

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : পরিভাষায় তো মৌলভী ঐ ব্যক্তিকে বলে যিনি মীযান থেকে দাওরা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পড়েছেন আর যিনি এভাবে পড়েননি বরং কারো কাছে জিজ্ঞেস করে করে ইলম

হাসিল করেছেন তাকে 'জাহিল' বা মূর্খ বলা হবে না বরং আলেম বলা হবে। অবশ্য মৌলভী বলা হবে না।

তো যে বুযুর্গ পারিভাষিক অর্থে মৌলভী নন তিনি আলেম বরং ক্ষেত্রবিশেষে আলেম তৈরীর কারিগরও হতে পারেন। যেমন-হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. এবং আমাদের দাদাপীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.।

ইনারা পারিভাষিক অর্থে মেলৗভী না হলেও বাস্তবিক পক্ষে বড় আলেম ছিলেন। কেননা ইলম শুধুমাত্র কিছু শব্দ আর বাক্যের নাম নয়, বরং ইলম হল নূরে বাতেনীর নাম।

এই শব্দ ও বাক্যের পোষাক ঐ নূরকে পরিধান করানো হয়েছে। কেননা শব্দ ও বাক্য ছাড়া ঐ নূর থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। তো ইলম বাস্তবে ঐ পোষাকের নাম নয় বরং পোষাকে আচ্ছাদিত বস্তুটি হল ইলম। যা হল সেই নূর। আর এই নূর হাসিল হয় সার্বক্ষণিক যিকির ও তাকওয়া দ্বারা। আর এইসব বুযুর্গানে দ্বীন যিকির ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে অতুলনীয় হয়ে থাকেন এজন্য প্রকৃত ইলম তাঁদেরই হাসিল হয়।

সুতরাং কোন তালিবে ইলম যদি প্রকৃত ইলম চায় তাহলে তাকে অবশ্যই গুনাহ বর্জন করতে হবে এবং মুবাহ কাজ কমিয়ে দিতে হবে।

গুনাহ দুপ্রকার। ১. প্রকাশ্য। যেমন-চুরি, মিথ্যা কথা ইত্যাদি। ২. গোপন যেমন-অভ্যন্তরীণ বদঅভ্যাসসমূহ। এগুলো পরিত্যাগ করা জরুরী। পাশাপাশি বেশি বেশি নেক আমল করাও জরুরী।

কাজেই কিছু কিছু মানুষের একথা বলা যে, "তাসাওউফ" আবার কি? বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

তাসাওউফের মধ্যে মন্দস্বভাবগুলো দূর করার পদ্ধতি এবং প্রশংসনীয় গুণগুলো অর্জনের পদ্ধতি বাতলানো হয়।

আর "তাসাওউফ" নামের ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে 'তাযকিয়া' বলতে পারেন। তাযকিয়ার নির্দেশ তো কুরআন শরীফেই আছে।

আর যদি কেউ একথা বলে যে, তাযকিয়ার ব্যাপারে তো কুরআন শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ

"সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না।"

(সূরা নাজম : ৩২)।

তো এর উত্তর হল : এমন কথা একমাত্র মূর্খ মানুষই বলতে পারে। শিক্ষিত কেউ এমন কথা বলতেই পারেন না। কেননা এখানে تَزْكِيَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো نِسْبَتْ إِلَى الزَّكٰوة যেহেতু بَابِ تَفْعِيْل এর বৈশিষ্ট্য হল نِسْبَتْ إِلَى الْمَأْخَذْ এখানে সেটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নিজেকে পবিত্র বলো না। هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى "তিনি ভালোভাবেই জানেন মুত্তাকী কে।"(ঐ)

মোটকথা এ আপত্তি হল একটি ধোঁকা। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۪ۙ "সেই সফলকাম হবে যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা শামস-৮)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ "সফলতা অর্জন করেছে সেই, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে।" (সূরা আলা ; ১৪-১৫)

অবশ্য তালিবুল ইলমকে খাস যিকিরে লাগানো যাবে না। কারণ খাস যিকিরের প্রভাবে পড়ালেখা ছুটে যাবে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে মস্তিষ্কের মধ্যে শুষ্কতা এসে পড়তে পারে।

আমার কাছে দুইজন তালিবে ইলম এসেছেন যাদেরকে বাইআত করে এক পীর ছাহেব যিকির ও খাস শোগলে লাগিয়ে দিয়েছেন। পরিণতিতে এদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

অবশ্য চলতে ফিরতে যিকিরের তালীম করা হবে আর বলা হবে যে, স্বীয় দৃষ্টির হেফাজত করুন। উঠতে বসতে নফসের নেগরানী করুন। অর্থাৎ তাকওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তালিবে ইলম যদি এভাবে কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক রেখে ইলম হাসিল করতে পারে তাহলে কতইনা সুসভ্য হবে।

এই যে বিভিন্ন মাদরাসায় ঝগড়া, দাঙ্গা, অবরোধ ইত্যাদি হয় এগুলো কোন্ ছাত্রদের দ্বারা হয়? তাদের দ্বারাই হয় যাদের কোন হক্কানী শাইখের সাথে আত্মশুদ্ধিমূলক সম্পর্ক নেই।

১৭৩. তালাবায়ে ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মালফূয

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ইলম ও আমল হল যমজ সন্তান বা জোড়া শিশু। আমল ছাড়া ইলম বেকার। আর ইলম ছাড়া আমল বাতিল। আমল করছে কিন্তু সেটা করার পদ্ধতি তার জানা নাই। ফলে অনেক সময় এমন হবে যে, আমল করবে অথচ ঐ সময় আমল করা নিষেধ। উদাহরণস্বরূপ : সূর্যোদয়ের সময় অথবা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় বা সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

এমনিভাবে যদি কারো ইলম থাকে কিন্তু আমল না থাকে, তাহলে সেটা উপকারী বটে কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল আমল। এ জন্য কাংখিত ফায়েদা হাসিল হল না। আতিল (বেকার) ও বাতিল এর পার্থক্য এ উদাহরণ দ্বারা বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ

মনে করুন কোন সরকারী চাকুরীজীবী। কোন অপরাধের কারণে সরকার যাকে চাকুরীচ্যুত করেছে। এখন সে বেকার। সরকারের দৃষ্টিতে তার গ্রহণযোগ্যতার কোন উপায় নাই। আর দ্বিতীয়জন হলেন ঐ চাকুরীজীবী যাকে কোন অপরাধের অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তো মোকাদ্দমার পর তার গ্রহণযোগ্যতার আশা আছে। কেননা মোকাদ্দমায় সে নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারে।

তো 'বাতিলের' বাহ্যত: গ্রহণযোগ্যতার আশা নাই। কিন্তু 'আতিল' মাকবূল হতে পারে।

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইলমবিহীন আমলকারী অপেক্ষা আমলবিহীন ইলমধারী উত্তম। যেহেতু তার পথ জানা আছে। হতে পারে কখনো আমল শুরু করে দিবে। আর মাকবূল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি

যার ইলমই নাই, সে নিজ ধারণা অনুসারে যদিও শরীয়তের বিধিবিধানের উপর আমল করছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে আমলকারী নয়। তো এমন ব্যক্তির উপর অপরাধের দুটি ধারা কায়েম হল। প্রথমত সে ইলম হাসিল করেনি। দ্বিতীয়ত আমল করল কিন্তু মাওলায়ে পাকের মর্জি অনুযায়ী করল না। পক্ষান্তরে আমলবিহীন আলেমের উপর স্রেফ একটি দফা কায়েম আছে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, ইলম ও আমল উভয়টি একে অপরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এজন্যই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর ভিত্তিপ্রস্তর রাখলেন, তখন তার নিকটেই আমলের জন্য সুফফা (চত্বর) নামে একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে করে ইলমের তালীমও অব্যাহত থাকে।

এ মাদরাসার শীর্ষস্থানীয় একজন ছাত্র হলেন হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. যিনি এ মাদরাসায় ইলম হাসিলের জন্য পড়ে থাকতেন। খাওয়ার মত কিছু পেলে খেতেন। নতুবা ক্ষুধার্ত থাকতেন। কারো দরওয়াযায় যেতেন না।

এ জন্যই মহান আল্লাহ তালাবায়ে ইলমে দ্বীনের গুণ বয়ান করে ইরশাদ করেন :

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ (আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) "উপযুক্ত সেই সকল গরীব, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। মানুষের কাছে সওয়াল না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।" (সূরা বাকারাহ : ২৭৩)।

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. অত্র আয়াতে কারীমার তাফসীর প্রসঙ্গে বয়ানুল কুরআনে বলেন : এ আয়াতে কারীমার মিসদাক বা উদ্দেশ্য হলেন ইলমে দ্বীনের তলাবা।

এর দ্বারাই তালাবাদের সিফাত জানা গেল যে, তাঁদেরকে সবধরনের ঝামেলামুক্ত হয়ে, ধৈর্যের সাথে, খুঁটা গাড়ার মত এক স্থানে পড়ে থাকতে হবে। এক মাদরাসার শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য মাদরাসায় যাবে না।

আর কখনো দেওবন্দ, কখনো সাহারানপুর, কখনো গাঙ্গুহ, কখনো এখানে কখনো সেখানে এমন ছুটাছুটি করবে না।

আরো বুঝা গেল যে, তালিবে ইলমের ইলম অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন শোগল অবলম্বন করা অনুচিত। এর সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে, হিন্দুস্তান-বাংলাদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে দান সাদাকার প্রকৃত উপযুক্ত হলেন দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রবৃন্দ। এদেরকে খুঁজে খুঁজে সাদাকা পৌঁছানো উচিত। কারণ তাঁদের এত সময় ও সুযোগ কোথায় যে তোমাদের দরওয়াযায় আসবে?

আল্লাহ তা'আলা তো পরিস্কার বলেই দিয়েছেন:

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫

অর্থাৎ "তাঁরা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না।"

(সূরা বাকারাহ : ২৭৩)

ভাইয়েরা! তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যেখানেই তালিবে ইলমে দ্বীন পাবে, তাঁদের খিদমত করবে। তাঁদের বাহ্যিক অবস্থার কারণে তাঁদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। বাহ্যিক বেশভূষার প্রতি তাঁদের ভ্রুক্ষেপ নাই। তাঁরা তো অন্য কিছু (ইলম আহরণ) তে ব্যস্ত। তাঁদের যোগ্যতা ও জ্ঞানের গভীরতা তখনই বুঝে আসে, যখন তাঁদের সাথে কথা বলা হয়।

আমার বাদশাহ আলমগীর রহ. এর ঘটনা মনে পড়ল। একবার আলমগীর রহ. এর উজির মাদরাসার ছাত্রদের নির্বুদ্ধিতা ও চৌকস না হওয়ার অভিযোগ করছিল। বাদশাহ আলমগীর রহ. শুনছিলেন। ঘটনাক্রমে একজন তালিবে ইলম সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আলমগীর রহ. তাঁকে ডেকে তাঁর সামনেই উজিরকে লক্ষ্য করে বললেন : বল দেখি এ হাউযে কয়পাত্র পানি আছে? উজির বলল : বাদশাহ! এ প্রশ্নের উত্তর তো খুব কঠিন। মাপা ছাড়া পানির পরিমাণ কিভাবে বুঝা যাবে? আলমগীর রহ. একই প্রশ্ন ঐ তালিবে ইলমকেও করলেন।

তালিবে ইলম আদবের সাথে নির্ভীককণ্ঠে বললেন : "মাননীয় বাদশাহ! আমার গোস্তাখী মাফ করবেন। আপনার প্রশ্ন অসম্পূর্ণ। আপনি আগে বলুন। হাউযের সাথে পাত্রের সম্পর্ক কেমন? কেননা পাত্র অনেক ধরনের হয়। যদি ঐ পাত্র এই হাউযের সমান হয়ে থাকে, তাহলে একপাত্র পরিমাণ পানি আছে। আর যদি হাউজের অর্ধেক হয় তাহলে দুই পাত্র পানি আছে। আর যদি এক তৃতীয়াংশ হয় তাহলে তিনপাত্র পানি আছে। আর যদি এক চতুর্থাংশ হয় তাহলে চার পাত্র পরিমাণ পানি আছে। এভাবে হিসাব চলতে থাকবে।"

বাদশাহ এ উত্তর শুনে আনন্দে গদগদ হয়ে উজিরকে লক্ষ্য করে বললেন : "দেখলে মাদরাসা ছাত্রের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা? অথচ তুমি কী বলছিলে? এখন তো তোমার মন্ত্রীত্ব ঐ তালিবে ইলমকে দিয়ে দেয়া উচিত আর তোমাকে বরখাস্ত করা দরকার। কিন্তু যেহেতু তোমাদের বংশে পূর্ব থেকেই মন্ত্রীত্ব চলে আসছে। তাই আমি এমনটি করব না। কিন্তু তুমি ভবিষ্যতে মাদরাসার ছাত্রদের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা থেকে সতর্ক থাকবে।"

এই হল তালিবানে ইলমে নবুওয়াতের যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা। কাজেই তাঁদের বাহ্যিক বেশভূষা দেখে তাঁদেরকে হেয় করবেন না। এরা জেনে বুঝেই নিজেদেরকে দুনিয়া থেকে গুটিয়ে রাখে। কারণ তাঁদের মূল লক্ষ্য হল আখিরাত।

এটাকেই মাওলানা রূমী রহ. বলেন :

انبیاء درکار دنیا جبریند
کافراں درکار عقبی جبریند
انبیاء را کار عقبی اختیار
کافراں را کار دنیا اختیار

অর্থাৎ, নবীগণ দুনিয়াবী কাজে বেশি অভিজ্ঞ হন না। পক্ষান্তরে কাফেরগণ আখেরাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। আখেরাতের কাজের প্রতি নবীদের রয়েছে তীব্র আকর্ষণ। অথচ কাফেরদের আকর্ষণ হল দুনিয়াবী কাজের প্রতি।

এর মাধ্যমে ঐসব লোকের প্রশ্নের উত্তরও হয়ে গেল। যারা বলে মাদরাসার ছাত্ররা সব বেকার ল্যাংড়া-লুলা! অন্যের উপর বোঝা।

যারা এসব কথাবার্তা বলে আসলে এরা নির্বোধ। অন্য ধর্মাবলম্বীরা এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে। তারা বলছে : এমন কিছু লোক থাকা দরকার যারা শুধু ধর্মের সেবা করবে। আর তাদের দুনিয়াবী প্রয়োজনগুলো সাধারণ মানুষ পুরা করবে।

এ প্রয়োজনের অধীনেই তাদের মিশন অব্যাহত আছে।

আফসোস! আজকে যে প্রয়োজনটা অমুসলিমরা বুঝল। যাদের মাযহাব বাতিল। সে প্রয়োজনটা মুসলিম সমাজ বুঝল না।

ভাইয়েরা! মনে রাখবেন একই সময়ে দুই কাজ হয় না। এটা একটা যুক্তিযুক্ত স্বীকৃত মূলনীতি। এর আলোকে মাদরাসার ছাত্রদের দুনিয়ার ব্যাপারে পঙ্গু হওয়াই ভাল। তবেই তাঁরা দ্বীনের খেদমত করতে পারবে। নতুবা তাঁরা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে দ্বীনের চর্চা ও খেদমত কিভাবে হবে?

কথা অনেক দূরে চলে গেছে। কারণ কথা থেকে কথা আসে।

আসলে আলোচনা হচ্ছিল ইলম ও আমল উভয়টি জোড়া সন্তানের ন্যায়। ইলম অর্জনও জরুরী। আবার আমলও জরুরী। আর উভয়টির মধ্যে ইলম অর্জন তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমল করা এবং সেটা শুদ্ধ হওয়া উভয়টি ইলমের উপর নির্ভরশীল। খুব বুঝে নিন।

১৭৪. দুনিয়ার অদ্ভুত উদাহরণ

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : ইস্তিঞ্জার ঢিলা কত জরুরী জিনিস। কিন্তু যদি কেউ এটাকে মহব্বত করে রাতদিন এর ধ্যানেই লেগে থাকে। তাহলে তাকে অবশ্যই নির্বোধ বলা হবে।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া ইস্তিঞ্জার ঢিলার চেয়েও নিকৃষ্ট। সুতরাং দুনিয়ার সাথে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পর্কই রাখতে হবে। এর থেকে বেশি নয়। দুনিয়ার সাথে এত বেশি মন লাগানো যে আখেরাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপই নাই অথবা খুব কম। এমন মানুষকে জ্ঞানী বলা যায় কি? যায় না।

সম্পদ ও অন্তরের উদাহরণ হল পানি ও নৌকার মত। পানি যদি নৌকার নিচে থাকে, তাহলে সেটা চালাতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি পানি নৌকার ভিতরে ঢুকে পড়ে, তাহলে সেটাই হয় নৌকাডুবির কারণ।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

অর্থাৎ "ভালো মানুষের জন্য ভালো সম্পদ কতই না ভালো।"

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৭৬৩)

১৭৫. যিকির ও তাকওয়া উভয়টি একটি অপরটির সম্পূরক

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. বলেন : যিকির ও তাকওয়া উভয়টি জরুরী। যিকির ছাড়া শুধু তাকওয়ার দ্বারা কাজ হবে না। যিকির ছাড়া তাকওয়া শুষ্ক। আর তাকওয়াবিহীন যিকির উড়তে পারবে না তথা অসম্পূর্ণ। আসল হল তাকওয়া। আর্দ্রতা সৃষ্টির জন্য যিকির জরুরী। আবার এটাও বলতে পারেন যে, আসল হল যিকির।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন যিকির হয় তখন মহব্বত পয়দা হয়। আর যখন মহব্বত পয়দা হয়ে যায় তখন মর্জির বিপরীত কিছু করার হিম্মত হবে না। এটাই তাকওয়া। অতএব তাকওয়া যিকিরের অনিবার্য অনুষঙ্গ হল। আর যদি পূর্ব থেকে তাকওয়া থাকে, তবে সেটার জন্যও যিকির জরুরী। শুধু তাকওয়া যথেষ্ট নয়। আশংকা আছে। কেননা সে তো শুধু সালিক। এখনো মাজযূব হয়নি। আর জায্‌বের পূর্বে ফিরে যাওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য যিকির জরুরী যাতে করে জয্‌ব পয়দা হয়ে সে মাজযূব (আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা) হয়ে যায়। আর সালিকে মাজযূব বনে যায়। এখন সে আশংকামুক্ত হয়ে গেল।

আর তাকওয়াবিহীন যিকির এজন্য উপরে উড়তে পারে না যেহেতু আনুগত্য ব্যতীত শুধু নাম নেয়া যথেষ্ট নয়। কোন ক্রীতদাস যদি তার মনিবের খুব প্রশংসা করে, কিন্তু তার নির্দেশ পালন না করে তাহলে মনিব এতে খুশী হবে না।

অতএব বুঝা গেল যে, যিকির ও তাকওয়া উভয়টিই মহান আল্লাহর নৈকট্য ও ইসলাহের জন্য জরুরী।

শেষ

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বড়দের ছেলেবেলা
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. ইসলাহী মাজালিস (২য় খণ্ড)
৮. মাজালিসে আবরার
৯. রাসায়েলে আবরার
১০. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. আহকামে মুসাফির
১৪. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
১৫. বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান
১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৭. তোমারই কুদরত দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৮. বিষয়ভিত্তিক বয়ান
১৯. মালফূযাতে ফুলপুরী
২০. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত
২১. রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের তৈরী?
২২. মালফূযাতে রায়পুরী
২৩. আত তাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২৪. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী
২৫. মাজালিসে সিদ্দীক
২৬. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
২৭. ধূম্রজালে জিহাদ
২৮. বরেণ্য দশ মনীষী : জীবন ও অবদান
২৯. এনজিও আগ্রাসন : দেশে দেশে
৩০. আহকামে হজ্ব

পাঠকের পাতা

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....